বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

মশিউর রহমান

মশিউর রহমান

জন্ম : ৪ জুন। চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার খয়ের হুদা গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাবার ব্যবসায় ভাটা পড়ে। সেই সাথে সারা বাংলার দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াটাও পুরোপুরি এসে পড়েছিল পরিবারে। সেখান থেকেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তবুও থেমে থাকেনি কোনোকিছু। জীবনকে চিনতে হয়েছে, জানতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় দারিদ্র্য তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। বাবা-মা ও বড় ভাইদের অনুপ্রেরণায় নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছেন।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও, সাহিত্যে আগ্রহের কারণে বাংলা সাহিত্যে এমএ করেছেন। ইন্টারমিডিয়ের পর কর্মজীবনের শুরু। প্রথমে টিউশনি, পরে কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি। বর্তমানে প্রচ্ছদ ডিজাইনার হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এ পর্যন্ত দুই সহস্রাধিক বইয়ের প্রশংসিত প্রচ্ছদ ডিজাইন করে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

লেখালেখির অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই। গ্রামের ক্লাবের দেয়াল পত্রিকায় প্রথম ছোটগল্প 'সংগ্রামই জীবন' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৯০ সালে ঢাকায় আসার পর দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিক ও সাহিত্য ম্যাগাজিনে তার লেখা নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। ছোটদের জন্য লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত বই : মেঘ ও বৃষ্টির বন্ধুরা, একাত্তরের ছেলেটি, আমরা করবো জয়, ভূতের সাথে হ্যান্ডশেক, ওরে বাবা ভূ-উ-ত, নীলডুমুরির ভয়ংকর রাত, অদৃশ্য মানব, ভূত গোয়েন্দা রহস্য, বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পাঠ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ, ছোটদের জগদীশচন্দ্র, ছোটদের মাদার তেরেসা, ছোটদের বিদ্যাসাগর, বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। 'টইটম্বুর'-এ প্রকাশিত শিশুতোষ গল্প 'ছোট্ট জোনাকি'র এনিমেটেড কার্টুন নির্মাণ করে একুশে টিভি (২০১১ সালের ঈদের অনুষ্ঠানের জন্য)।

বড়দের জন্য প্রকাশিত বই : ভালোবাসার আড়ালে, প্লেটোনিক প্রেম, ওরা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, প্রচ্ছন্ন প্রণয়, উড়ে যায় স্বপ্নের পাখিরা।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

মশিউর রহমান

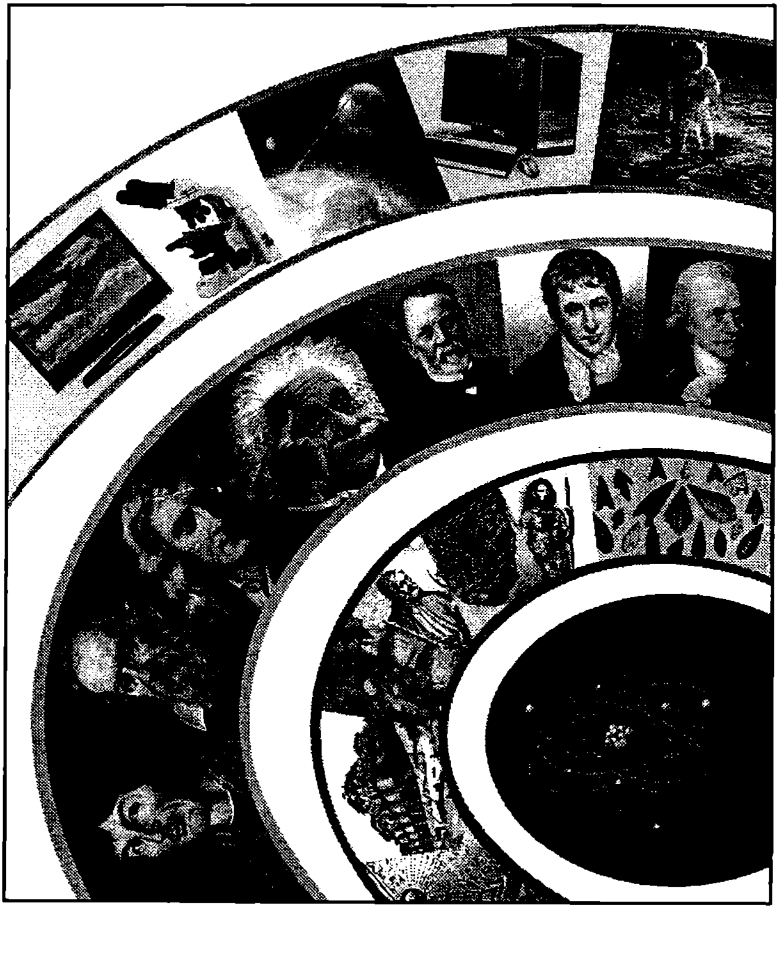

সৃজনী

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা
মশিউর রহমান

প্রকাশনায়
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
মাসফিয়া যাহীন ॥ তাসফিয়া ঋতি

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৪০০.০০

BIGGYANNER AGROJATRA By Moshiur Rahman.
Published by Srizoni, 40/41 P.K. Roy Road, Banglabazar, Dhaka-1100,
Date of Publication February 2012, Price : Tk. 400 Only. US$ 8
USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd., 22 Bricklane, London
e-mail : srizoni2000@yahoo.com
www.rokomari.com

ISBN : 984-8383-251-9

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হুমায়ূন আহমেদ
যিনি মনে-প্রাণে
একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ছিলেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূ মি কা

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। 'বিশেষ' শব্দটিকে আবার ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। তবে বিজ্ঞান এমন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান—যেখানে কল্পনা ও ভাবনার আশ্রয় নেই একেবারেই। পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, প্রশ্নের মাধ্যমে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানই বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞান হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান।

বিশ্ব এখন বিজ্ঞানের। ইনফরমেশনের। টেকনোলজির। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেশে আগের তুলনায় বিজ্ঞান চর্চা বেশি হচ্ছে। তাই বিজ্ঞান বিষয়ক বইও লেখা হচ্ছে বেশি।

এ বইয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ক্রমানুসারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগ, তাম্রযুগ থেকে লৌহযুগ, লৌহযুগ থেকে যন্ত্রযুগ, তারপর বিদ্যুতের যুগ, সবশেষে পারমাণবিক যুগের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও গ্রিক, মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধুসহ অন্যান্য সভ্যতায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইউরোপ ও এশিয়াতে বিজ্ঞান কিভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার কথা বলা হয়েছে। যেমন—রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কারের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি আমাদের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে বইটি বিশেষ সহায়ক হবে।

বইটি লেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রতিথযশা বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকদের লেখা, সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা এবং যথাযথভাবে ইন্টারনেটের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা।

মশিউর রহমান
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

বিজ্ঞানের পরিচয়	১১
কালের বিবর্তনে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার কয়েকটি শাখা	১৯
ধাতু আবিষ্কার ও সভ্যতার অগ্রযাত্রা	২১
বিজ্ঞান ও সভ্যতার নতুন যাত্রা	২৭
কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি	২৭
কাপড় বা বস্ত্র তৈরি	২৯
গৃহ নির্মাণ	৩১
মৃৎপাত্র	৩১
ভেলা ও নৌকা তৈরি	৩২
কাঁচ আবিষ্কার	৩৩
চাকা আবিষ্কার	৩৫
প্রাচীন সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা	৩৭
সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান	৩৭
মিশরীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান	৪১
সিন্ধু সভ্যতায় বিজ্ঞান	৪৮
চীন সভ্যতায় বিজ্ঞান	৫২
বৈদিক যুগের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান	৫৬
ফিনিশিয়দের বিজ্ঞান	৬১
ক্রিটীয় সভ্যতার বিজ্ঞান	৬৩
গ্রিকদের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা	৬৪
গ্রিক বিজ্ঞানী ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার	৭২
বিজ্ঞানের দুঃসময়	৭৭
গ্রিক বিজ্ঞানের দুঃসময়	৮১
রোমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা	৮৪
রোমান আমলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ	৮৫
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় প্রাচ্যের ভূমিকা	৮৮
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় চীন	৮৮
ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সাধনা	৯১
ভারতবর্ষের আবিষ্কার ও আবিষ্কারক	৯৫
মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অবনতির কারণ	৯৬
আরব জাতির বিজ্ঞানচর্চা	৯৮
অন্ধকার যুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা	১০২
বিজ্ঞানে ইউরোপের জয়যাত্রা	১০৫
ভৌগোলিক আবিষ্কার	১০৭
ইউরোপের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান	১১১
ইউরোপের শিল্পবিপ্লব	১১৪
ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রযাত্রা	১১৭
এশিয়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা	১২১
জাপান : প্রযুক্তি বিদ্যার চারণভূমি	১২১

www.pathagar.com

চীন সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চা ১২৩
এশিয়ায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ১২৫
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ভারতবর্ষ ১২৭
রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ১৩৩
রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ১৪৪
পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ১৫১
পদার্থ বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা ১৫৭
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় চুম্বক বিজ্ঞান ১৬৪
তড়িৎ বিজ্ঞান ১৬৫
তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞান ১৬৬
পরমাণু বিজ্ঞান ১৬৭
আপেক্ষিকবাদ ১৭১
পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান আবিষ্কার ১৭৫
চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ১৮১
চিকিৎসা বিজ্ঞানের কতগুলো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ১৯৫
জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ১৯৭
জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ২০০
গণিতের অগ্রযাত্রা ২১০
গণিতের কয়েকটি শাখা ২১৩
কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যা ২১৮
কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যান্য আবিষ্কার ২২৬
সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বর্ণনা ২৩৩
বিবর্তনবাদ ও চার্লস ডারউইন ২৩৩
পানির প্লাবিতা সূত্র ও আর্কিমিডিস ২৩৬
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নিকোলাস কোপার্নিকাস ২৩৯
দুরবিন বা টেলিস্কোপ এবং গ্যালিলিও গ্যালিলাই ২৪৩
গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্র ২৪৯
পরমাণুবিজ্ঞান ও জন ডালটন ২৫৫
অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও লিউয়েন হুক ২৫৭
রেডিও ও মার্কোনি ২৬০
টেলিগ্রাফ ও স্যামুয়েল মোর্স ২৬৪
টেলিফোন ও গ্রাহাম বেল ২৬৭
ক্যামেরা : দুনিয়া হাতের মুঠোয় ২৭০
টেলিভিশন ও জন লগি বেয়ার্ড ২৭৪
বৈদ্যুতিক বাতি ও টমাস আলফা এডিসন ২৭৮
ডিনামাইট ও আলফ্রেড নোবেল ২৮৩
অ্যাটম বোমা : বিজ্ঞানের অভিশাপ
বাষ্প শক্তি ও রেলগাড়ি ২৮৯
উড়োজাহাজ : পাখির মতো আকাশে ওড়ার ২৯২
যুগে যুগে মহাকাশ অভিযান ও রকেট ৩০০
কম্পিউটার : আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময় ৩১৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের পরিচয়

বিজ্ঞান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'বিশেষ জ্ঞান'। এই 'বিশেষ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞান এক শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান—যার মধ্যে কল্পনা ও ভাবনা-চিন্তার কোনো জায়গা নেই। পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, প্রাথমিক একটা ধারণা, বাস্তব পরীক্ষা এবং সবশেষে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানই যথার্থ বিজ্ঞান। আর এ কারণেই বিজ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যদিও যুগে যুগে দার্শনিকগণ শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান তথা বিজ্ঞানের আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে সৃষ্টির শুরু থেকে খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ার এবং ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী সবই নির্মিত হতো পাথরের দ্বারা। তারপরই মানুষ ধাতুকে ব্যবহার করতে শেখে। উক্ত কারণে মানবজাতির সুদীর্ঘকালের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে প্রস্তরযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত যুগটাকে তিনভাগে, আবার কেউ কেউ চারভাগে বিভক্ত করেছেন। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় লাখ বছর আগে থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত অতি পুরাতন প্রস্তরযুগ, খ্রিস্ট জন্মের পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত অতি পুরাতন প্রস্তরযুগ, দশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত মধ্য প্রস্তরযুগ এবং মাত্র পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত নব্য

পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ

www.pathagar.com

প্রস্তরযুগের সীমারেখা। অতি পুরাতন প্রস্তরযুগ ও পুরাতন প্রস্তরযুগকে একই সঙ্গে পুরাতন প্রস্তরযুগ বলেও চিহ্নিত করা হয়।

পুরাতন প্রস্তরযুগেই মানুষকে দীর্ঘকাল পড়ে থাকতে হয়েছিল মানবসভ্যতার একেবারে আদিমস্তরে। এই স্তরে সভ্যতার কোনো নামগন্ধ ছিল না। সে আমলে মানুষের বুদ্ধি ছিল যেমন ভোঁতা, তেমনই তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোও ছিল ভোঁতা ও অমসৃণ। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় ত্রিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত দল কিংবা গোষ্ঠী তো দূরের কথা, মানুষ পরিবারই গঠন করতে সক্ষম হয়নি। কথা বলতে জানতো না, কাঁচা মাংস খেতো, লজ্জা নিবারণেরও প্রয়োজন অনুভব করত না। সম্পদ ছিল পাথরের নুড়ি ও ভোঁতা হাতিয়ার। বিজ্ঞানের কোনো উন্নতি না হলেও কারিগরি জ্ঞানটা অর্জন করেছিল এবং হিসাবের ধারণাটাও অল্পস্বল্প ছিল। আর এসব জ্ঞান তারা লাভ করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। অপরদিকে নুড়ি পাথর বা হাতিয়ার, শিকার করা পশুপাখি, সংগৃহীত ফলমূল ইত্যাদির হিসাব রাখতে গিয়ে হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, আরও বেশি হলে গাছের পাতা জমা করে হিসেব ঠিক রাখতো। হিসাবের এই পদ্ধতিটি নব্য প্রস্তরযুগের শেষের দিকে এমনকি আরও পরের দিকে প্রচলিত ছিল।

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষকে কাটাতে হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক বছর। তার পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ মধ্য প্রস্তরযুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন ভোঁতা হাতিয়ারগুলোকে মসৃণ ও ধারালো করেছিল, উপলব্ধি করেছিল গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করার সুফল, ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। হয়তো মানুষ বুদ্ধিবলে বজ্রপাতের আগুন অথবা

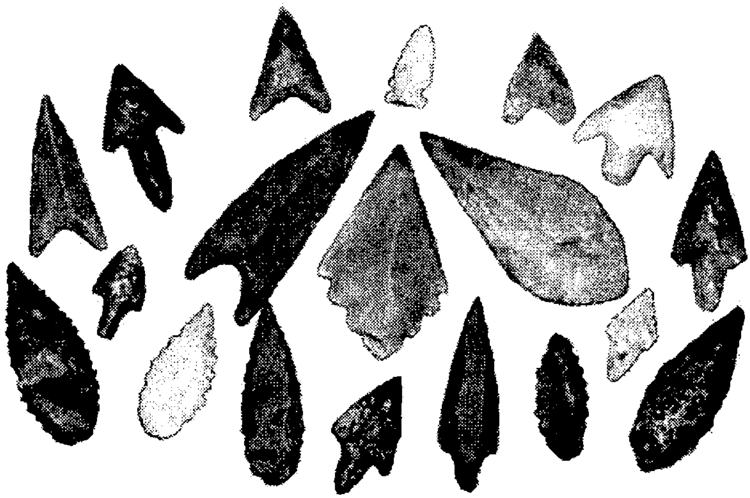

পুরাতন প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্র

www.pathagar.com

পাথর ঘষার সময় উৎপন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে এই সময় আয়ত্ত করেছিল। আর প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই সভ্যতার অগ্রযাত্রা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

মানুষ এতদিনে অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে এগিয়েই চলল—অরণ্যে অরণ্যে, গুহার মুখে প্রকাশ পেল ক্ষীণ আলোর দীপ্তি। আর শুরু হলো বিজ্ঞানেরও জয়যাত্রা। দেখতে দেখতে কাঁচা মাংস খাওয়ার দিন গেল ফুরিয়ে। অরণ্যের স্তূপীকৃত শুকনো ডালপালায় অগ্নিসংযোগ করে কনকনে ঠাণ্ডায় গুহাকে গরম রাখল এবং বন্যজন্তুদের তাড়ালো। গায়ে পশুর চামড়া জড়িয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে শিকারেও যেতে শুরু করলো। অপরদিকে গুহার মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবার একত্রে বসবাস করায় জীবনেও এল যথেষ্ট নিরাপত্তা।

মানুষ যেভাবে আগুন জ্বালানো শিখল

জীবনে নিরাপত্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ চিন্তাভাবনার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারলো। তার ফলে কারিগরি বিদ্যার পর্যায়ক্রমিক উন্নতি হলো। হাতিয়ারগুলো আর আগের মতো ভোঁতা থাকল না। অন্যদিকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন হাতিয়ারও হল প্রস্তুত। তাছাড়া পৃথিবীর বুকে যে ভয়ঙ্কর তুষারযুগটা হানা দিয়েছিল সেটাও ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গেল। পৃথিবীর ঋতু পরিক্রমায় একে একে আবির্ভূত হতে লাগলো নানা ধরনের ঋতু। শীতের প্রাবল্য না থাকায় একরকম নব্য প্রস্তরযুগের গোড়ার দিকে মানুষ বেরিয়ে এলো গুহা ছেড়ে। বেছে নিল যাযাবর জীবন। গবাদি পশুকে পোষ মানালো, অরণ্য থেকে তুলা সংগ্রহ করে সুতা তৈরি করল। সুতা থেকে তৈরি করল জাল। কাঠের গুঁড়ি পুড়িয়ে নির্মাণ করল নৌকার মতো জিনিস। কাঠের ভেলাও নির্মাণ করল। ফলে একদিন তারা হ্রদের অথবা নদীর বুকে বাসগৃহ নির্মাণ করল। জীবনে এল আরও নিরাপত্তা।

সেদিনের সেই পরিশ্রমী মানুষ—যারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করত, তারা একদিন আবিষ্কার করল ভূমিকর্ষণের উপায় এবং বীজ বপনের পদ্ধতি। মানুষের ইতিহাসে এটিও এক গৌরবময় অধ্যায়। যার কিংবা যাদের মাথায় প্রথম এই চিন্তা স্থান পেয়েছিল সে বা সেই দল মানবজাতির কি বিশাল উপকার করে গেছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। আগুন জ্বালানো ও কৃষিকাজ দুটোই হল কারিগরি বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

www.pathagar.com

এতদিনে মানুষের মুখে ভাষা এসেছিল। তবে সে ভাষা ছিল অপরিণত। বর্ণমালার তখনও উদ্ভব হয়নি। তবে মন হয়ে উঠেছিল কল্পনাপ্রবণ। কল্পনাকে রূপ দিয়েছিল গুহার গায়ে চিত্রলিপি আঁকার মাধ্যমে। আর ছবি আঁকতে গিয়েই রঙ-বেরঙের পাথর, খড়িমাটি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। অনেকে আবার মনে করেছেন মধ্য প্রস্তরযুগ থেকেই মানুষ গুহার গায়ে ছবি এঁকে আসছে। সেসব ছবি জন্তু-জানোয়ার ও শিকারের ছবি। আজও তাদের পরিত্যক্ত কোনো কোনো গুহায় সেসব ছবি বিদ্যমান। সে ছবি আজও মানুষের বিস্ময়ে অভিভূত করে। এত নিখুঁত এবং এত জীবন্ত! তার উপর আছে রঙের সুনিপুণ বাহার।

প্রস্তরযুগের মানুষ গুহার গায়ে এভাবে জীবজন্তুর ছবি এঁকে রাখত

নব্য প্রস্তরযুগের শেষভাগ পর্যন্তও মানুষের প্রকৃতি ছিল আজকের দিনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বসবাসের ফলে সেও হয়ে উঠেছিল হিংস্র। প্রধান প্রধান হাতিয়ার ছিল কুড়াল, বর্শা ও তীরধনুক। যদিও তাদের চাহিদা ছিল অতি সামান্য, তবু সে চাহিদাকে পূরণ করতে হত প্রচণ্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে। এরই ফলে একদিন গড়ে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব। আর ঐ নব্য প্রস্তরযুগে তারা ভালোভাবে গঠন করতে পেরেছিল এক একটি গোষ্ঠী বা দল। আর তখনই কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে নব্যযুগের সূচনা হয়েছিল।

গবেষকদের মতে, প্রথম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেছিল রুশ মালভূমিসহ সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফি"কা ও নিরীয় দক্ষিণ আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, মধ্য ও পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সাইবেরিয়া, উত্তর চীন, ককেসাস ও ভারতবর্ষে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় গোষ্ঠীবদ্ধ আদিপর্বের এইসব মানুষকে বলা হয় ক্রোম্যাগনন মানুষ। ওরা বর্তমান মানবজাতির আদিপুরুষ এবং কারিগরি বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং সেই দক্ষতা কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীরই মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই কালক্রমে হারিয়ে গেছে অনেক কিছু।

বর্তমানে উপরোক্ত অঞ্চলগুলোতে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রাচীন নির্দশনগুলো থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, ওরা প্রায় সবাই ব্যবহার করত

www.pathagar.com

ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। আগুন জ্বালাতে জানত। কাঠ কাটার জন্য পাথরের বাটালি, করাত ও কুরুনি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করত। আর মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে নৌকা তৈরি করত। পরবর্তীকালে ঐ ক্রোম্যাগনন মানুষরাই সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ গঠন করেছিল। কারও কারও মতে, আজ থেকে প্রায় বার হাজার বছর আগে ওরা বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে আমেরিকা মহাদেশেও উপস্থিত হয়েছিল। গবেষকদের মধ্যে সেসময় বেরিং প্রণালীর বিস্তৃতি বর্তমানের মতো ছিল না এবং বছরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকত বলে সে যুগের মানুষের পক্ষে কাঠের গুঁড়ি বেয়ে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করা সহজ হয়েছিল।

সাহসী আদিম মানুষ

আদি মানুষের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ার একাধিক কারণ গবেষকরা অনুমান করেছেন। প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, একইস্থানে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে তাদের খাদ্য-খাটতি দেখা দিয়েছিল। কারণ, কৃষিকাজে তারা পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে শেখেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নির্ভর করত গাছের ফলমূল এবং অরণ্যের ছোট ছোট পশুর উপর। ফলে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে তাদের যাযাবর জীবন বরণ করতে হয়েছিল। নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল দূর-দূরান্তরে। যেহেতু পৃথিবীর সব জায়গার পরিবেশ সমান নয়, তাই হাজার-হাজার বছরের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে মানুষ হয়ে উঠেছিল নানা আকৃতির এবং নানা বর্ণের। অন্যদিকে যতই দিন অতিবাহিত হতে লাগলো ততই পূর্বজীবন হল বিস্মৃত। একদিন দেখা দিল জাতিগত বৈষম্য। ভুলে গেল, তারা এক জাতি। এবং অতীতের সে ভুল আজও মানুষ সংশোধন করতে পারেনি।

তারপরও কেটে গেল কত সহস্র বছর। একদিন মানুষ উপলব্ধি করল, বসবাসের পক্ষে নদীর তীরই সবচেয়ে উপযোগী। নদীর সুস্বাদু পানি সারা বছর পানীয়ের অভাব দূর করতে সক্ষম। এছাড়াও পাওয়া যায় পর্যাপ্ত মাছ ও জলজ প্রাণী। এখানে হিংস্র জন্তুরও ভয় তুলনামূলকভাবে কম, সর্বোপরি নদীর তীরে পলিমাটিকে কর্ষণ করা সুবিধা এবং শস্য ভালো জন্মায়। তাই ধীরে ধীরে মানুষ এসে ভিড় করল বড় বড় নদীর তীরবর্তী এলাকায়।

হাজার হাজার বছর পাহাড় ও অরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেদিনের মানুষের হাত দুটোও পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের বুকেও ছিল অসীম

www.pathagar.com

সাহস। ধনী-দরিদ্র, কোনো ভেদাভেদ ছিল না। নারী, শিশু সবাই পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করত এবং দলের সবাই একসঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাবার গ্রহণ করত। জীবনে ভালোভাবে নিরাপত্তা আসায় ধীরে ধীরে নদী উপত্যকাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এক-একটি সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলোর মধ্যে মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরের নীল নদীর তীরে মিশরীয় সভ্যতা, ভারতবর্ষের সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা এবং চীনের ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর তীরের সভ্যতাই প্রধান ও প্রাচীনতম সভ্যতা। আর এই সভ্যতার প্রতিটিই ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

মানুষ যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে বসাবাস শুরু করে

নগর সভ্যতার গোড়ার দিকে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক জায়গার প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিটি পরিবারের জন্য জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হলো। দেখতে দেখতে সৃষ্টি হলো স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব। উদ্ভব হলো ধনী ও দরিদ্র নামক দুটি সম্প্রদায়। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। কে কতটা ভূমি অধিকার করে নিজের সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে পারে সেই প্রতিযোগিতা! মানবসভ্যতার এক অভিশপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হলো। বুদ্ধিমানরা কৌশলে বা বলপ্রয়োগে অপরের সম্পদ অপহরণ করে নিজ সম্পদ বাড়াতে থাকল। উদ্ভব হলো ভূমিদাস, ক্রীতদাসসহ নানা শ্রেণী। অপরদিকে সৃষ্টি হলো রাজা, রাজপদ, রাজপ্রাসাদ। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল মানবসভ্যতা।

মানুষের চিন্তা এবার আর কেবলমাত্র খাদ্য অন্বেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সম্পদ বাড়ানোর জন্য নানা কলাকৌশল আবিষ্কারেও জয়ী হতে লাগল। তারই পরোক্ষ ফল, কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গাণিতিক ও জ্যামিতিক তথ্যের উদ্ভব।

বর্ষাকালে নদীগুলোতে বন্যা আসত। কখনও কখনও দুকূল প্লাবিত হয়ে জমির সীমারেখা বা আল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যেত। পুনরায় ব্যক্তিগত জমির সীমানা ঠিক করার জন্য পরিমিতি নামক অঙ্কের একটি শাখাটি উদ্ভব হলো। অনেক আগে থেকেই তারা পশুপালন করে আসছিল, এবার কৃষিকাজে অভ্যস্ত হওয়ায় নানান

www.pathagar.com

জিনিসের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তাই উদ্ভব হলো সংখ্যা গণনা ও মাপজোখের পদ্ধতি। কৃষিকাজকে সহজ করার জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও অনেকে তৈরি করতে সচেষ্ট হলো। আবিষ্কৃত হলো পরিবহনের জন্য চাকা। নির্দিষ্ট সময়ে ফসল বোনার জন্য দিন-মাস-ঋতু-বছর ইত্যাদি গণনার সূত্রপাত হলো।

অন্যদিকে জীবমাত্রই রোগব্যাধির অধীন, মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। সেদিনের মানুষ কেমন করে যেন বুঝেছিল, গাছগাছড়ার কাছেই আছে ওষুধ। তাই রোগব্যাধির আক্রমণ হলেই দ্বারস্থ হতো উদ্ভিদের কাছে এবং আবিষ্কারও করেছিল কতগুলো উদ্ভিদের ভেষজ গুণ। অপরদিকে মুখের ভাষাকে রূপ দিল চিত্রে। পরিশেষে সেই চিত্র থেকে সৃষ্টি হলো আধুনিক বর্ণমালার।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকেই শুরু হয় স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও লুটতরাজ। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হয়েছিল সেদিন থেকেই নিজের অধিকার স্থাপনের জন্য এবং অপর দলকে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো।

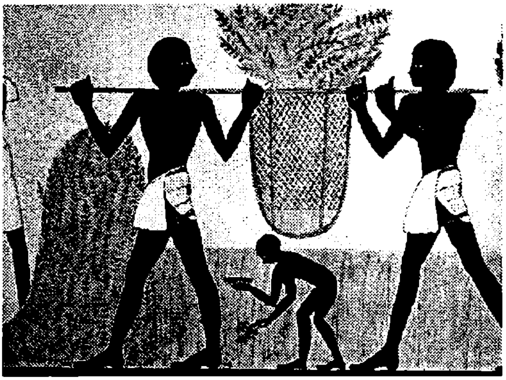
মিশরের নীলনদের তীরে প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠে

এরপর ইতিহাস সম্পূর্ণ বদলে গেল। যে পরিশ্রমী মানুষ এতদিন কেবল পরিশ্রমের জোরে এগিয়ে আসছিল, এবার ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা লাভ করে দৈহিক শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে। সম্পদ আহরণ ও বিলাস-উপকরণ সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োজিত হলো। আগে দলের দলপতি ছিল সকল ক্ষমতার মালিক। দলের ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ সবকিছুই নির্ভর করতো দলপতির উপর। দলপতি নিযুক্তও হত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এবার একশ্রেণীর মানুষের হাতে অর্থ সম্পদ জমা হওয়ায় তারা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠল এবং সৃষ্টি হল রাজপদের। সেই থেকেই সমাজে প্রচলিত হলো নিষ্ঠুর ও অভিশপ্ত দাসপ্রথা। রচিত হলো নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও আইনকানুন। অভিজাতরা পুরুষানুক্রমে সুখ-সুবিধাগুলো ভোগ করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের উন্নতি ব্যাহত করার জন্য ঈশ্বরের নামে ভীতি প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করল। অভিজাতদের ভোগবিলাসকে চরিতার্থ করার জন্য আগেকার পাতার কুঁড়েঘরের পরিবর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বিশাল বিশাল অট্টালিকা। ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস, ইয়াংসি-হোয়াংহো, সিন্ধু-পদ্মা ও নীল নদের তীরভূমিতে গড়ে উঠল

www.pathagar.com

শহর। সেই শহরগুলোকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধশালী নাগরিক সভ্যতার মাধ্যমে মানুষের প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়।

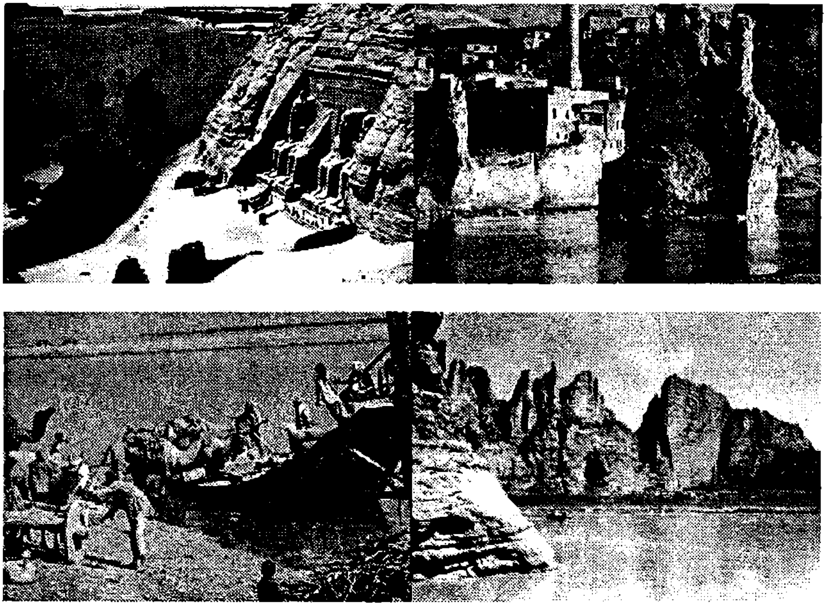

নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা এবং হোয়াংহো নদীর তীরে চীন সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

প্রাচীন সেই সভ্যতাকে খুঁজে পেয়েছে আজকের আধুনিক মানুষ। মাটি খুঁড়ে সে যুগের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে আজকের অনিসন্ধিৎসু মানুষ। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় সেসব ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের বড় বড় সৌধ, জমকালো রাজপ্রাসাদ, সোনার সিংহাসন, শান-বাঁধানো তকতকে ঝকঝকে রাস্তাঘাট এবং রাস্তার উভয়পার্শ্বে সুদৃশ্য পয়ঃপ্রণালী। কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট দুর্গ, গোসলের জন্য বিশালাকৃতির স্নানাগার ও শস্য রাখার জন্য বড় বড় গুদামঘর। আজকের মতো সেদিনও নগরগুলো লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। বিদেশ থেকে বাণিজ্যতরী এসে ভিড় করতো বন্দরগুলোতে।

সেদিনও আজকের মতো প্রাচীন সভ্যদেশগুলোর মধ্যে সুদৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। জল ও স্থল উভয়পথেই চলত বাণিজ্য। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রত্যেকটি দেশে ছিল স্বতন্ত্র। আর সৃষ্টি হয়েছিল স্বতন্ত্র বর্ণমালা এবং স্বতন্ত্র সাহিত্যের। এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞানেও উন্নতিলাভ করেছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। তবে বাণিজ্যের কারণে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় একের প্রভাব অন্যের উপর পড়েছিল। তাই প্রায় একই সময়ে সূত্রপাত হয়েছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের। অপরদিকে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ চর্চাও হয়েছিল একই সময়ে। তবে সমানভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি।

www.pathagar.com

কালের বিবর্তনে
সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার কয়েকটি শাখা

নাম	আবির্ভাব কাল (বর্তমান থেকে পূর্বে)	শাখা ও তার বিবর্তনের ধারা
ইওসিন	পাঁচ থেকে সাত কোটি বছরের মধ্যে	বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর জাতীয় প্রাণী ↓
ওলিগোসিন	সাড়ে তিন থেকে পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে	↓ প্রোপ্লিওপিথেকাস ↓
মায়োসিন	দেড় কোটি থেকে সাড়ে তিন কোটি বছরের মধ্যে	↓ অ্যানথ্রোপয়েড ↓ → প্যালিও পিথেকাস; শিভা পিথেকাস ↓; ড্রায়োপিথেকাস; ওরাং
প্লিওসিন	দশ লক্ষ থেকে দেড় কোটি বছরের মধ্যে	→ পিথেকানথ্রোপাস; সিনানথ্রোপাস
প্লিস্টোসিন	পঁচিশ হাজার থেকে দশ লক্ষ বছরের মধ্যে	↓ নিয়ানডারথাল ↓
বর্তমান	আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছরের মধ্যে	↓ ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি আধুনিক মানুষ

www.pathagar.com

যুগে যুগে মানব-সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পরিসংখ্যান

সভ্যতাভিত্তিক যুগ	সময়সীমা	সভ্যতা	তৎপরতা
পুরাতন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক (১ম ভাগ)	খ্রিস্টজন্মের ৫০ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত	চেলীয়	১. পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার নির্মাণ ২. নানা প্রকার পাথর চেনার কৌশল।
পুরাতন প্রস্তরযুগ (দ্বিতীয় ভাগ)	খ্রিস্টজন্মের ২৫ হাজার বছর ও ৫০ হাজার বছরের মধ্যে	মুস্তেরীয়	১. অঙ্গ আচ্ছাদনের উপায় আবিষ্কার ২. গুহাবাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। ৩. আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার। ৪. দলবদ্ধভাবে বাসের উপকারিতা। ৫. মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দেয়া।
নব্য প্রস্তরযুগ বা নিওলিথিক	খ্রিস্টজন্মের ৫ হাজার বছর আগে এবং ২৫ হাজার বছরের মধ্যে	অরিনেশীয় ম্যাগডালেনীয় প্রেদ মোস্তীয় প্রভৃতি	১. ড্রিল যন্ত্র, তীরধনুক, ভেলা ও নৌকা নির্মাণ। ২. কাপড় বোনার উপায় নির্মাণ। ৩. পশুপালন ব্যবস্থা। ৪. মৃৎশিল্প ও কৃষিকাজ উদ্ভাবন। ৫. লিপি আবিষ্কার।
তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ	খ্রিস্টজন্মের ১ হাজার বছর আগে এবং ৫ হাজার বছরের মধ্যে	সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়. মিশরীয়, চীন ও ক্রীট	১. সোনা, টিন, তামা, রূপা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সন্ধান। ২. অঙ্কের চার নিয়ম, ভগ্নাংশ, দ্বিঘাত সমীকরণ, জ্যামিতি ও পরিমিতির উদ্ভব। ৩. আকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে দিন, মাস বছর, গ্রহণ প্রভৃতি গণনার নিয়ম এবং গ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। ৪. ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচয় এবং শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। ৫. কাঁচ, চাকা, গাড়ি, জাহাজ আবিষ্কার। ৬. কৃষিকাজে পানিসেচের ব্যবস্থা।
লৌহ যুগ (১ম ভাগ)	খ্রিস্টিয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বছরের মধ্যে	গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতা ভারতবর্ষীয় সভ্যতা চীন সভ্যতা	১. গ্রিকদের দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি। ২. রোমান আমলে যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, যানবাহন, জাহাজ প্রভৃতির উন্নতি। ৩. ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি। ৪. চীনদের দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতি।

www.pathagar.com

ধাতু আবিষ্কার ও সভ্যতার অগ্রযাত্রা

সোনা

আজকের আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় মুক্ত অবস্থায় সোনা পাওয়া যায়। সোনার আপেক্ষিক গুরুত্বও বেশি। পাথরের ক্ষয়ের ফলে মুক্ত স্বর্ণরেণু ঝর্ণা বা নদীর পানির মাধ্যমে বাহিত হয়ে নদীগর্ভে ও নদীর তীলভূমিতে সঞ্চিত হয়। সোনার এই উজ্জ্বল বর্ণ আদি মানবকেও নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছিল। দীর্ঘদিন রোদ বাতাসে পড়ে থাকলেও সোনার ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। অর্থাৎ রাসায়নিক দিক থেকে সোনা একেবারে নিষ্ক্রিয়। আর্দ্র বায়ু, অক্সিজেন, পানি প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণভাবে ক্রিয়া করে যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। তাছাড়া সোনা বেশ নমনীয়ও। নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ যখন পাহাড়ে, পবর্তে, নদীর বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াতো তখনই সোনার ঔজ্জ্বল্য তাদের আকর্ষণ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর অন্যতম এই ধাতুটি সংগৃহিত হয়েছিল খ্রিস্টজন্মের প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে। পরের দিকে ব্যবহার হয়েছিল অলঙ্কাররূপে।

সোনা ও মূল্যবান পাথরের তৈরি অলঙ্কার

www.pathagar.com

গবেষকদের ধারণা, ধাতুর মধ্যে মানুষ সর্বপ্রথম সোনাকেই ব্যবহার করতে শিখেছিল। সুপ্রাচীন সুমের সভ্যতা ও মিশরের প্রাক-রাজবংশের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকেও স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে। তবে ঠিক কোন সময় মানুষ যে সোনাকে কাজে লাগিয়েছিল তা আজ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি।

তামা

সোনার মতো তামাকেও মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অতীতে মনে হয় আরও বেশি পাওয়া যেতো। প্রাচীনকালের মানুষ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত অধিকাংশ তামাকে নিঃশেষ করে গেছে।

মানুষ কবে থেকে তামা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল, তা সঠিকভাবে বলার কোনো উপায় নেই। নব্য প্রস্তরযুগে সোনার ব্যবহারের প্রায় সমসাময়িক সময়ে তামার ব্যবহার হয়েছিল বলে গবেষকদের ধারণা। তামার ব্যাপক ব্যবহারের সময়টাই তাম্রযুগ নামে খ্যাত। মিশরসহ অন্যান্য অনেক প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলোর সভ্যতা তাম্রযুগের।

তামার ব্যবহার যখন শুরু হয় তখন তামাকে গলাবার মতো এত উচ্চ-তাপমাত্রা (১০৮৫°) সৃষ্টি করার কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। ম্যালাকাইট জাতীয় আকরিক যা সাধারণত ৭০০° থেকে ৮০০° সেন্টিগ্রেডে গলে যেতে পারে তাকেই ব্যবহার করা হতো আর ব্যবহার করা হতো মুক্ত তামাকে।

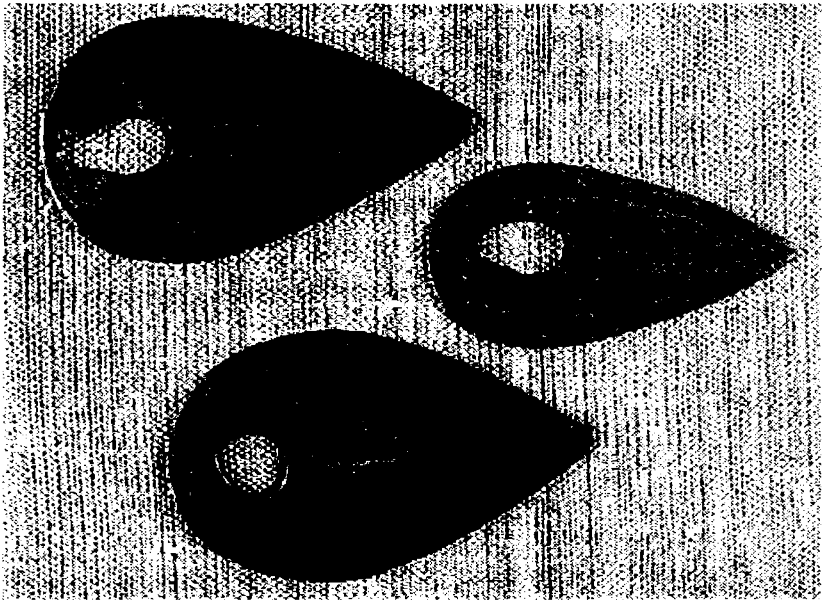

প্রাচীন মিশরে প্রাপ্ত একটি তামার অলঙ্কার

www.pathagar.com

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মুক্ত তামার রঙ লাল নয়। দীর্ঘদিন ধরে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকলে কালো অথবা সবুজবর্ণ ধারণ করে। গভেষকদের ধারণা, সেদিনের মানুষের মধ্যে কেউ হয়ত একদিন পাথর ভেবে কালো অথবা সবুজ তাম্রখণ্ডকে আগুনের সান্নিধ্যে এনেছিল অথবা ম্যালাকাইট জাতীয় আকরিক কিংবা মুক্ত তামাযুক্ত অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। ফলে লাল বর্ণের এই পদার্থটিকে দেখে বিস্ময়াবিভূত ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিল। পরের দিকে ওকেই নিয়োগ করেছিল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজে। যে কাঠকয়লার চুল্লীতে তারা মৃৎপাত্র পোড়াতো সেই চুল্লীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল ম্যালাকাইট আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন করা। আরও মনে করা হয়, প্রথম প্রথম তারা পাথরকে কেটে কেটে ছাঁচও তৈরি করতো। যেমন ছুরির ফলা, বর্শার ফলা, কুড়াল ইত্যাদির। তবে সেসব ছাঁচ ছিল একপাশ খোলা।

তামার ব্যবহার তথা তাম্রযুগের সূচনা কিন্তু রাতারাতি হয়নি। তামার পরিচয় লাভের পর কয়েক হাজার বছর পরই তামার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। সেদিন প্রতিটি মানুষকে খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করতে হতো। কৃষিকাজেরও ব্যাপক প্রসার হয়নি। নির্ভর করতে হতো পশু শিকার ও মৎস্য শিকারের উপর। তাতে সময় করে ধাতু নিষ্কাশন করিয়ে অস্ত্র নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তার পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ বছরের পরিচিত পাথরের হাতিয়ার খুব সহজে বানিয়ে ফেলতো। তাছাড়া মানুষের পুরাতনের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। তাই পাথরকে পরিত্যাগ করে তামাকে ব্যবহার করতে অনেক সময় লেগেছিল। মনে হয়, কৃষিকাজের প্রচলনের ফলে খাদ্যের জন্য সবাইকে যখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হলো না এবং দলবদ্ধ হয়ে যখন বসতি শুরু করলো তখনই তামার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়। পাথরের অস্ত্র অল্প কয়েকবার ব্যবহারের ফলে ভোঁতা হয়ে যায় এবং অধিকার বিস্তারের জন্য নানা দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে স্থায়ী অস্ত্র নির্মাণের জন্য তামার প্রয়োজন বেশি দেখা দেয়। পাথরের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেলে তাকে পরিত্যাগ করতে হতো কিন্তু তামার ক্ষেত্রে পুনরায় পিটিয়ে বা গলিয়ে নিলে পূর্বের মতো ধারালো করা যেতো। এই সুবিধাটুকু উপলব্ধি করায় পাথর যুগের পর শুরু হয় তাম্রযুগ।

ব্রোঞ্জ ও পিতল

ব্রোঞ্জ ও পিতলের ব্যবহার শুরু হয় তামা ব্যবহারের প্রায় হাজার বছর পর অর্থাৎ খ্রিস্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে। ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা ও টিনের সঙ্কর এবং পিতল হচ্ছে তামা ও দস্তার সঙ্কর। ব্রোঞ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৪ থেকে ১২ ভাগ এবং পিতলে দস্তার পরিমাণ থাকে শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগের মতো। এই দুটি সঙ্কর ধাতুর কথা মনে হলে স্বভাবতই মনে হবে সেদিনের মানুষ তামার পরই টিন ও দস্তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং পরিমাণ মতো মিশিয়ে সঙ্কর

www.pathagar.com

দুটিকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে উপরোক্ত ধাতু দুটির পরিচয় অজ্ঞাত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

গবেষকদের মতে, কোথাও কোথাও এমন সব তামার আকরিক পাওয়া যায়, যার সঙ্গে অবিশুদ্ধ হিসেবে মেশানো থাকে টিন। এখনও এই জাতীয় তামার আকরিক বহু জায়গায় দেখা যায়। আদিতে তামা নিষ্কাশন করতে গিয়ে মানুষ অনুরূপ আকরিককে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। ফলে লাভ করেছিল তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ আবার বিশুদ্ধ তামার চেয়ে কঠিন এবং গলনাঙ্ক কম। তাই পরবর্তী সময়ে ঐ জাতীয় আকরিকেরই ব্যবহার প্রচলিত হয়। সেই থেকে শুরু হয় ব্রোঞ্জ যুগ। পরে হাপর আবিষ্কার, কামারশালা স্থাপন ইত্যাদি হলে মানুষ টিনের খোঁজ করতে থাকে। খ্রিস্টজন্মের দুই হাজার বছর বা তারও কিছু পরে ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

তামার অন্য একটি সঙ্কর পিতলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতবাদ প্রযোজ্য। পিতলও বেশ দৃঢ় এবং মজবুত। তার উপর তামা অপেক্ষা এর গলনাঙ্ক কম। তামার সঙ্গে মিশ্রিত দস্তার আকরিককে গলিয়েই প্রথম সন্ধান পেয়েছিল পিতলের।

বহু গবেষকের মতে পিতল প্রথম ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হয়েছিল। অবশ্য সমসাময়িক সময়ে এখানে ব্রোঞ্জের প্রচলনও ছিল। ভারতবর্ষীয় পিতল অন্যত্র চালান যেতো বলেও গবেষকদের ধারণা। কারণ, সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত পিতলের যে নমুনা পাওয়া গেছে তার মান অন্যান্য সভ্যতার পিতল অপেক্ষা বেশ উন্নত।

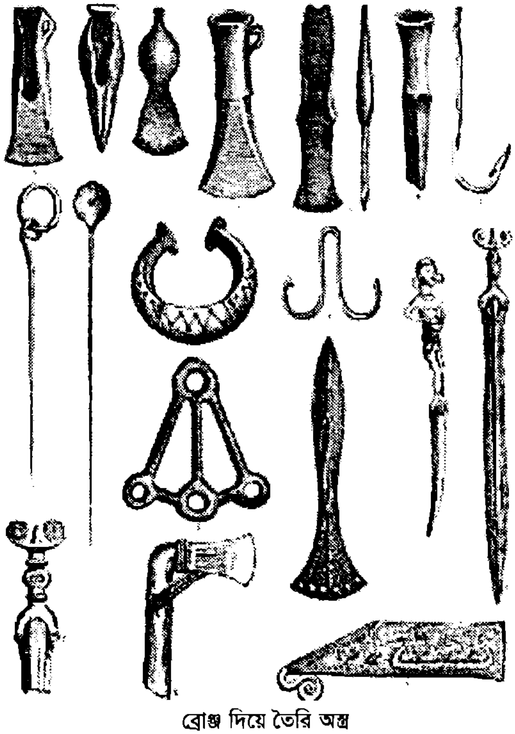

ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি অস্ত্র

খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধাতু দ্রব্যের মধ্যে ব্রোঞ্জ মূখ্যস্থান অধিকার করে। মিশরে সেদিন ব্রোঞ্জ তৈরির জন্য পারস্য ও অন্যান্য জায়গা থেকে টিন সংগ্রহ হতো বলে অনেকে মনে করে থাকেন। অপরদিকে ব্রোঞ্জ যুগের

www.pathagar.com

সূত্রপাত হলে প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলো তামা ও টিন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই থেকে ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটে। বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যেমন উদ্ভব হয়, তেমনই আরও কতকগুলো ধাতুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। তাদের মধ্যে রূপা ও সীসা প্রধান। সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলো থেকে ব্রোঞ্জ, পিতল, রুপা ও সীসার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে।

লোহা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে লোহা আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে লোহার ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই তুমুল এক আলোড়নের শুরু হয় এবং প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে মানুষ।

লোহার যুগ ব্রোঞ্জযুগের পরে শুরু হলেও ব্রোঞ্জ যেমন পাথর ও তামাকে অনুসরণ করে এসেছে তেমনটি লোহা আসেনি। কথিত হয়েছে, এমন কিছু কিছু জাতি ও উপজাতি ছিল যারা পাথর থেকে সরাসরি লৌহযুগে পদার্পণ করেছিল। মনে হয় ঐসব জাতি ও উপজাতির কাছ থেকে পৃথিবীতে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

লোহা ব্যবহারের বহু প্রাচীন নমুনাও হস্তগত হয়েছে। সেসব নমুনাগুলোকে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, খ্রিস্টজন্মের চার হাজার বছর আগেও মানুষ লোহার টুটরোকে মালার মতো করে গলায় পরতো। সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু লোহার পুঁতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

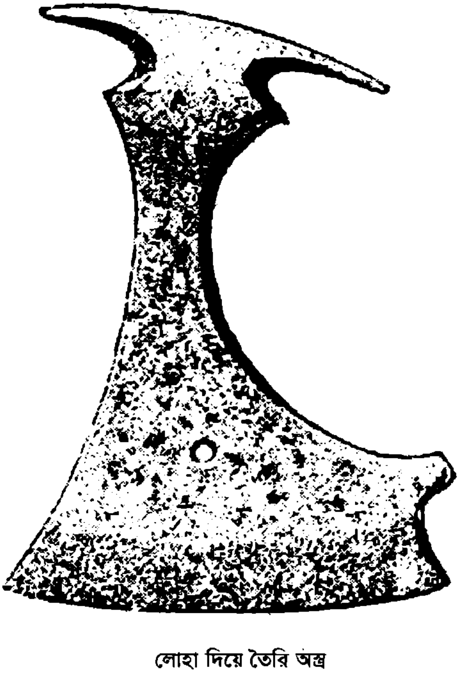
লোহা দিয়ে তৈরি অস্ত্র

কিন্তু লোহার ব্যবহার প্রাচীন হলেও লোহাকে নিষ্কাশন করতে পারেনি সেদিনের মানুষ। ওরা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতো। উল্কাপতনের ফলে যেগুলো পৃথিবীর বুকে সচরাচর পাওয়া যেতো সেগুলো সাধারণত লৌহপ্রধান এবং ওগুলোই তারা ব্যবহার করতো লোহাপাথরের সঙ্গে সহসা পরিচয় হয়নি তাদের।

গবেষকদের ধারণা, প্রথম লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহশিল্পের প্রচলন হয়েছিল এশিয়া মাইনরের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে। এখানকার লোহাপাথর বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। অতি উন্নত শ্রেণীর লৌহ

www.pathagar.com

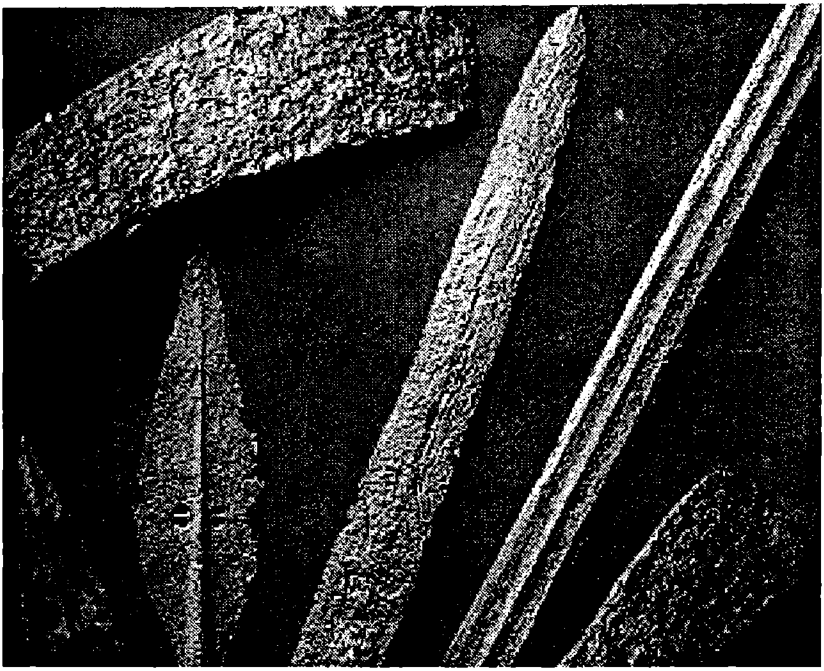

হিটটাইটরা কাঠকয়লার চুল্লিতে লোহাকে গলিয়ে তৈরি করে নানাধরনের অস্ত্র

আকরিক ম্যাগনাটাইট থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লোহা তৈরি করেছিল প্রায় দেড়হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এখানে বাস করতো হিটটাইট নামে এক জাতি। কালক্রমে তারা এখানে একটা বিশাল লৌহ-শিল্পনগরী গড়ে তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সেখানকার ধ্বংসাবশেষ থেকে। সেখানে একটি চিঠিও পাওয়া গেছে। সে চিঠিটা ১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা এবং চিঠিতে তৎকালীন মিশরের রাজা হিটটাইটদের রাজাকে সোনার পরিবর্তে লোহা পাঠাবার অনুরোধ করেছেন।

হিটটাইটরা কাঠকয়লার চুল্লীতে লোহাপাথরকে গলিয়ে লোহা নিষ্কাশন করতো। দোরিয়, কেল্ট প্রভৃতি উপজাতি লোহাকে হস্তগত করে একদিন প্রবলও হয়ে উঠেছিল এবং ওদের আক্রমণের ফলে বহু জায়গায় ব্রোঞ্জযুগের অবসান হয়েছিল খ্রিস্টজন্মের প্রায় ১১০০ বছর আগে। আর ঠিক ঐ সময় থেকেই লৌহ নির্মিত অস্ত্রের উপযোগিতা সবার কাছে ধরা পড়ে এবং লোহা ব্যবহারের প্রচলন বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও সভ্যতার নতুন যাত্রা

কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি ॥ বস্ত্র তৈরি ॥ গৃহনির্মাণ ॥ মৃৎপাত্র তৈরি
ভেলা ও নৌকা তৈরি ॥ কাচ এবং চাকা আবিষ্কার

কৃষি উপযোগী যন্ত্রপাতি

বিজ্ঞান সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পৃথিবীকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ যখন অরণ্য ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল এবং হ্রদ ও নদীর তীরে বসবাস শুরু করেছিল তখনই কৃষিকাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তাদের। পর্বতের গুহায় এবং অরণ্যে থাকাকালে রুক্ষ মাটিকে কর্ষণ করা সম্ভব হয়নি, তাই সম্ভব হয়নি কৃষির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা। অপরদিকে নদীতীরে বছরের বিশেষ এক সময় দানা জাতীয় শস্যকে আপনা আপনি জন্মাতে দেখে এবং তার সুস্বাদু দানাগুলোকে ভক্ষণ করে মানুষ চাষের দিকে আকর্ষণ অনুভব করেছিল বলে গবেষকরা অনুমান করেছেন।

প্রাচীন মিশরীয়রা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকাজে উন্নতি সাধন করেছিল

www.pathagar.com

অনেকের ধারণা, মানুষ প্রথমে নদীতীরের পলিমাটিকে পাথরের ফলা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে আলগা করতো। কিন্তু এই ব্যাঁপারটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ এক ঋতুতে যেহেতু ফসল বোনার কাজ শেষ করতে হতো তাই অধিক জমি চাষ করা সম্ভব হতো না। তারই প্রত্যক্ষ ফল লাঙ্গল আবিষ্কার।

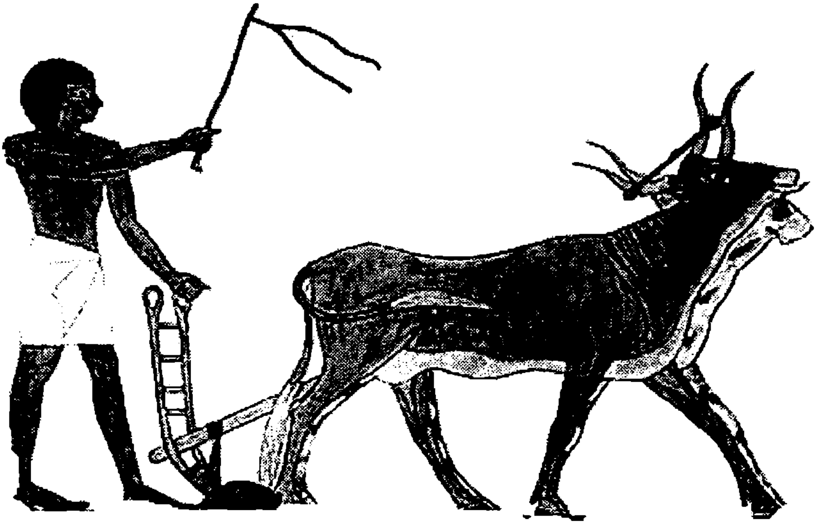

প্রাচীন মিশরীয়দের আবিষ্কৃত লাঙ্গল

প্রথম লাঙ্গল ছিল পাথরের তৈরি। আজকের লাঙ্গলের আকারের বাঁকানো মোটা গাছের ডালের তলায় বেঁধে দিত পাথরের ফলক। সে লাঙ্গলকে একজন ধরতো এবং আর একজন টানতো। বিশেষ বেগ পেতে হতো না নদীর তীরে বা নদীগর্ভের পলিমাটিকে আলগা করতে।

পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতির ফলে শত শত বছরের ব্যবধানে লাঙ্গলেরও উন্নতি হয়েছিল। তবে পশুর দ্বারা লাঙ্গল টানা হয়েছে বেশ পরে। তার কারণ গরু, মহিষ প্রভৃতিকে মানুষ পরের দিকেই পোষ মানিয়েছিল।

প্রসঙ্গত পশু পালনের কথাটাও উল্লেখ করতে হয়। নব্য প্রস্তরযুগের বহু আগে মানুষ, কুকুর ও বলগা হরিণকে পোষ মানিয়েছিল। কুকুর তাদের শিকারে সাহায্য করতো এবং বলগা হরিণের দুধ ও মাংস খেতো। তারপর তারা মেষ প্রতিপালন করেছিল এবং উক্ত অবস্থায় বহু দল যাযাবরের জীবন-যাপন করতো। গবাদি পশুকে তারা পোষ মানিয়েছে আরও পরে।

কিছুদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল, যে সব জন্তু মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে তাদের পোষ মানানো যায় না। অপরদিকে তৃণভোজীরা যেন স্নেহের কাঙাল। পর্যাপ্ত খাওয়া এবং সামান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে তৃণভোজীরা

www.pathagar.com

সহজে অনুগত হয়ে পড়ে। তাই লাঙ্গল টানার জন্য তারা ডাক দিয়েছিল শক্তিশালী তৃণভোজীদের তথা গবাদি পশুকে।

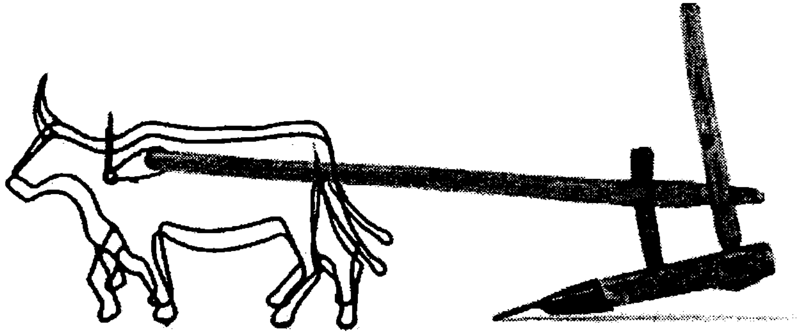

চীনাদের তৈরি লাঙ্গল

লাঙ্গল আবিষ্কার ও গবাদি পশুকে পোষ মানানোর পর কৃষিকাজের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। লাঙ্গলের উন্নতি হয়েছিল এবং প্রয়োজনানুযায়ী কৃষি-যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করেছিল। প্রথম প্রথম এসব যন্ত্রপাতি ছিল পাথরের। পরে তামাকে কাজে লাগায়। অবশেষে লৌহযুগ শুরু হলে তামার পরিবর্তে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। এখনও কৃষিতে লোহা দিয়ে নির্মিত যন্ত্রপাতি বেশি ব্যবহৃত হয়।

কাপড় বা বস্ত্র তৈরি

মানুষ প্রথমে ছিল উলঙ্গ। তারপর পুরাতন প্রস্তর যুগের শীতল পরিবেশ অতিক্রমের সময় বুদ্ধি করে পশুর চামড়া দিয়ে শীত নিবারণ করতো। এসব ঘটনা ঘটেছিল মানুষের আগুন আবিষ্কার করার আগেই।

পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে নব্য প্রস্তরযুগ পর্যন্ত চলে আসছিল সেই একই ব্যবস্থা। এমনকি খ্রিস্টজন্মের প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে তুষার যুগটা অপসৃত হলেও মানুষ পশুর চামড়া পরিত্যাগ করেনি। যদিও তখন মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই একসঙ্গে দলবেঁধে বাস করছে। উক্ত পরিবেশে লজ্জা নিবারণের প্রশ্নও তাদের মনে স্থান লাভ করেছিল।

পশুর চামড়াকে যদিও কেটে এবং পরে সেলাই করে তারা পরিধান করতো তবুও অসুবিধা ছিল অনেক। একদিকে চামড়ার বিশ্রী গন্ধ এবং অপরদিকে গরমের সময় পায়ে জড়িয়ে রাখার অস্বস্তি। এসব সমস্যা মানুষকে অন্য কোনো পরিধেয়ের সন্ধান করতে প্রবৃত্ত করায়। তারই প্রত্যক্ষ ফল গাছের বাকল পরিধান।

নব্য প্রস্তর যুগের অনেক আগেই মানুষ অরণ্যে তুলার সন্ধান পেয়েছিল। দশ-বার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই তুলা থেকে সুতা তৈরি করেছিল। ঐ সুতা দিয়ে তারা মাছ ধরার জাল তৈরি করতো এবং কৌপিনের মতো সুতার গাছকে পুরুষেরা পরিধানও করতো। তবে মেয়েরা কটিবাস ও আবরণী হিসেবে ব্যবহার করতো পশুর চামড়াকে।

www.pathagar.com

সেদিন তুলা এবং সুতা দুইই ছিল দুস্প্রাপ্য। মানুষ কৃষিকাজে রপ্ত হওয়ায় ফসলের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় তুলার চাষও শুরু করে। সুতা বেশি পরিমাণে হাতের কাছে আসায় সুতা থেকে বস্ত্রবয়নের উপায় চিন্তা করে। প্রথমে কাপড় বোনার জন্য তারা তাঁত স্থাপন করতে পারেনি। কাঠের চৌকো ফ্রেম বেঁধে সুতার টানা বাঁধতো। তারপর হাত দিয়ে একটা ছেড়ে একটার ভেতর দিয়ে সুতা ঢুকিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে কেবলমাত্র কটিদেশে জড়ানোর মত একখানা বস্ত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হতো।

প্রাচীন সেই বস্ত্রের নমুনা প্রাচীন মিশরীয় ছবিতে দেখা যায়। প্যাপিরাসের উপর আঁকা ছবিতে রাজা-রানীর গায়ে অলঙ্কারের যথেষ্ট ঘটা দেখা গেলেও কাপড়টা কিন্তু হাঁটুর উপর অথবা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। কেবলমাত্র কটিদেশে জড়ানো ছাড়া কাপড়ের বাহুল্য দেখা যায় নি। কেবল কোথাও কোথাও নারীদেহের বক্ষাবরণী হিসেবে একটুখানি ওড়নার মতো ব্যবস্থা।

কাপড় দুস্প্রাপ্য হওয়ায় এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের পিতামাতার যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তাতেও দেখা যায় মিশরীয় চিত্রানুযায়ী কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত। অনেক পরে কাপড় বোনার জন্য তাঁত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তুলা ছাড়া পশুর লোম ও রেশমকে বস্ত্র বয়নের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থায় ভারতবর্ষই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কেননা রোমানদের আমলে ভারবর্ষ থেকে রোমে সুতি ও রেশম বস্ত্র রপ্তানি হতো।

নিজের হাতে তৈরি বস্ত্র পরিধান করেছে প্রাচীনকালের মানুষ

www.pathagar.com

গৃহ নির্মাণ

তুষার যুগের শেষে মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর গুহার মতো ঘর তৈরি করতে শিখল। যে ঘরে ডালপালা পুঁতে কাদার প্রলেপ দেয়া থাকতো। অনেকটা এস্কিমোদের ইগলুর মতো। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাসগৃহের চেহারাও পরিবর্তিত হলো। বিশেষ করে যতদিন থেকে সে হ্রদ কিংবা নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো ততদিন থেকেই গুহার আকারে বাসগৃহ অন্তর্হিত হলো।

বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ হ্রদের উপর অথবা নদীর উপর গৃহ নির্মাণ করেছিল। বন থেকে মোটা মোটা গাছ কেটে বয়ে আনতো এবং খুঁটির মতো পুঁততো। তারপর পানির উপর সরু সরু ডালপালা পুঁতে দিতো। চারদিকটা ঘিরেও ফেলতো ডালপালা দিয়ে এবং ছাউনি দিতো বড় বড় ঘাস দিয়ে। তিন কিংবা চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মানুষ ইট কেটে এবং তাকে পুড়িয়ে অট্টালিকা নির্মাণ শুরু করে।

প্রাচীনকালের মানুষেরা নিরাপদে থাকার জন্য এভাবেই গৃহ নির্মাণ করতো

মৃৎপাত্র

নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের এক বড় অবদান হচ্ছে মৃৎপাত্র নির্মাণ। পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ পাথর কেটে কলসি, বাটি ইত্যাদি যে তৈরি করতো সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবত নদী তীরে বসতি গড়ে ওঠায় এবং পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মাটির পাত্র তৈরির দিকে মানুষের ঝোঁক আসে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম মৃতপাত্র নির্মাণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরই কাজ। শিশুমাত্রই অনুকরণপ্রিয়। যা দেখে তাকে নিজ হাতে গড়তে চায়। আমরা ধরে নিতে

www.pathagar.com

পারি, সেদিনের শিশুরাও খেলাঘরের পুতুল তৈরি করতো, রান্নাখেলা খেলতো এবং ঐসব করতে গিয়ে নদীতীরের অথবা হ্রদের তীরের নরম কাদামাটি দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী তৈরি করে নিতো। কাদা দিয়ে পাত্র তৈরির মতো এমন ছেলেখেলা সেদিনের কর্মঠো মানুষের মনে আদৌ স্থান পায় নি, তাছাড়া এমন চিন্তা করার সময় বা কোথায় ছিল?

ছেলেমেয়েদের তৈরি মাটির পাত্র একদিন বড়দের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করে থাকবে এবং পরিশ্রম করে পাথর কাটার বদলে মাটি দিয়ে পাত্র নির্মাণের কথা মাথায় আসতে শুরু করে। ফলে ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করে বড়রা এবং পরের দিকে কাঠকয়লার চুলায় তা পুড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে। মৃৎপাত্র নির্মাণের অনেক পরে চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভেলা ও নৌকা তৈরি

নদীর উপর ভেসে থাকার প্রথম আবিষ্কার হচ্ছে ভেলা। নৌকার আদিরূপ ভেলা। হ্রদের উপর যখন বসতি স্থাপন করে তখন তীরের সঙ্গে যোগাযোগের বাহন ছিল ভেলা অথবা শুকনো গাছের গুঁড়ি। সে সময় মাছ ধরার জন্য পশুর চামড়া দিয়েও একরকম নৌকা তারা তৈরি করতো, এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

ভেলার পরবর্তী রূপ গাছের গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে ফেলে এবং পরে কুরে কুরে ডোঙার রূপ প্রদান করে। অতঃপর অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি হলে তারা প্রকৃত নৌকা তৈরি করতে সমর্থ হয়।

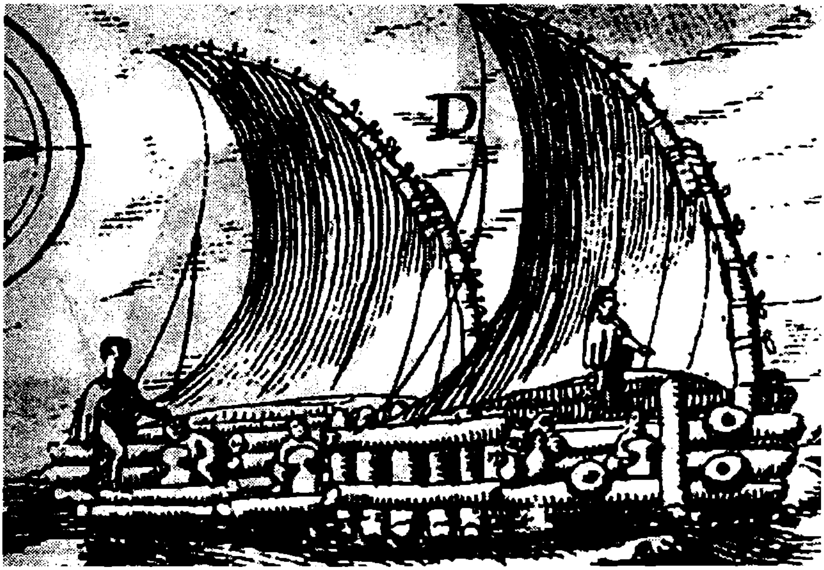

ভেলা : নদীর উপর ভেসে থাকার প্রথম আবিষ্কার

www.pathagar.com

ভেলা থেকে নৌকা তৈরি পর্যন্ত যদিও অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে, তবুও বলতে হবে খুব তাড়াতাড়ি মানুষ সে ধাপগুলো অতিক্রম করেছে। তার কারণ, পরিশ্রম লাঘব ও পরিবহনের কাজে নৌকা যে প্রধান সহায়ক—এ কথা সেদিনের মানুষ বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাছাড়া নৌকাযোগে তাড়াতাড়ি নদীপথে যাতায়াতও করা যেতো। তাই নৌকার উন্নতিতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

বাতাসের অভিমুখ ও গতিবেগকে ব্যবহার করে নৌকা চালাতে মানুষকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও। মিশরে প্রাপ্ত প্যাপিরাসের উপর এবং মৃৎপাত্রের উপর আঁকা নৌকার যে ছবি দেখা যায় তাতে পালও চোখে পড়ে। একটি চিত্র খ্রিস্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আঁকা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। সেটি ভেলার অনুরূপ। তবে লম্বায় বেশ বড়। মাঝখানে ছাউনি এবং পাল খাটানোর সরঞ্জাম। মূল ভেলাটি প্যাপিরাসের বান্ডিল বলে সন্দেহ করা হয়। আরও নজির পাওয়া গেছে, সেদিনের অনুরূপ নৌকা এত বড় হতো যে, দু-তিনশো লোক তাতে অনায়াসে চড়ে নদী বা হ্রদ অতিক্রম করতে পারতো।

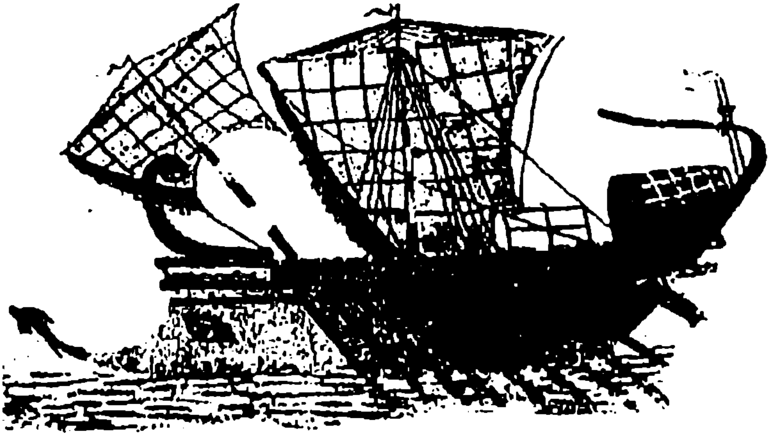

ভেলা আবিষ্কারের পর মানুষ আরও আধুনিক নৌকা আবিষ্কার করতে শিখল

কাঁচ আবিষ্কার

কাঁচ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অন্যতম আবিষ্কার। অনেকের মতে কাঁচ নব্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার। কাঁচের এমন কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে যা দেখে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, প্রায় সাত হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তারও আগে কাঁচ প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ সাড়ে তিন কিংবা চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে কাঁচের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। অনেকের মতে প্রাচীন সভ্যতার গোড়ার দিকে মিশর অপেক্ষা মেসোপটেমিয়া কাঁচশিল্পে অধিক উন্নত ছিল। দুই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে মিশর যে কাঁচ উৎপাদনে সমস্ত

www.pathagar.com

সভ্যদেশকে ছাড়িয়ে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল—এ বিষয়ে আজ গবেষকরা একমত হয়েছেন। তবে সে কাচ আজকের মতো স্বচ্ছ ছিল না।

গবেষকের মতে মানুষ কাঁচ তৈরির অনুরপ্রেরণা লাভ করেছিল বজ্রপাতের ফলে উৎপন্ন কাঁচ থেকে। সোডিয়াম লবণ মিশ্রিত বালির সন্নিকটে বজ্রপাত হলে কাঁচের মতো বস্তু উৎপন্ন হয়—এমন নমুনা আজকাল অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন। আদিতে অনুরূপ পদার্থ লাভ করায় সেদিনের অনুসন্ধিৎসু মানুষ এমন চমৎকার পদার্থটিকে তৈরি করতে প্রয়াসী হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেদিন মানুষের বিপদ ছিল সর্বত্র এবং প্রাকৃতিক বহু রহস্যই ছিল তাদের অজানা। ওদের চোখ-কান সব সময় খোলা থাকতো। ভাবালুতা ছিল না, ছিল না মৃত্যুভয়। বাহুতে যেমন প্রচণ্ড শক্তি ছিল তেমনই বুকে ছিল অসীম সাহস। যা দেখতো তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করতো এবং কাজে লাগাতেও সচেষ্ট হতো। তাই নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তিতে তারা আজকের সুসভ্য মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল মনে করা যেতে পারে। কাঁচও তাই তাদের উদ্ভাবনী শক্তির চরম বিকাশ বলা যেতে পারে। তবে কোথায় কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলার কোনো উপায় নেই।

খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর পূর্বে মিশরীয়রা ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে তারা তাম্রঘটিত লবণ ব্যবহারের দ্বারা নানা রঙ-বেরঙের কাচ উৎপন্ন করতে সমর্থ

প্রাচীন মিশরীয়দের ব্যবহৃত কাচপাত্র

www.pathagar.com

হয়েছিল। এগুলোর দ্বারা প্রধানত ছোট-বড় ও নানা কারুকার্যখচিত পানপাত্র নির্মাণ করতো। যেহেতু কাঁচ সান্দ্র পদার্থ, তাই ওর কোমলায়ন পদ্ধতি কিংবা ফুঁ দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুর রূপ প্রদান করা সেদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আগে বালি ও মাটির দ্বারা নিরেট এক পাত্র প্রস্তুত করতো এবং তার উপর কারুকার্যের ব্যবস্থা করতো। তারপর প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে তার গায়ে উত্তপ্ত কাচের প্রলেপ দিত। ধাতব পাত্রের গায়েও প্রলেপ দিত ঠিক একই উপায়ে। ফুঁ দিয়ে কাচের পাত্র প্রস্তুত খ্রিস্টজন্মের প্রায় বারশ বছর আগে সেই মিশরেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

চাকা আবিষ্কার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে চাকা আবিষ্কার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কোন শিল্পী যে প্রথম চাকার পরিকল্পনা করেছিল তা আজ বলার কোনো উপায় নেই। তবুও যার মাথায় এর পরিকল্পনা প্রথম এসেছিল তার মতো অসাধারণ কারিগর পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ হতে পারেন না।

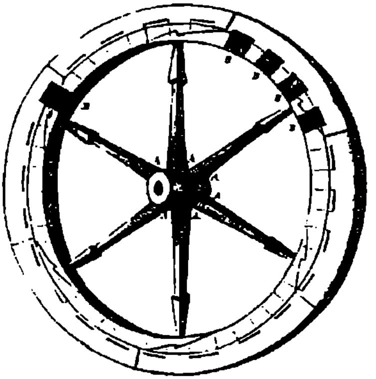

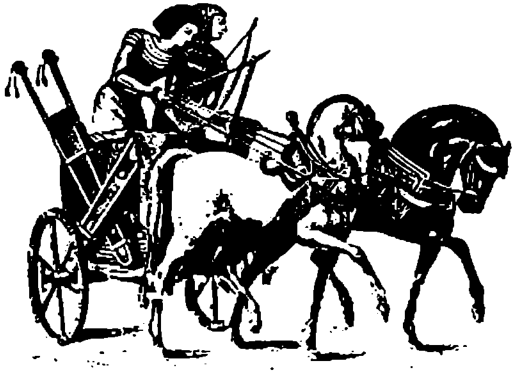

গবেষকরা অনুমান করেন মিশরীয়রা সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করে এবং চাকা দিয়ে পশুচালিত যান নির্মাণ করে

www.pathagar.com

চাকার সুপ্রাচীন ইতিহাস ও নমুনা কিন্তু আবিষ্কৃত হয়নি। তার একমাত্র কারণ, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কাঠ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। নমুনা যা পাওয়া গেছে তা প্রায় সাড়ে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের চিত্র। সে চিত্র পাওয়া গেছে সুমের সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতায়। সিন্ধু সভ্যতায় এবং ক্রীটিয় সভ্যতায়ও অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সেদিনের চাকা ব্যবহার করা হয়েছিল পরিবহনের জন্য এবং মৃৎপাত্র নির্মাণে। সুমেরীয়রা চার চাকার রথ তৈরি করতো। পরবর্তী তাম্রযুগে চাকার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাধারণত দুটি অর্ধবৃত্তাকার কাঠখণ্ডকে দুই পাশে তামার পেরেক দিয়ে আবদ্ধ করা হতো। তারপর অক্ষদণ্ডের সঙ্গে ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হতো। পরের দিকে অক্ষদণ্ডকে চাকার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করতে করতে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

গবেষকদের ধারণা, প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলো একই সঙ্গে চাকা ব্যবহারে রপ্ত হয়নি। সিন্ধু সভ্যতায় ও সুমেরীয় সভ্যতায় চাকার নিদর্শন বহু প্রাচীন। মিশর চাকা ব্যবহার করেছে খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে। কথিত আছে, হিসকক নামে পশ্চিম এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতির কাছ থেকে মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার শিখেছিল। এমন বহু জাতি ছিল, যারা খ্রিস্টজন্মের মাত্র পাঁচশ বছর আগেও চাকার ব্যবহার জানতো না।

চাকাকে মানুষ প্রথম কিভাবে যে ব্যবহার করেছিল তা আজ বলার কোনো উপায় নেই। একদল গভেষকের মতে কুমোর শ্রেণীর মানুষেরা মৃৎপাত্র তৈরি করতে গিয়ে প্রথম চাকার ব্যবহার শিখেছিল, অপর দল মনে করেন ঘর্ষণকে উপেক্ষা করতে পরিবহনের কাজে চাকার ব্যবহার আদিম কাল থেকেই মানুষ শিখেছিল। সে যাই হোক না কেন, চাকার আবিষ্কারই যে আজ মানুষকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একদিকে কুমোররা অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে বহু মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, অপরদিকে পরিবহন ব্যবস্থায় হয়েছে উন্নতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও এসেছে সাফল্য। সেই প্রাচীনকালেও চাকাযুক্ত রথকে টানার কাজে মানুষ পশুকে ব্যবহার করতো।

www.pathagar.com

প্রাচীন সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

(খ্রি. পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রি. পূর্ব ৩০০০ অব্দ)

সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুমেরীয় সভ্যতাই সুপ্রাচীন সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে ওরা গৃহপালিত পশুদের ভূমি কর্ষণের কাজে নিয়োগ করেছিল এবং কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচের জন্য নদী থেকে খাল কেটে এনেছিল।

সুমেরীয় সভ্যতায় কৃষিক্ষেত্রে এভাবেই পানি সেচের ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিল

দুজন ব্যাবিলনীয় লিপিকার

ব্যাবিলনীয়রা সেই আমলেই আবিষ্কার করেছিল লেখার পদ্ধতি। তাদের আবিষ্কৃত সেদিনের সেই বর্ণমালা থেকে পরবর্তীকালে 'কিউনিফর্ম' বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। আর সুমেরীয়দের প্রতিষ্ঠিত এই সভ্যতাটি হচ্ছে সুসভ্য নগরসভ্যতা।

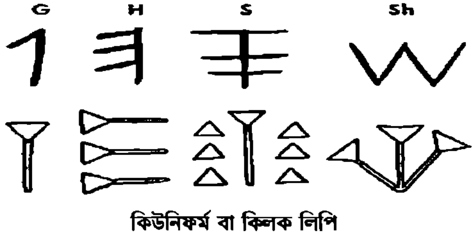

কিউনিফর্ম বা কিলক লিপি

www.pathagar.com

গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা চাকা আবিষ্কার করেছিল। চাকার সাহায্যে যান নির্মাণ করতো এবং সে যান টানতো গৃহপালিত পশুরা। পানিপথে যাতায়াতের জন্য ভেলা ও নৌকা তৈরি করতো। মৃৎশিল্পে এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পেও ছিল তারা অগ্রসর।

তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে তারা পাথরের পরিবর্তে তামার ব্যবহার করতে শেখে। অর্থাৎ প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগে পদার্পণ করে। পরের দিকে টিনের সঙ্গেও পরিচয় হয় এবং ব্রোঞ্জ নামক সঙ্কর ধাতুটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। ব্রোঞ্জ তৈরির পর তারা কারিগরি বিদ্যায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। নানাবিধ আসবাবপত্র, অলঙ্কার, মূর্তি, সীলমোহর ও অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করতো।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে সুমেরীয়রা পাটীগণিত, পরিমিতি ও জ্যামিতির চর্চা শুরু করেছিল। তাই সুমেরীয়দের গাণিতিক জ্ঞান বহু পূর্ব থেকেই লাভ করেছিল। অপরদিকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বলে জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল এবং বর্ষারম্ভ গণনা করতো। বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও গোলকের আয়তন নির্ণয়ের কৌশল তারা আবিষ্কার করেছিল—এমন মতও অনেকে পোষণ করে থাকেন। পূর্তবিদ্যা ও গৃহনির্মাণে ছিল যথেষ্ট পারদর্শী।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুমেরীয়রা খুব বেশি উন্নতি করেনি বলে গভেষকদের। তবে ঋতু পরিবর্তনের জ্ঞান ছিল এবং বছরের প্রথম মাসকে বৃষ রাশির নামানুসারে নামকরণ করেছিল। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলেও কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি।

২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সুমেরীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। তারপর বহিঃশত্রুর আক্রমণে ঐ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানকার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে ব্যাবিলনের হাম্মুরাবি রাজবংশ।

সম্রাট হাম্মুরাবির মূর্তি

হাম্মুরাবি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তার শাসনকাল পৃথিবীর ইতিহাসে একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম শাসন সংক্রান্ত কতকগুলো আইন প্রণয়ন করেন। সেই আইনগুলো 'কোড অব হাম্মুরাবি' বা হাম্মুরাবি সংহিতা নামে আজও প্রসিদ্ধ। হাম্মুরাবিই প্রথম উল্লেখ করেছিলেন 'আইনের চোখে সবাই সমান'। অন্যদিকে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান চর্চাও শুরু হয়। ফলে হাম্মুরাবির পরবর্তী সম্রাটদের সময় বিজ্ঞান ধারাবাহিক উন্নতি লাভ করে।

www.pathagar.com

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই আছে ব্যাবিলনীয়দের মহত্তম অবদান। পাটীগণিতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—সাধারণত এই চার নিয়ম নয়, দশমিক পদ্ধতি, ভগ্নাংশ, বর্গমূল ও ঘনমূল তাদের জানা ছিল। বীজগণিতের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিলেন ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতেরা। এমন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ব্যাবিলনীয়রা একঘাত, দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। অমূলদ সংখ্যা সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প ধারণা ছিল বলে গভেষকরা মনে করে থাকেন। আরও আশ্চর্যের কথা, বীজগণিতের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা আকাশের গ্রহদের গতিবিধি নির্ণয় করতো। অর্ধবৃত্তস্থ কোণের পরিমাণ যে এক সমকোণ হয় এই সত্যের উদ্ভাবকও ছিলেন ব্যাবিলনীয়রা।

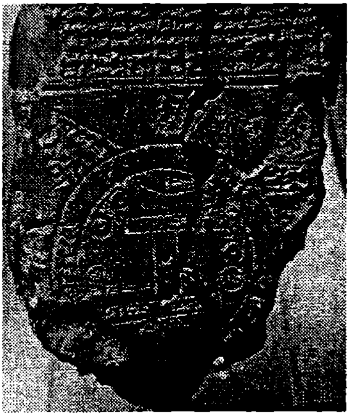
ব্যাবিলনীয়দের তৈরি বিশ্ব মানচিত্র

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয়দের অবদানের কোনো তুলনাই হয় না। পঞ্জিকা গণনাও তারা ভালোভাবে করতো। তারা হিসাব জানতো চান্দ্রবছর ও সৌরবছরের। ফলে ঋতুকে ঠিক রাখার জন্য তারা কোনো কোনো বছর ১২-এর পরিবর্তে ১৩ মাস ধরতো। অর্থাৎ বাংলা পঞ্জিকায় যেমন চান্দ্রবছর ও সৌরবছরের মধ্যে সক্ষমতা ঠিক রাখার জন্য প্রতি তিন বছর অন্তর একটি মাসকে মূলমাস ধরা হয় এবং উক্ত মাসটিতে সমস্ত শুভ কর্ম নিষিদ্ধ করা হয়, এও যেন অনেকটা তেমনই।

গ্রহণ গণনা ব্যাবিলনীয়দের আর এক কৃতিত্ব। এরা স্যারোস চক্রের উদ্ভাবক। ঐ চক্র অনুযায়ী তারা প্রতি ১৮ বছর ১১ দিনে ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ ও ৪২টি সূর্যগ্রহণকে স্থান দিয়েছিল। প্রতি ৫৪ বছর ১ মাস পর গ্রহণগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে—এই সিদ্ধান্তও তাঁদেরই। এই নিয়ম ১২০০ বছর ধরে মেনে চলার জন্য ১২০০ বছরের গ্রহণের চক্রবৎ অনুসরণের নীতিকে তারা স্যারোস চক্র নাম দিয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই নিয়ম আজও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অয়নচল সংক্রান্ত তথ্যও ব্যাবিলনীয়দের আবিষ্কার। প্রখ্যাত গ্রিক জ্যোতির্বিদ হিপারকাসের বহু পূর্বে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ কিদিননু উক্ত আবিষ্কারটি করে গেছেন।

গ্রহদের গতিবিধি সংক্রান্ত বহু নির্ভুল তথ্য তারা আবিষ্কার করেছিলেন। শুক্র গ্রহ যে প্রতি আটবছরে পাঁচবার আকাশের বিশেষ একটি জায়গায় অবস্থান করে—এই সত্যেরও আবিষ্কারক তারাই।

ব্যবিলনীয়রা বছরকে মাসে, মাসকে সপ্তাহে ও দিনে ভাগ করেছিল। সপ্তাহের সাত দিনকে সাতজন দেবতার নামে তারা চিহ্নিত করেছিল। সাত দিনের বারগুলো

www.pathagar.com

ছিল যথাক্রমে নিনিব, মার্দুক, নেগাল, শামাশ, ইশতার, নাবু ও সিন। ওরা দিনকে আবার ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেছিল। পানিঘড়ি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদির সাহায্যে সময়ও নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

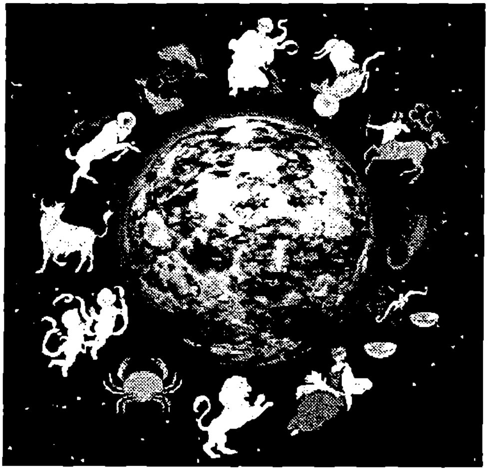

ব্যাবিলনীয়দের তৈরি রাশিচক্র

জ্যোতির্বিজ্ঞানে উক্ত আবিষ্কারগুলো ওদের সভ্যতার শেষ ভাগের দিকে। গ্রিকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার মূলে ছিল ব্যাবিলনীয়দের বিশাল অবদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রিকরা ব্যাবিলনীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞানকে যেভাবে অনুসরণ করেছিল সেভাবে তাদের উন্নত বীজগণিতকে অনুসরণ করতে পারেনি।

কারিগরি বিদ্যায়ও যে তারা চরমভাবে উন্নতি লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ব্যাবিলনের সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের আমলে নির্মিত ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। এটি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম হিসেবে ধরা হতো।

ব্যাবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হয়, ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শহর। প্রধান নগরীকে ঘিরে ছিল সুউচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর পরিখা। সুরক্ষিত নগরটিতে প্রবেশের পথ ছিল মোট আটটি। প্রধান প্রবেশ পথটি ছিল ইস্তার দেবীর নামাঙ্কিত। নগরীর ঠিক মাঝখানে ছিল অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত নগর দেবতা মারডুকের মন্দির। নগরীর বাড়িগুলোর কোনো কোনোটি সাত-আটতলা পর্যন্ত উঁচু ছিল এবং সমস্ত বাড়ি ছিল পাকা ইটের তৈরি। ইউফ্রেটিসের উভয়তীরের সংযোগ রক্ষা করতো কতকগুলো কাঠের সেতু। নিঃসন্দেহে এগুলো তাদের উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের পরিচায়ক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত সভ্যতা স্থায়ী হয়েছিল।

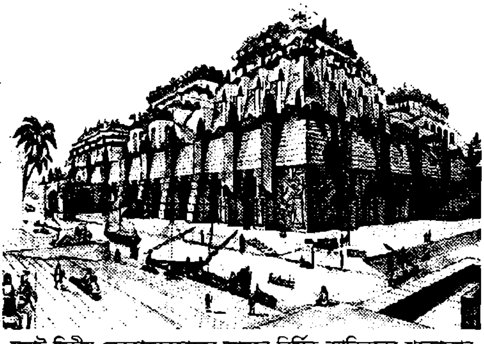

সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের আমলে নির্মিত ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুমেরীয়রা এবং ব্যাবিলনীয়রা যে কতখানি উন্নত ছিল, সে কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত লিপির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। যে একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে সেটিকেও গবেষকরা খ্রিস্টপূর্ব-সপ্তম শতাব্দীর আগে স্থান দিতে চান না। তবে রাজা হামুরাবির একটি নির্দেশনামা পাওয়া গেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো চিকিৎসক চিকিৎসাক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং ব্যর্থতা বরণ করলে দণ্ডভোগ করতে হবে। উক্ত নির্দেশনামা অবশ্য তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনগ্রসরতা প্রমাণ করে না।

মিশরীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন মিশরে নিজের অধিকার স্থাপনের জন্য যাত্রা শুরু করেন। নেপোলিয়নের একটা বড় গুণ ছিল, যখন তিনি যেখানে যেতেন সঙ্গে নিতেন একদল পণ্ডিতকে। এবারও সঙ্গে ছিল বিরাট এক সৈন্যদল এবং কিছুসংখ্যক পণ্ডিত। কথিত আছে, নেপোলিয়ন ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসনের হাতে পরাজিত হয়ে গোপনে পালিয়ে যান কিন্তু যেসব পণ্ডিতকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তারা ফিরে আসতে পারেননি। বাধ্য হয়ে তারা মিশরে থেকে যান। একদিন ঐ পণ্ডিতদের হাতে পড়ে মিশরের কতকগুলো প্রাচীন লিপি। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা লিপিগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেন। পরিশেষে বহু পরিশ্রম শেষে শাপোলিয়ঁন, ইয়ং প্রভৃতি পণ্ডিত ঐ লিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রাচীন মিশরের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হয়।

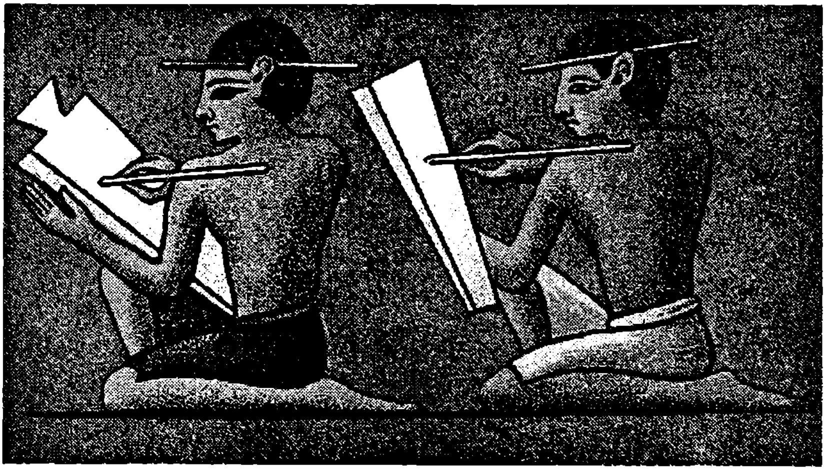

দুজন মিশরীয় লিপিকার

www.pathagar.com

প্যাপিরাসের উপর অঙ্কিত চিত্র ও লিপি, শীলমোহর ইত্যাদি পাঠ করে জানা গেছে, মিশরীয় সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর বিস্তার লাভ করেছিল। প্রায় কুড়িটি রাজবংশ রাজত্ব করার পর খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৪ অব্দে এখানে স্থাপিত হয় আসিরীয় অধিকার। তাই প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সভ্যতা বিকাশলাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্যাপিরাসের পাতায় অঙ্কিত হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা ও চিত্রলিপি

প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করে জানা গেছে, ভারি অদ্ভুত দেশ ছিল সেই মিশর। সেখানকার রাজাদের উপাধি ছিল ফারাও। এবং তাদের প্রাসাদে ঐশ্বর্যের কোনো কমতি ছিল না। সোনাদানা ও মণিমুক্তায় ছিল ছড়াছড়ি। মিশরীয়দের মনে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, মানুষ মৃত্যুর পরও পার্থিব সম্পদ ভোগ করতে পারে। সেই সংস্কারের কারণে রাজা-রাণী ও ধনী লোকদের মৃতদেহের সঙ্গে অজস্র রত্ন, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং ইহজীবনে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করতো তাদের সব কিছুকে কবরে স্থান দেয়া হতো। মৃতদেহকেও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল। সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হতো মমি। সাধারণত রাজার মৃতদেহকে সংরক্ষিত করে এবং সঙ্গে অমূল্য রত্নরাজি দিয়ে কবর দেয়া হতো। আর যাতে চুরি না হয় তার জন্য কবরের উপর রচনা করা হতো বিশাল বিশাল পিরামিড। সে পিরামিড এখনও দৃষ্ট হয়।

মৃতদেহ থেকে মমি প্রস্তুত করা হতো বড় অদ্ভুত উপায়ে। মরা মানুষকে প্রথমে লবণ-পানিতে ভিজিয়ে রাখা হতো। তারপর তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়িগুলোকে বার করে বাতাসে শুকিয়ে নেয়া হতো। অতঃপর পেটের মধ্যে পিচ পুরে সেলাই করে দেয়া হতো। অবশেষে মৃতদেহের সর্বাঙ্গে জড়ানো হতো নতুন কাপড়ের ফালি।

www.pathagar.com

প্রায় একশ দিন পরে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে পিরামিডের তলায় একটি গোপন প্রকোষ্ঠে শুইয়ে রাখা হতো। ফরাসী ভাষায় পিচকে বলা হয় মমিয়াই। ঐ মমিয়াই থেকে মমি কথাটি এসেছে।

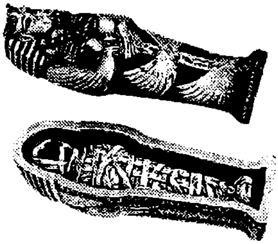

মমি

আশ্চর্যের বিষয়, হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও মমি অবিকৃত আছে। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হতো কিনা তা এখনও অজ্ঞাত। অপরদিকে কবরের উপর নির্মিত পিরামিডও বড় অদ্ভুত ধরনের। ফারাওরা তাদের সমগ্র রাজত্বকালটা নিজেদের জন্য একটি করে পিরামিড নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তারা মনে করতেন, ইহকালটা সামান্য সময়। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে তাকে কাটাতে হবে পরলোকে। কোনো লোক কোনো সময় তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যাতে চুরি করতে না পারে তার জন্য বড় বড় চৌকো পাথরকে পরপর গেঁথে শতশত ফুট উঁচু করা হতো। ওকেই পিরামিড বলা হতো এবং এর তিনটি অথবা চারটি পল অথচ উপরের দিকে ক্রমশ ছুঁচালো।

পিরামিড ছিল পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আশ্চর্য এই পিরামিড নির্মাণকালে নিশ্চয়ই কপিকল জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হতো। এবং শীর্ষ থেকে মাইলের পর মাইল ঢালু করে রাস্তা তৈরি হতো। তা না হলে এত উঁচুতে এত বড় চৌকো পাথরকে তোলা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সেকালের পূর্তবিদ্যা, জ্যামিতি ও কারিগরি জ্ঞানের এক আশ্চর্য সমাহার এই পিরামিড। পিরামিড তৈরি শেষ হলে মাটিকে সরিয়ে ফেলা হতো।

মিশরের বিখ্যাত গিজা পিরামিড

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মিশরবাসীরা বড় বড় খাল কেটে জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করতো এবং নদীমুখে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার পদ্ধতি প্রথম তাদের মাথায়ই এসেছিল।

প্যাপিরাসের লিপি থেকে জানা যায় মিশর পাটীগণিত ও বীজগণিতে ব্যাবিলনের মতো এত উন্নত ছিল না। পাটীগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই

www.pathagar.com

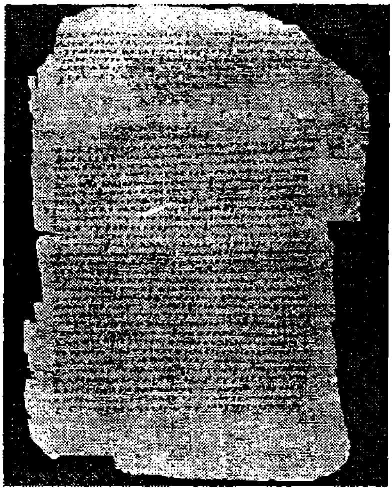

প্যাপিরাসে লেখা একটি প্রাচীন মিশরীয় বইয়ের পাতা

চার নিয়ম এবং দশমিক পদ্ধতি জানতো। বেশ বড় বড় সংখ্যা তারা গণনা করতো, তবে শূন্যের ব্যবহার জানতো না। প্যাপিরাসে ভগ্নাংশের ব্যবহারও দেখা যায়। বীজগণিতে অবশ্য কিছুটা উন্নত ছিল। তারা সমীকরণের সমাধান করতে পারতো। প্যাপিরাসে সমান্তর শ্রেণী ও গুণোত্তর শ্রেণীর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত মিশরীয়দের উন্নত গণিত চিন্তার অনুকূলে রায় না দিলেও গ্রিকরা কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন। মিশরীয়দের কাছে গ্রিকদের গণিতে ঋণও স্বীকার করেছেন অনেকে।

গবেষকদের মতে প্রাচীন মিশর পাটীগণিত ও বীজগণিতে ততখানি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারলেও জ্যামিতিতে অভাবনীয়ভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। প্লেটো, হেরাডোটাস, অ্যারিস্টোটল প্রভৃতি গ্রিক চিন্তানায়ক ভূঁয়সী প্রশংসা করে গেছেন মিশরীয় জ্যামিতির।

হেরাডোটাসের বিবরণী থেকে জানা যায়, মিশরের ফারাওরা নির্দিষ্ট পরিমাণ এক এক খণ্ড জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন এবং ঐ জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। নীলনদের বন্যায় জমির সীমা মুছে গেলে কিংবা জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে পুনরায় জমির সীমানা নির্ধারণ ও সমপরিমাণ নতুন জমি প্রদান ইত্যাদির জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠাতেন। ঐ বিবরণী প্রমাণ করে, প্রাচীন মিশর জ্যামিতি ও পরিমিতিতে কি পরিমাণ অগ্রসর ছিল। আজকের দিনে আমরা যে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সিলিন্ডার ও পিরামিডের ঘনফল নির্ণয় করে থাকি, তা মিশরেরই অবদান। বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে (পাই) নামক ধ্রুবকটির মান অনেকটা নির্ভুলভাবেই তারা নির্ণয় করেছিল।

কোনো কোনো গভেষকের মতে, ঘনফল নির্ণয়ের জন্য কোনো সূত্র তারা

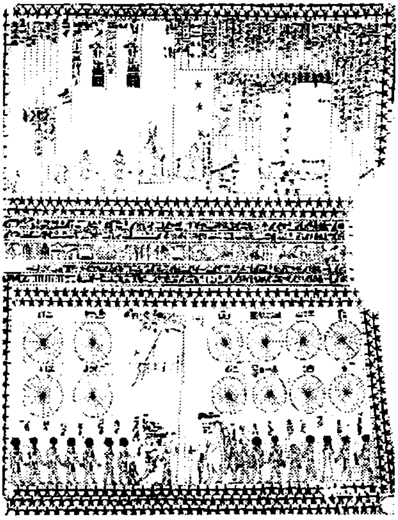

প্রাচীন মিশরীয়দের জ্যোতির্বিদদের তৈরি ক্যালেন্ডার

www.pathagar.com

উদ্ভাবন করতে পারেনি বা কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু অনেক জটিল ঘনকের ঘনফল তারা নির্ভুলভাবেই নির্ণয় করেছিল। এটি তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল বলে ধরে নিয়েছেন অনেকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানেও মিশরীয়রা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছিল এবং উন্নত পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম প্রথম নীলনদে প্রথম বন্যা আসার দিনকে বছরের শুরু ধরলেও পরের দিকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র স্থির করে বর্ষ গণণা শুরু করে। পঞ্জিকার ক্ষেত্রে ওদের সর্বাধিক কৃতিত্ব লিপইয়ার গণনা। ৩৬৫ দিনে একবছর ধরলেও বছরের কিছু সময় অবশিষ্ট থেকে যায় এবং প্রতি চার বছরে সময়ের পরিমাণ দাঁড়ায় একদিনের মতো। সত্যটি তারা সেই সময়ই আবিষ্কার করেছিল এবং আজও সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়।

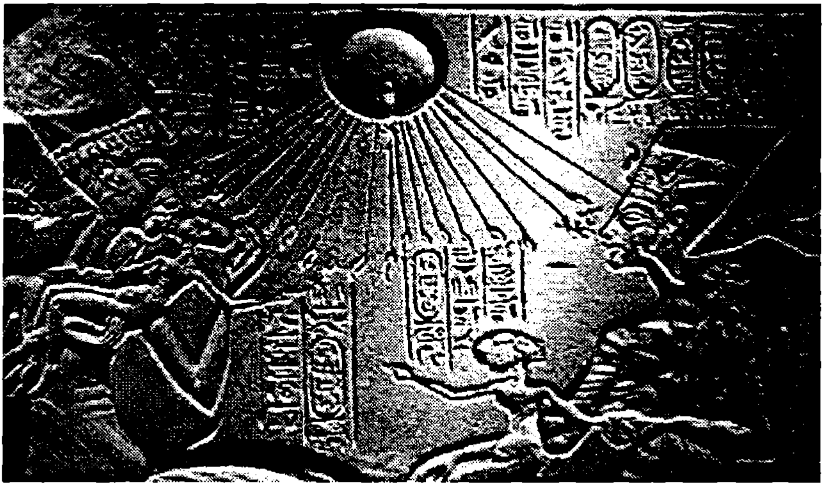

প্রাচীন মিশরীয় জ্যোতির্বিদরা কল্পনা করতো সূর্য হচ্ছে সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু

মিশরীয়রা সৌরবছর ও চান্দ্রবছর উভয়ই গণনা করতো। সপ্তাহের বারগুলো চিহ্নিত করেছিল সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের নামে। ওরা রাশিচক্র ও কতগুলো তারামণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এমনও মনে করা হয়, মিশরীয়রা আকাশের মানচিত্রও নির্মাণ করেছিল। ধ্রুব নক্ষত্র ছিল তাদের কাছে অতি পরিচিত। ঐ নক্ষত্রটির সাহায্যে তারা দিক নির্ণয় করতো এবং উপাসনালয়, পিরামিড ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে ধ্রুব নক্ষত্রের অবস্থানকে কাজে লাগতো।

সমসাময়িককালে মিশর চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল বেশ অগ্রসর। প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব লিপি পাওয়া গেছে সেগুলোকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের ধরে নিয়েছেন। সেই লিপি এবং মিশরের প্রাচীন প্যাপিরাসগুলোতে রোগের কারণ ও চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, দেহে অশুভ আত্মা তথা অপদেবতা ও ভূত প্রেতাদির আশ্রয়

www.pathagar.com

হলেই অসুখ করে। সেই কারণে সেকালে মিশরের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল দেহ থেকে অশুভ আত্মার বিতাড়ন। তবে উক্ত কাজে তারা মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার না করে ভেষজ শক্তিকেই প্রয়োগ করতেন।

প্রমাণিত হয়েছে, মিশরীয় পুরোহিতরাই চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাবিদ্যায়ও ছিল মিশরীয়রা খুবই দক্ষ। উপরের চিত্রে মিশরীয়দের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে

সম্বন্ধীয় পুস্তকও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ইমহোতেপ নামে এক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নামও আছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ইমহোতেপই চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্রষ্টা। ইনি ছিলেন মিশরের রাজা জোসারের চিকিৎসক।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাসের পেপারে লিখিত শল্য চিকিৎসার একটি গ্রন্থও আবিষ্কার করেছেন। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার আঘাত ও ক্ষতের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে অস্ত্রোপচার বিধি। প্যাপিরাসটির পাঠ উদ্ধার করে অনেকে অনুমান করেন, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিশরীয়রা যথেষ্ট উন্নত ছিল। যেহেতু মৃতদেহকে মমি করার প্রথা ছিল, তাই শরীরবিদ্যা সম্বন্ধেও ভালোভাবে জ্ঞান ছিল তাদের।

মিশরীয় সভ্যতা ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। অলঙ্কার শিল্পে, কারিগরি বিদ্যায় ও যন্ত্র বিদ্যায় সে আমলে তাদের জুড়ি কেউ ছিল না। রসায়ন চর্চায় সেকালে মিশর ছিল সবার উপরে। রসায়নকে তারা বলতো কিমিয়া। যারা এই শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করতেন তাদের বলা হতো কিমিয়াবিদ। কতকগুলো অম্ল-, জ্বারক দ্রব্য ও রঞ্জক পদার্থ তারা আবিষ্কার করেছিলেন।

www.pathagar.com

ধাতুবিদ্যায়ও মিশরীয়রা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। সোনা, রুপা, টিন, তামা প্রভৃতি ধাতুকে তারা ব্যবহার করতো। মিশরের কামারশালায় বহু চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। বহু ধাতব আকরিকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল বলেও মনে করা হয়। হীরকের ব্যবহারও তারা জানতো।

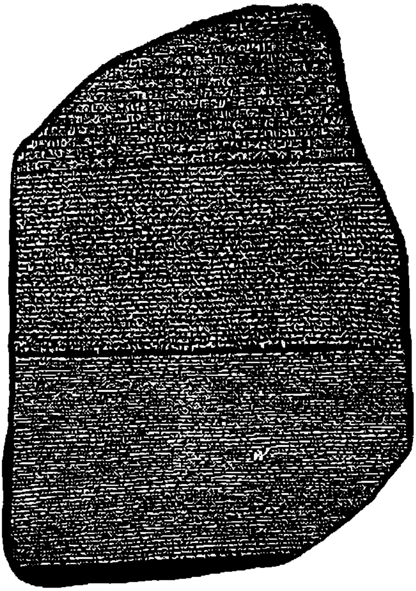

নীল নদের মোহনায় রোসেটা নামক জায়গায় প্রাপ্ত ঐতিহাসিক রোসেটা পাথর

হায়ারোগ্লিফির পাঠোদ্ধার : হাজার বছর ধরে মিশরের এই হায়ারোগ্লিফি বর্ণ বা হায়ারোগ্লিফি চিত্রলিপির মাধ্যমে লেখা কেউ পড়তে পারেনি।

অবশেষে শাঁপোলিও নামে একজন ফরাসি পণ্ডিত মিশরীয় চিত্রলিপি পড়ার উপায় বের করেন। তিনি প্রথমে একটি পাথরের উপর চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন।

পাথরের চিত্রলিপির উপরে লেখা ছিল গ্রিক ভাষায় রাজা টলেমি ও রানি ক্লিওপেট্রার নাম। অনেক গবেষণার পর তিনি এ দুটি নাম পড়তে পারলেন। অন্য একটি পাথরের চিত্রলিপিতেও তিনি গ্রিক ভাষায় লেখা একই ধরনের লেখা পড়তে পারলেন।

দ্বিতীয় পাথরটি পাওয়া গিয়েছিল নীল নদের মোহনায় রোসেটা নামক শাখার তীরে। এজন্য ওই পাথরটি রোসেটা পাথর নামে পরিচিত হয়েছে। এ দুটি লেখা মিলিয়ে বহু বছরের গবেষণায় শাঁপোলিও মিশরীয় লিপি বা চিত্রলিপি পড়ার ও মিশরীয় ভাষা বোঝার উপায় খুঁজে পেলেন। তারপর নানা দেশের পণ্ডিতেরা হাজার হাজার লিপি পড়ে প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লিখেছেন। ফলে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস আজ আমরা জানতে পারছি।

মিশরে আসিরীয় অধিকার স্থাপিত হলেও বিজ্ঞানচর্চা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। বিশেষত রাজা আসুরবাণিপালের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। যদিও ইতিহাসে তিনি একজন নিষ্ঠুর রাজা নামে খ্যাত, তথাপি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তিনি মিশরীয় প্রাচীন লিপি ও পুঁথিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং পুস্তক রচনার জন্য বহু পণ্ডিতকে নিয়োগ করেছিলেন। রাজধানী নিনেভে স্থাপন করেছিলেন একটি বিশাল গ্রন্থাগার। বর্তমানে নিনেভে গ্রন্থাগারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখান থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ২২ হাজার গ্রন্থ। সমস্ত গ্রন্থই বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

সিন্ধু সভ্যতায় বিজ্ঞান

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে খনন কার্যের ফলে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কিছুদিন পর পাঞ্জাবের মন্টগোয়া জেলার হরপ্পা নামক স্থানে এই ধরনের আর একটি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়। এই দুই স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো থেকে গভেষকরা অনুমান করেছেন, অতি প্রাচীনকালে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলোর তীরে এক সুসভ্য নগর সভ্যতা শুরু হয়েছিল। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এই সভ্যতা প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বের এবং মিশরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। পরবর্তীকালে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায়, গুজরাটের কাথিয়াবাড় ও আহমেদাবাদ অঞ্চলে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার অনুরূপ আরও বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত অঞ্চলগুলোতে যেসব প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাই ভারবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র পণ্ডিতরা অপরাপর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিদর্শনের সঙ্গে এখানকার নিদর্শনগুলোকে মিলিয়ে একটা অনুমান দাঁড় করেছেন মাত্র। যদি কোনোদিন লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় তাহলে এ উপমহাদেশের সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

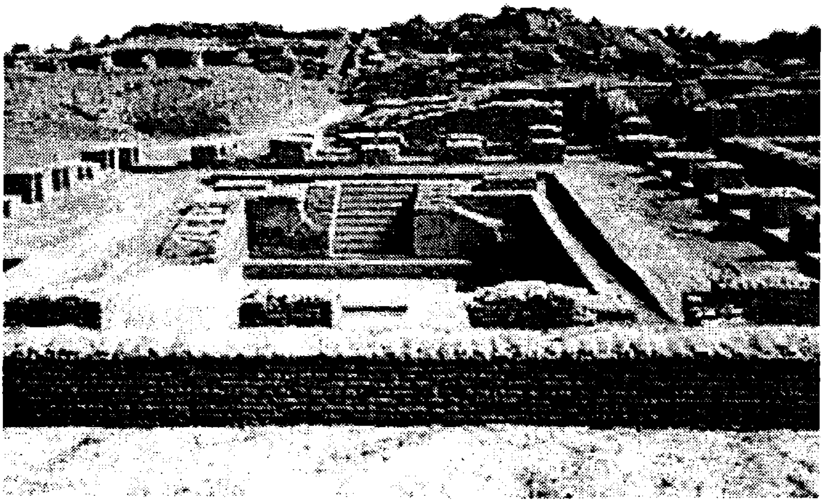

মহেনজোদারো নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় সিন্ধু সভ্যতায় বিজ্ঞান কতটা উন্নত ছিল

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো সিন্ধু সভ্যতাও ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। মহেঞ্জোদারো নগরটি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত ছিল। পল্লীর বাড়িগুলো তৈরির জন্য কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকারের ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। বহুতলা বিশিষ্ট ও বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত অট্টালিকারও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

রাজপথের পাশে যেসব অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের নিচের তলাগুলো দোকানপাটের জন্য ব্যবহার করা হতো এবং উপরের তলাগুলো ব্যবহৃত হতো বাসগৃহরূপে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয়স্থানেই আবিষ্কৃত হয়েছে বিরাট বিরাট শস্যাগার, দুর্গ, ক্রীতদাসদের থাকার ঘর ইত্যাদি।

গভেষকরা মনে করেন, প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ এবং ব্রোঞ্জ যুগ এই তিনটি যুগ ধরে সিন্ধু সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুটি হলো এখানকার বিশাল স্নানাগার। চারিদিকে উঁচু প্রাচির দিয়ে ঘেরা ১৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ১০৮ ফুট প্রস্থের স্নানাগারটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এখানকার শস্যাগার বা গুদামঘরটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৭৫ ফুট। হরপ্পায়ও স্নানাগার এবং শস্যাগার উভয়েরই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

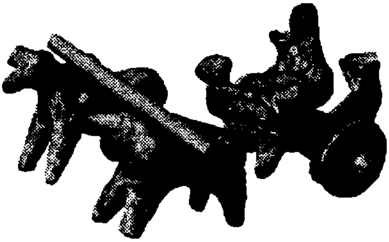

হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত খেলনা গাড়ি

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে অনুমান করা হয়, ওরা যব, তিল, রাই, মটর প্রভৃতি শস্য চাষ করতো। খাবার হিসেবে গ্রহণ করতো মেষ, শূকর, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস এবং শামুক, গুগলি ও সামুদ্রিক মাছ। তারা সূতীকাপড় ও পশমের কাপড় দুইই তৈরি করতে পারতো। গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করতো তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ, পাথর ও পোড়ামাটির বাসনপত্র, চীনামাটির পাত্রেরও প্রচলন ছিল। নারী-পুরুষ উভয়ই সোনা, রুপা ও মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করতো। তারা যথেষ্ট সৌখিনও ছিল। হাতির দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করতো আর ব্যবহার করতো ধাতু নির্মিত দর্পণ। প্রসাধন ও রূপচর্চার উপকরণ তাদের অজানা ছিল না। বড়শি, সূচ ও মার্বেল পাথরের বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে।

গভেষকরা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় কতকগুলো সীলমোহর পেয়েছেন। সেই সীলমোহরগুলো অনেকটা মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে প্রাপ্ত সীলমোহরের অনুরূপ। তাই অনেকে অনুমান করেছেন, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সঙ্গে ওদের ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগ। ওরা স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এবং পানিপথে মিশরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো।

সুপ্রাচীন এই সভ্যতাটি জ্ঞান-বিজ্ঞানেও যে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল, তা উপরোক্ত নিদর্শনগুলো থেকে বেশ ভালোভাবেই অনুমান যায়। ওরা কারিগরি বিদ্যায় ছিল মিশরের প্রায় সমকক্ষ এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণে মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে ছিল অনেক উন্নত। তারা তামা, টিন, দস্তা, তামা ও টিনের সঙ্কর ব্রোঞ্জ, তামা ও দস্তার

www.pathagar.com

সঙ্কর পিতল, প্রভৃতির ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী উভয়ই জানতো। সোনা ও রুপাকে তারা চিহ্নিত করেছিল মূল্যবান ধাতু হিসেবে। অলঙ্কার শিল্পে ও মৃৎশিল্পে সিন্ধুতীরের অধিবাসীরা ছিল বিশেষভাবে দক্ষ। কিন্তু সেখানে কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সেই কারণে অনেকে অনুমান করেন, ওদের মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের তৈরি স্নানাগার, শস্যাগার ও অট্টালিকা তাদের অঙ্ক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বহু দাড়িপাল্লা জাতীয় বস্তু ও বাটখারাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন অনেক বাটখারা পাওয়া গেছে, যাদের ওজন এক গ্রামেরও কম। একটি দাঁড়িপাল্লা পাওয়া গেছে যার দণ্ডটি পিতলের এবং পাল্লা দুটি তামার।

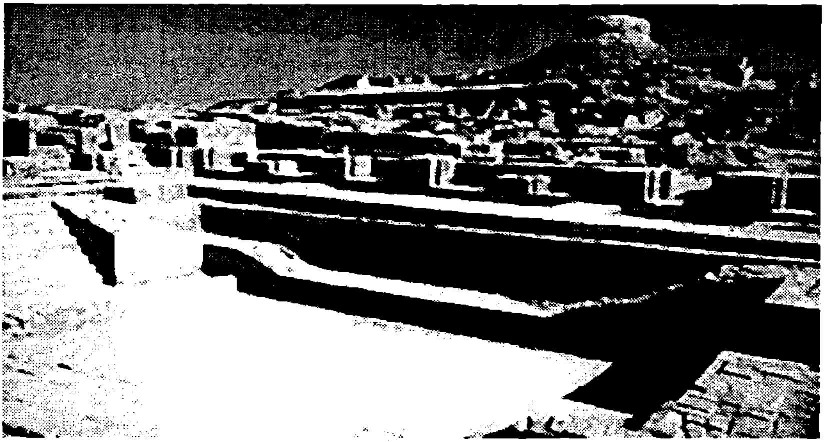

হরপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষ

সিন্ধুসভ্যতা কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের নদী উপত্যকাগুলোতে নয়, এর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুদিন আগে ডেনমার্কের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পারস্য উপসাগরে বাহরাইন নামক একটি দ্বীপে খনন কার্য চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাওয়া গেছে বহু পুরাবস্তু। আশ্চর্যের কথা, এখানকার প্রাপ্ত পুরাবস্তুর সঙ্গে হরপ্পার পুরাবস্তুর হুবহু মিল। এমনকি সীলমোহর পর্যন্ত।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। এখানে যে সব ধাতব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই তামার তৈরি। পিতল এবং ব্রোঞ্জের জিনিসপত্রও নগণ্য নয়। বহিরাগত আর্যরাই এই সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। সম্ভবত আর্যদের আগমন হয়েছিল মধ্য-এশিয়া থেকে। আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতো এবং যুদ্ধে হাতি ও ঘোড়া উভয়ই ব্যবহার করতো। ওদের উন্নত যুদ্ধোপকরণের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় তৎকালীন ভারতবর্ষীয় অধিবাসীরা। তবে রীতিমতো যুদ্ধ হয়েছিল। মনে হয়, সেই যুদ্ধগুলো ভারতবর্ষীয় পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ নামে চিহ্নিত। যদি অসুরেরা এ দেশের আদিম অধিবাসী হয়ে থাকেন তাহলে তারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর ছিলেন, এ কথা পুরাণগুলো

www.pathagar.com

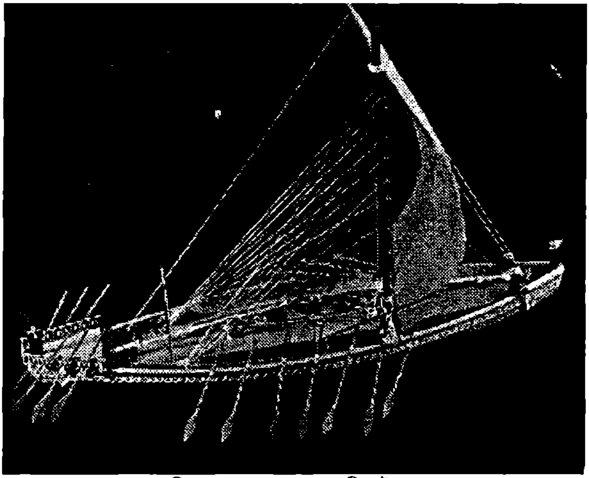

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত একটি নৌকা

প্রমাণ করে না। ওরা লোহার যে ব্যবহার জানতো তার উল্লেখ আছে ময়দানবের আখ্যানে। রাবণের স্বর্ণলঙ্কার, রথ ও যুদ্ধাস্ত্র উন্নত কারিগরি বিদ্যা এবং গভীর গণিত ও জ্যামিতি জ্ঞানের পরিচায়ক। রাবণের রাজসভার যে জাঁকজমকের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে তাকে অসভ্য কিংবা বর্বর কিছুতেই বলা যায় না। যন্ত্রবিদ্যা ও অট্টালিকা নির্মাণে আর্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল ওরাই। ওদের উন্নত কারিগরি বিদ্যা ও অট্টালিকা নির্মাণ পদ্ধতি আর্যদের যে একেবারে মুগ্ধ করেনি এমন নয়।

হরপ্পার সভ্যতা যে আর্যরাই ধ্বংস করেছিলেন তার উল্লেখ তাদের ঋগ্বেদেই আছে। তারা হরপ্পা না বলে বলেছেন হরিয়ুরোপীয়। ভারতবর্ষীয় গভেষকদের মতে হরিয়ুরোপীয় এবং হরপ্পা একই স্থানের নাম।

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সিলমোহর

প্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে, মহাকবি হোমার বর্ণিত ইলিয়াড ও ওডিসির কাহিনী অনৈতিহাসিক নয়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার লিপিও পাঠ করা গেলে মনে হয় আবিষ্কৃত হবে মহাকবি বাল্মিকী ও বেদব্যাসের কাহিনীগুলোর মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান। তবে যতদিন না পাঠ করা যাচ্ছে ততদিন সঠিকভাবে কিছু বলার উপায় নেই। শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে, আর্যদের আগমনের সময় ভারবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা তারকাসুর, রাবণ প্রভৃতি রাজারা কম শক্তিধর ছিলেন না। পুরাণে এবং মহাকাব্যগুলোতে অতিশয়োক্তি থাকলেও বিশেষ বিশেষ কাহিনী থেকে মনে করা যেতে পারে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা থেকে ভারতবর্ষের সিন্ধুসভ্যতা ছিল বিজ্ঞানে অধিক অগ্রসর।

www.pathagar.com

চীন সভ্যতায় বিজ্ঞান

চীনের ইয়াংসি ও হোয়াংহো বা হলুদ নদীর তীরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতাকে চীন সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতা সেকালের অপরাপর সভ্যতার মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে পারেনি। তাই দীর্ঘদিন ধরে চীন সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল এবং বলতে গেলে আজও পর্যন্ত তাদের সে ধারাটি অব্যাহত আছে। সেখানকার প্রাপ্ত প্রাচীন লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করতেও পণ্ডিতদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। উক্ত কারণে একমাত্র এই সভ্যতাটির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে।

চীনের বৈশিষ্ট্য ছিল, অতি প্রাচীনকালেও তারা ইতিহাস লিখতে অভ্যস্ত ছিল। সেই ইতিহাস থেকে জানা যায়, চীন সভ্যতার প্রথম যুগে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। রাজাদের নাম যথাক্রমে ফুহসি, সেন নুং, হুয়াংতি, ইয়াও এবং শুন। কথিত আছে, প্রথম রাজা ফুহসিই চীনা লিপির প্রচলন করেছিলেন। তারই আমলে প্রথম রেশমকীটের প্রতিপালন শুরু হয় এবং সেই থেকে রেশমী বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। গবেষকদের মতে, ফুহসির রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের কাছাকাছি সময়। গবেষণা থেকে আরও অনুমান করা যায়, সিন্ধুসভ্যতা কিংবা মিশ-রীয় সভ্যতার মতো চীন সভ্যতাও খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ বা সমসাময়িক কালে বিকাশলাভ করেছিল। আবার কোনো কোনো গবেষকের মতে চীন সভ্যতা এত প্রাচীন নয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকেই বিকশিত হয়েছিল।

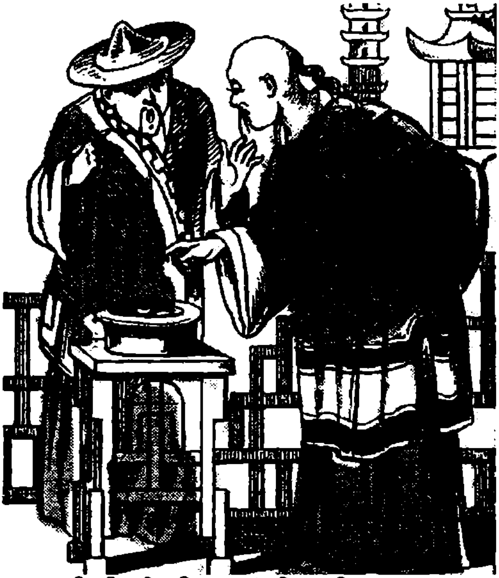
দুজন প্রাচীন চীনা বিজ্ঞানী কম্পাস তৈরি করা নিয়ে গবেষণা করছেন

যা হোক, গবেষকরা একমত যে, প্রাচীনকালে চীনের পঞ্চ রাজার রাজত্বকালে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রাজা সেন নুংয়ের আমলে লাঙ্গল উদ্ভাবিত হয় এবং কৃষিকাজের প্রচলন হয়। হুয়াংতির সময় চীনারা চুম্বকের কয়েকটি গুণ আবিষ্কার করে এবং চাকাযুক্ত গাড়ির ব্যবহার শুরু করে। তার সময় প্রথম বর্ষপঞ্জী রচিত হয়। কথিত আছে, রাজা স্বয়ং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকজন পণ্ডিতকে নিয়োগ করেছিলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ রাজা ইয়াও ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ বিচারক। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রজাদের তিনি উৎসাহিত করতেন। শেষ রাজা শুন হোয়াংহো নদীর বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কৃষিক্ষেত্রে পানিসেচের জন্য কতগুলো খাল খনন করেছিলেন।

পরবর্তী শ্যাং রাজবংশের আমলেও বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি অব্যাহত ছিল। হোনান প্রদেশে শাং রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে খোদাই করা ও নক্সা করা মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ পাত্র, যাদুমন্ত্র লেখা কচ্ছপের খোল ইত্যাদি। কিন্তু কোনো লোহার জিনিস পাওয়া যায়নি। নিদর্শনগুলো থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন শ্যাং রাজবংশের শেষেও অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১১২৩ অব্দেও চীন লোহার ব্যবহার সঠিকভাবে জানতো না। কচ্ছপের খোলে লেখা যাদুমন্ত্রগুলো থেকে অনুমান করা হয়, সেকালে চীনে একদল গণনাকারী লোকের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তারা মানুষের ভাগ্য গণনা করতো।

শ্যাং রাজবংশের পর প্রায় হাজার বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল জো রাজবংশ। জো বংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত ঐ আমলে চীনে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, দ্বিতীয় সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে একদিকে প্রজাসাধারণের উন্নতি যেমন অব্যাহত থাকে তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

কনফুসিয়াস

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। এদের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস অন্যতম। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 'শুচিং' নামক তার ইতিহাস গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, সে সময় চীনারা বিজ্ঞানে আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা মানুষকে দান করেছিল যথেষ্ট সুখ ও সমৃদ্ধি। সেকালে চীনারা জুতা পরতো, পথে ঘোড়ায়টানা গাড়ি হাঁকাতো। চীনামাটির বিচিত্র পাত্রে আহার ও পানীয় ভোজন করতো এবং সুসজ্জিত গৃহে বাস করতো।

এছাড়াও অন্যান্য প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, প্রাচীনকালে চীন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চায় সমকালীন বহু সভ্য দেশকে অতিক্রম করেছিল। 'চিউচ্যাং সুয়ানশু' নামে পাটীগণিতের এক বিরাট গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটি নয় খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো যথাক্রমে ১. ক্ষেত্রজ্যামিতি ও ভগ্নাংশ ২. ত্রৈরাশিক

www.pathagar.com

৩. সম্ভুয় সমুত্থান ৪. বর্গমূল ও ঘনমূল ৫. ঘন জ্যামিতি ৬. লাভ ক্ষতি ৭. একঘাত সমীকরণ ৮. বিমিশ্র প্রক্রিয়া ও ৯. পিথাগোরীয় উপপাদ্য। গ্রন্থখানি খ্রিস্টপূর্ব ১৫২ অব্দে সংস্কার করা হয়েছিল গণিতজ্ঞ চ্যাং সাংয়ের দ্বারা। গ্রন্থকারের উক্তি থেকে জানা যায়, উপরোক্ত নিয়মগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের কাছাকাছি সময় আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ বিষয়ে সমালোচকগণের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে গণিতের কতগুলো নিয়ম হয়ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন চৈনিক পণ্ডিতের গবেষণা থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে এমন পল্লবিত হতে পেরেছিল।

চীনের আর এক প্রাচীন গণিতজ্ঞের নাম সান-ৎজু। ইনি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনিও রচনা করেছিলেন একটি গণিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। এতে অনির্ণেয় সমীকরণ, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি এবং পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত দুই গণিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয়, চীনারা গণিতে ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। তবে তাদের আবিষ্কারাবলীর উপর গ্রিক প্রভাব পড়েছিল কিনা জানা যায় না। কারণ, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকে গ্রিকরা গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে অভাবণীয় উন্নতি লাভ করেছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চীনা বিজ্ঞানীদের গবেষণাচিত্র

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সে সময় চীন যে সব দেশকে ছাড়িয়ে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল তার একাধিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ বছরেরও আগে চীনা পণ্ডিতগণ গণনার দ্বারা গ্রহণের সময় অনেক আগে থেকে বলে দিতে পারতেন। তারা বছরে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গ্রহণের সংখ্যাও নির্ধারণ করেছিলেন।

চীনারা প্রথমে ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বছর গণনা করলেও খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করে। ওরা দীর্ঘ বছরেরও কল্পনা করেছিল। গ্রহদের সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট জ্ঞানও আহরণ করেছিল। প্রাচীন চীনা পুঁথিতে উল্লেখ আছে, চীন সম্রাট চৌন সুর রাজত্বকালে (খ্রি. পূ. ২৫১৩-২৪৩৬) বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—এই পাঁচ গ্রহের আকাশে সমাবেশ হয়েছিল। আধুনিক গণনায় জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি অনুরূপ ঘটনা অর্থাৎ আকাশে উপরোক্ত পাঁচ গ্রহকে দেখার কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। অতএব অনুমান করা যেতে পারে, সেই প্রাচীনকালেও চীনাদের পাঁচ-পাঁচটি গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল।

www.pathagar.com

চীনাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ধূমকেতু সম্বন্ধে এবং নবতারা বা নোভা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ। পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন কোন ধূমকেতু কত বছর পর সূর্য-সান্নিধ্যে আসে তার একটা তালিকা নির্ণয় করেছিলেন তৎকালীন চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ঐ তালিকা পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

নবতারা বা নোভা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আহরণ করতে না পারলেও আকাশে যে মাঝে মাঝে অত্যুজ্জ্বল তারা দেখা যায় এবং কিছুদিন পরে তারা যে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায় এমন তথ্য তারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারামণ্ডল সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ছিল। ওরা আকাশের সমস্ত তারাকে ২৪৮টি তারামণ্ডলে বিভক্ত করেছিলেন। অনেকের মতে আকাশে রাশিচক্রের কল্পনাও চীনা জ্যোতির্বিদদের।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক মতবাদ চীনেই প্রচারিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল ব্রহ্মাণ্ডটা অসীম।

প্রাচীনকালে চীনদেশে আবির্ভূত একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরও নাম পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে আবির্ভূত এই বিজ্ঞানীটির নাম 'ল-শ-ন'। কথিত আছে যে, ইনিই প্রথম গ্রহণের নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

চীনের প্রাচীন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থটিও আধুনিককালের এক বিস্ময়। 'নেই চিঙ' নামে যে চিকিৎসা গ্রন্থটি পাওয়া গেছে তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট হুয়াংতি—যার রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯৮ থেকে ২৫৯৯। হুয়াংতি যদি রচয়িতা হন তাহলে ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের পূর্বে চীনে চিকিৎসাশাস্ত্রের আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি হয়েছিলে বলে ধরতে হবে। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থটিতে বহু গবেষকের গবেষণা সংযোজিত হয়ে উন্নতরূপ গ্রহণ করেছিল। এমনকি বহু চীনা গবেষকও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করেছে।

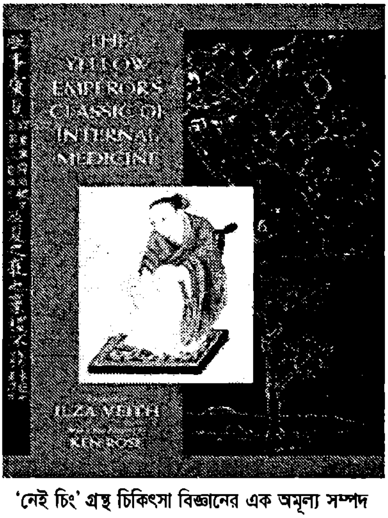

'নেই চিং' গ্রন্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ

'নেই চিঙ' গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শারীরস্থানের আলোচনা স্থান লাভ করেছে।

চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে দর্শনশাস্ত্রেরও অবতারণা করা হয়েছে। কল্পনা করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে ক্ষুদ্র মানবশরীর পর্যন্ত সবাই পাঁচটি উপাদানের

www.pathagar.com

সমন্বয়ে গড়া। এগুলো যথাক্রমে কাঠ, আগুন, মৃত্তিকা, ধাতু ও পানি। চীনাদের 'পাঁচ' সংখ্যাটি বেশ প্রিয় ছিল। হয়ত এই কারণে তারা পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ রং, পঞ্চ স্বাদ, পঞ্চ ধাতু, পঞ্চ অঙ্গ ইত্যাদির পরিকল্পনা করেছিল। সে যাই হোক, ওদের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী শরীরের পঞ্চ অঙ্গ যথা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, প্লীহা ও বৃক্ক শরীরের পুষ্টি সাধনের কাজ করে থাকে। পাঁচটি প্রধান অঙ্গের আবার পাঁচটি অন্তরযন্ত্র আছে। সেগুলো অন্ত্র, মলাশয়, পিত্তাশয়, বস্তি ও পাকস্থলি।

চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে বসন্ত ও সিফিলিস রোগের উল্লেখ আছে। বসন্তের চিকিৎসায় বলা হয়েছে বসন্তের গুটি থেকে পুঁজ গ্রহণ করে এবং তাকে শুকিয়ে নস্যের মতো গ্রহণ করতে। নিঃসন্দেহে উক্ত পদ্ধতি ছিল অনেকটা টিকা জাতীয়। সিফিলিস রোগীকে বংশানুক্রমিক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাচীন চীনে শল্য চিকিৎসারও উদ্ভব হয়েছিল।

চীনাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, ওরা ধান চাষ করতো। মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, মিশর এমনকি ভারতবর্ষেও সেকালের মানুষের আহার হিসেবে সর্বত্র পাওয়া গেছে গম ও অন্যান্য শস্য। কিন্তু চীনের কোথাও গম পাওয়া যায়নি। তাই ধরা যায় চীনারাই প্রথম ধান চাষ শুরু করে।

চা চাষ ও চা-পান রীতিও প্রথম চীনে প্রচলিত হয়। চীনের বিখ্যাত ধর্মগুরু 'লাওৎসে'-কে তার শিষ্যরা চা-পানের মাধ্যমে আপ্যায়িত করেছিলেন বলে জানা যায়।

বৈদিক যুগের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর বা তারও কিছু পূর্বে মধ্য এশিয়া থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে একজাতীয় মানুষ বাস করতো। তাদের মুখের ভাষা ছিল একই এবং কৃষিকাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। পরে তারা লোহার ব্যবহারও শিখেছিল। তারা দেখতে ছিল ফর্সা ও সুশ্রী। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। তারপর বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে এরা নানান শাখায় বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়া থেকে প্রথমে একটি শাখা এসেছিল ভারতবর্ষে। কালক্রমে একের পর এক এভাবে আরও কতগুলো দক্ষ জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ওরাই আর্যজাতি নামে পরিচিত।

আর্যজাতি যে বহিরাগত—তার প্রমাণ তাদের ভাষা। তাদের মূলভাষা তথা আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃতের অনুরূপ। বর্তমানে পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে জানা গেছে ল্যাটিন, গ্রিক, ফরাসি, সংস্কৃত প্রভৃতির মূল একটি মাত্র ভাষা। বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে সেই মূল ভাষাটির মিল যেন একটু বেশি। অতএব অনুমান করা হয়, এক ভাষাভাষী মানুষ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দেশভেদে ও কালভেদে নানা রকম ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

আর্য জাতির মূল শাখাটি প্রথমে ভারবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সেই স্থানটি নদীবহুল। আর্যরা আবার নদীকে বলতো সিন্ধু। তাই অঞ্চলটির নাম রেখেছিল সপ্তসিন্ধু প্রদেশ। আর্যদের চেয়ে কিছুটা অনগ্রসর এক জাতি অবশ্য এ অঞ্চলে বাস করতো। আর্যরা তাদের অভিহিত করতো দাস, দস্যু, অনার্য, অসুর ইত্যাদি নামে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শেষে আদি বাসিন্দারা পরাজিত হতে বাধ্য হয় এবং আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

অনেকের মতে, আর্যরা ২০০০ খ্রিস্টপূর্ব বা তারই কাছাকাছি সময় থেকে ভারতবর্ষে আগমন শুরু করে। এদেশে আসার আগেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। একদিকে কৃষিতে ছিল উন্নত, অন্যদিকে তাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্রের প্রভাব। গোষ্ঠীপতি বা রাজা একজন নির্বাচিত হতেন কিন্তু জনসভার মত গ্রহণ না করে রাজা কোনো কাজ করতে পারতেন না। সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজাকে শপথ গ্রহণ করতে হতো, জীবনে কোনোদিনই তিনি প্রজাদের বিশ্বাস হারাতেন না।

সপ্তসিন্ধুর উপকূলভাগে প্রচুর ফসল ফলতো। দেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হলে আর্যরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে মন দেয়। গবেষকদের মতে, আর্যরা দুটি ধারায় বিজ্ঞানচর্চা করেছিলেন। প্রথম ধারাটি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটি অব্যাহত ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋকবেদ পাঠ করলে বিজ্ঞানের যে শাখাটির কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটি তাঁদের উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্র। এরা ভেষজশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ধক্য দূর করতে পারতেন, অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ অঙ্গকে কেটে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজিত করতেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতেন, এমনকি চক্ষুও অপারেশন করতে পারতেন। এককালে অনুরূপ উক্তি গালগল্পের মতো শোনালেও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবময় যুগে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় আর্যরা নানাধরনের গাছগাছড়া ব্যবহার করত

আর্যরা চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য অথর্ব বেদ রচনা করেন। এই অথর্ব বেদই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুমহান গ্রন্থ। পরে অথর্ব বেদ থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে পৃথক করা হয় এবং নাম দেয়া হয় আয়ুর্বেদ। আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা

www.pathagar.com

যায় বলে অনুরূপ নামকরণ হয়েছিল। কালক্রমে এটিকে পঞ্চম বেদ রূপে স্বীকার করা হয়। ভারবর্ষের আয়ুর্বেদ সে যুগের এক বিস্ময়।

অনেকের বিশ্বাস খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আয়ুর্বেদ রচিত হয়। আট ভাগে বিভক্ত সুবিশাল এই শাস্ত্রটিকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। সুশ্রুত বলেছেন, একলক্ষ শে-াককে হাজার অধ্যায়ে বিভক্ত করে স্বয়ং ব্রহ্মা এটি রচনা করেছিলেন।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিভাগগুলো যথাক্রমে-(১) কায়চিকিৎসা বা উপযুক্ত ভেষজের সাহায্যে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা; (২) শল্যচিকিৎসা তথা অস্ত্রোপচারের দ্বারা ক্ষত নিরাময় পদ্ধতি; (৩) শলাক্য চিকিৎসা বা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গে অস্ত্রোপচার ও বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠন; (৪) ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসা; (৫) কৌমার ভৃত্য বা শিশুরোগ চিকিৎসা; (৬) অগদতন্ত্র বা বিষ চিকিৎসা; (৭) বাজীকরণ তন্ত্র বা প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা এবং (৮) রসায়নতন্ত্র বা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা।

উপরোক্ত বিভাগগুলো নিঃসন্দেহে এক প্রণালীবদ্ধ ও অতি উন্নতমানের চিকিৎসাশাস্ত্রের নিদর্শন। শরীরবিদ্যা সংক্রান্ত যে সব তথ্য সেদিন আহরিত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমানের কোনো বিরোধ নেই। তাছাড়া মানসিক রোগ চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছে। আজ থেকে তিনহাজার বছর আগে যখন বিজ্ঞানের কোনো শাখাই পুষ্ট হয়নি, যখন মানুষের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ তখন এমন এক আশ্চর্য বিজ্ঞান গ্রন্থ এক পরম বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈদিক যুগের ভারতীয়দের চিকিৎসা পদ্ধতি

www.pathagar.com

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র কোনো ব্যক্তি বিশেষের গবেষণার ফল নয় বলেই মনে হয়। সহস্র বছরের অজস্র প্রতিভা নিয়োজিত হওয়ার ফলে এমন এক পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। আয়ুর্বেদের সঙ্গে বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম জড়িত। যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অশ্বিনীদ্বয়, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, সুশ্র"ত, চরক, জীবক ইত্যাদি। এদের মধ্যে আত্রেয়, সুশ্রুত, জীবক ও চরক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এরা সবাই আয়ুর্বেদ রচনার দ্বিতীয় ধারার গবেষক।

বৌদ্ধযুগের চিকিৎসক আত্রেয় থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি ছিলেন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত একটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। পিতা বিশ্বামিত্র ও গুরু কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি। ইনি সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক এবং এরই রচিত সুশ্রুত সংহিতা বিশ্বের সুমহান গ্রন্থগুলোর অন্যতম। সেকালে তো বটেই, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও গ্রন্থটিকে ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতা আজও এক বিস্ময়।

জীবক বা জীবক কোমারভচ্চ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এবং মগধের রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক। জন্ম রাজগৃহে। ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিশু চিকিৎসক। তার চিকিৎসার খ্যাতি এখনও কিংবদন্তী হয়ে আছে। বৃদ্ধ জীবকতন্ত্র নামে একখানি শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

চরকের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবেধ আছে। কেউ বলেন, তিনি মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক ও তার চিকিৎসক। জন্ম কাশ্মীরে। এর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা না গেলেও এর রচিত চরক সংহিতা বিশ্বের এক অদ্বিতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র। এককালে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় গ্রন্থটিকে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এত সম্মান বোধ হয় পৃথিবীর কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর বৈদিক ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের অপর যে শাখায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল সেটি জ্যোতির্বিজ্ঞান। যেহেতু বৈদিক ভারতবর্ষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। বছরকে বার মাস ও বিভিন্ন ঋতুতে তারা ভাগ করেছিল। তার উপর বছরের বিশেষ বিশেষ সময় আর্যরা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। তাই ঋতু ও তিথি—এই দুটির উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য চান্দ্র বছর এবং সৌর বছর এই দুয়ের তফাৎ তারা ধরতে পেরেছিলেন।

আকাশের ১৭টি নক্ষত্রপুঞ্জের কল্পনা একমাত্র বৈদিক ভারতবর্ষেরই। ভারতবর্ষ রাশিচক্রেরও কল্পনা করেছিল। তবে এ ক্ষেত্রে বিদেশি সমালোচকরা বাইরের কাছ থেকে ধার করা বলে উল্লেখ করে থাকেন। গ্রহণ গণনার ক্ষেত্রে অনুরূপ মন্তব্য করতেও দেখা যায়।

www.pathagar.com

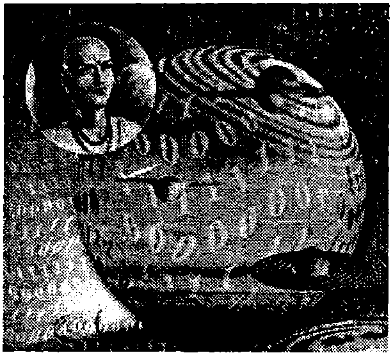

আর্য ভট্ট গণিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন

বৈদিক ভারতবর্ষ সাতটি গ্রহের উল্লেখ করেছে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ছাড়া তারা চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রহ মনে করতো। সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি তারা ভালোভাবে জানতো। অয়ন চলনের ব্যাপারটি জানা ছিল বলেও অনেকের বিশ্বাস। গণিতের ক্ষেত্রেও বৈদিক ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। শূন্যের সাহায্যে বিরাট বিরাট সংখ্যা প্রকাশের রীতি প্রথম ভারতবর্ষই আবিষ্কার করেছে। অপরাপর দেশের মতো ভারতবর্ষও পাটীগণিতের প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিল, ত্রৈরাশিক, ঘনমূল, বর্গমূল ইত্যাদি জানতো। বীজগণিতে সমান্তর শ্রেণী, গুণোত্তর শ্রেণী, দ্বিঘাত সমীকরণ প্রভৃতিরও আবিষ্কার করেছিল। সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল জ্যামিতিতে। পিথাগোরাসের বহু পূর্বে সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। বৈদিক যুগের কাত্যায়ন, বৌধায়ন, প্রভৃতি কয়েকজন সূত্রকারের সূত্র গভীর জ্যামিতি বিজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে।

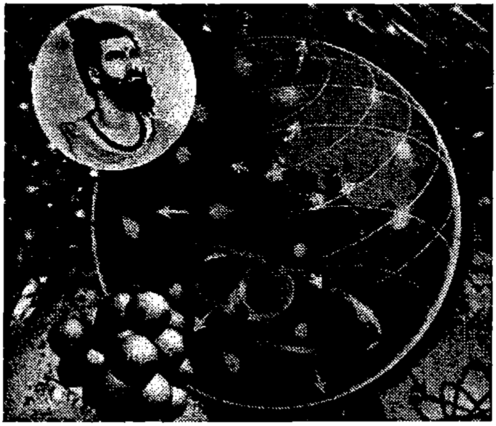

ঋষি কণাদ 'কণাবাদ' তথা পরমাণুবাদের অবতারণা করেছিলেন

ভারতবর্ষীয় ঋষি কণাদ 'কণাবাদ' তথা পরমাণুবাদের অবতারণা করেছিলেন—যার সঙ্গে ডালটনের পরমাণুবাদেরও কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুদ্ধ রসায়নবিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল। সোমলতা থেকে মদ্য জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করতো। নানারকম রঙ, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি তৈরি করতো এবং তৈরি করতো নানা প্রসাধন দ্রব্য। সে সময় রেশম চাষও হতো বলে অনেকের ধারণা। বস্ত্রশিল্পেও তারা অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর পর্যন্তই আর্যরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করেছিলেন। তারপর তাদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ে। কিন্তু অনুশীলনের ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল এবং পূর্বের আবিষ্কারগুলো লিপিবদ্ধ করারও চেষ্টা হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে কতগুলো সংহিতা গ্রন্থ। প্রায় পাঁচশ বছর পর ঐ সংহিতাগুলোকে অবলম্বন করে পুনরায় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে।

www.pathagar.com

ফিনিশিয়দের বিজ্ঞান

পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরের তীরে সিরীয় উপকূলে ফিনিশিয়া নামে একটি ছোট্ট দেশ ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের ফিনিশিয়ান নামে অভিহিত করা হতো। দেশটি দীর্ঘদিন ধরে মিশরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ওরা স্বাধীনতা অর্জন করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তাদের একটানা গৌরবময় যুগ চলেছিল।

একটি ডাকটিকেটে ফিনিশিয় নৌকার ছবি

ফিনিশিয়রা নৌ-বিজ্ঞানেই অধিক উন্নতি লাভ করেছিল। তারা সমুদ্র যাত্রার জন্য যেসব জাহাজ নির্মাণ করতো তার এক-একটির দৈর্ঘ্য ছিল আশি থেকে একশো ফুট পর্যন্ত। জাহাজের সামনে লাগানো থাকতো একরকম ডোবানো যন্ত্র। প্রয়োজন হলে ঐ ডোবানো যন্ত্রের সাহায্যে কোনো নৌকা বা জাহাজকে মুহূর্তের মধ্যেই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করতে পারতো। ব্যবসা-বাণিজ্যে ওরা ছিল খুবই দক্ষ এবং জলদস্যুতায় সে যুগে ওদের জুড়ি কেউ ছিল না। সুদূর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে তারা টিন আনতো। আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ বন্দর ছিল ওদের পশ্চিমের বাণিজ্য কেন্দ্র। আরও আশ্চর্যের কথা, ভাস্কো-ডা-গামার প্রায় দুই হাজার বছর আগে ওরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়েছিল এবং বর্তমানের 'কেপ অব গুড হোপ' তথা উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হয়েছিল।

ফিনিশিয়রা ছিল দুঃসাহসী নাবিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তারা বহু জায়গায় যাতায়াত করতো এবং বিদেশিদের ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখতো কিংবা বাজারে বিক্রি করতো। হত্যা ও লুণ্ঠনে ওদের সাথে কেউ পেরে উঠতো না। তবু বিজ্ঞান

www.pathagar.com

এবং পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সভ্যতা ওদের কাছে অনেকখানি ঋণী। ওরা মিশরীয় বর্ণমালা থেকে বাইশটি অক্ষর নিয়ে এক উন্নত ধরনের বর্ণমালা রচনা করেছিল। সেই বর্ণমালাই গ্রিক ও রোমান বর্ণমালার ভিত্তি। তাদের জাহাজ নির্মাণ কৌশল ও জাহাজ ডোবানো যন্ত্রকে অনুকরণ করেছিল পাশ্চাত্যের গ্রিস ও রোম।

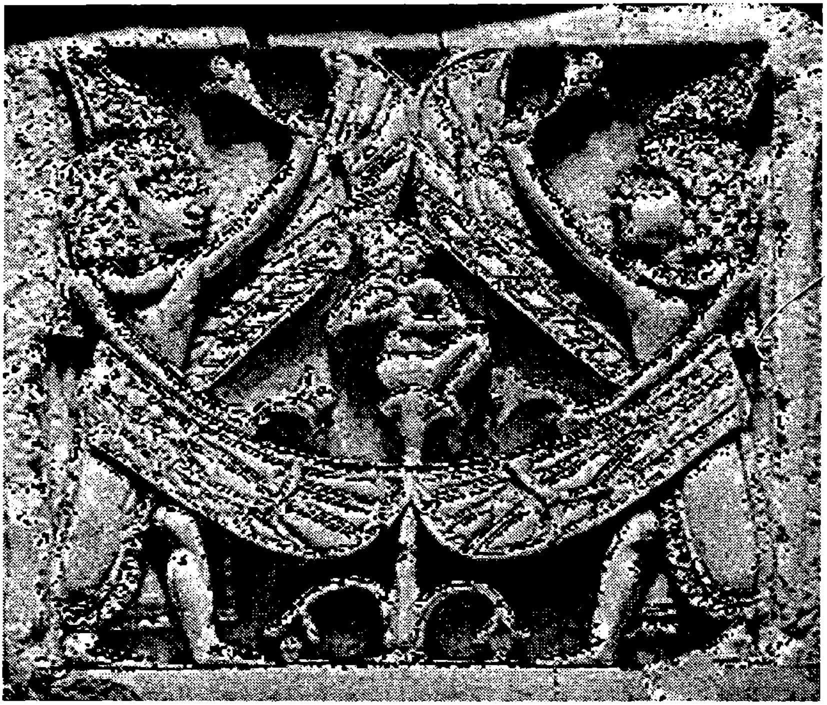

একটি ফিনিশিয় জাহাজের ছবি

আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় পদ্ধতি ফিনিশিয়দের আবিষ্কার। ধাতু শিল্পে ও রাসায়নিক শিল্পে সে আমলে ওদের চেয়ে উন্নত কেউ ছিল না বললেও চলে। তারা আফ্রিকা থেকে বয়ে আনতো উটপাখির পালক, হাতির দাঁত এবং প্যাপিরাস। স্পেন থেকে আনতো রুপা এবং ইংল্যান্ড থেকে আনত টিন। দেশকে একেবারে শিল্পে ভরিয়ে ফেলেছিল তারা। তারা মদ তৈরির কৌশল জানতো, তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করতো, মিহি পশমীবস্ত্র বয়ন করতো, সুতিবস্ত্রকে নানা রঙে রঞ্জিত করতো। এছাড়াও তারা এক ধরনের লাল রঙ তৈরি করতো—যার চাহিদা ছিল বিদেশে প্রচুর। এ ছাড়াও তারা তৈরি করতো কাঁচ, চীনামাটি ও রুপার সুদৃশ্য পানপাত্র। কথিত আছে ওরা লৌহিত সাগর দিয়ে ভারতেও বাণিজ্য করতে আসতো।

প্রকৃতপক্ষে ফিনিশিয়রাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের পানিপথটি সে-সময়ই আবিষ্কার করেছিল। তাদের উন্নত কারিগরিবিদ্যা ও শিল্প গ্রিকদের যথেষ্ট

www.pathagar.com

আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল এবং সে প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিনিশিয়া পারস্যের অধীন হয়ে পড়ায় তারা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।

ক্রিটীয় সভ্যতার বিজ্ঞান

অতি সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে ক্রীটদ্বীপ। ক্রীটদ্বীপ এবং তার আশপাশের জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে আরও একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে বহু নিদর্শন। সেই থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, উক্ত সভ্যতাটিও তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। মিশরের প্রায় সমসাময়িক কালে অর্থাৎ ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সভ্যতাটি বিকাশ লাভ করেছিল। সুমেরীয় সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে উক্ত সভ্যতার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতাটি ক্রীটের ঈজিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। সভ্যতাটির নামকরণের কারণ, ঈজিয়ান সাগরে দ্বীপগুলোকে ঘিরে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। গ্রিকদের উত্থানের যুগে সভ্যতাটি গ্রিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ক্রিট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় ভূমধ্যসাগরের এই দ্বীপে বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর হয়েছিল

www.pathagar.com

গ্রিকদের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

(খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

গ্রিক-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য

বিজ্ঞানের জন্ম প্রাচ্য ভূখণ্ডে। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অনুশীলন হচ্ছিল।

বিজ্ঞানে মানুষ যতখানি উন্নতি করেছিল তার অধিকাংশের সূচনা হয়েছিল নব্য প্রস্তরযুগে। হাজার হাজার বছর অনুশীলনের ফলেও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটার কোনো উন্নতি হয়নি বলা চলে। কেবল ব্যবহারিক দিকটার প্রতি এতকাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করে আসছিল। উদাহরণস্বরূপ মিশরে জ্যামিতির উদ্ভব হলেও সে জ্যামিতি ছিল পরিমিতির নামান্তর। তিন বা ততোধিক সরলরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই বিচার করা হতো, কিন্তু ঐ রেখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। ব্যাবিলন হাজার হাজার বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। লক্ষ্য করেছিল গ্রহদের গতিবিধি, নানাপ্রকার তারামণ্ডল ইত্যাদি। কিন্তু মহাকাশের রহস্য ভেদ করতে যত্নবান হয়নি। সিন্ধু সভ্যতায় দাড়িপাল্লা, বাটখারা ইত্যাদি অনেক পাওয়া গেছে। ব্যবহারিক জ্ঞান অনুযায়ী উলম্ব থেকে তুলাদণ্ডের দুই পাশের দূরত্ব সমান থাকলেও বেশি কম হলে কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। তাছাড়া সে আমলে কোনো জাতিই বিজ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধভাবে আলোচনা করেনি। এককথায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেনি কেউ এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক নয়, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটাও যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এ চিন্তাটা যেন কারও মাথায় আসেনি।

গ্রিকদের বৈশিষ্ট্য, তারা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা যেমন লক্ষ্য করেছিল তেমনি লক্ষ্য করেছিল তার তাত্ত্বিক দিকটাও। যার ফলে প্রথম প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান এসেছে ঐ গ্রিকদের হাত ধরেই। অনেকের মতে, প্রকৃত বিজ্ঞান বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝি তার প্রকৃত রূপকার গ্রিকরা। গ্রিকদের আরও বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখারই গোড়াপত্তন করেছিল তারা। উক্ত কারণে বিজ্ঞানে গ্রিকদের অবদান মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত গ্রিকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সামান্য তথ্য জানা গিয়েছিল প্রখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা ইতিহাস এবং মহাকবি হোমার রচিত পৌরাণিক কাহিনী থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে দুইজন জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক শ্‌লীম্যান ও ডফফেলড মিকেনাই, মিসিন, ট্রয় প্রভৃতি অঞ্চলে খনন কার্য চালান। ফলে আবিষ্কৃত হয় বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্যার আর্থার ইভান্সের নেতৃত্বে ক্রীট দ্বীপের নোমসস নামক একটি স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় কিছু কিছু নিদর্শন। উক্ত নিদর্শনগুলো থেকে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, গ্রিক সভ্যতাও সুপ্রাচীন সভ্যতা। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে যেমন ক্রীট সভ্যতার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই ক্রীট সভ্যতার সঙ্গে গ্রিক সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ধারণা করা হচ্ছে, এই সভ্যতা ব্রোঞ্জযুগে গঠিত হয়েছিল এবং প্রভাব পড়েছিল মিশর ও ক্রীট সভ্যতার।

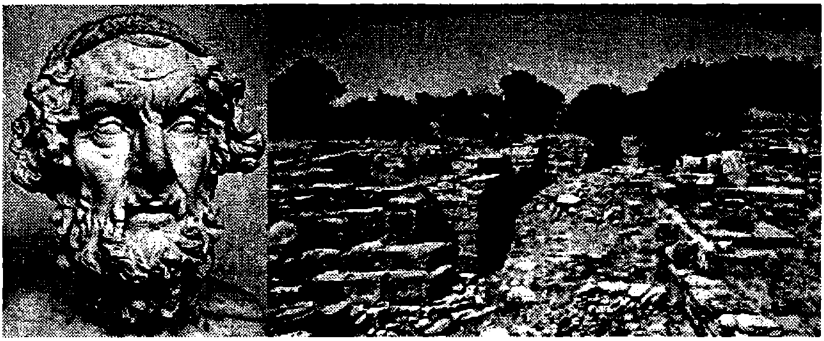

কবি হোমার ও ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষ

মিসিনে এবং ট্রয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে ট্রোজান যুদ্ধের বহু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলো প্রমাণ করেছে মহাকবি হোমারের কাহিনী অনৈতিহাসিক নয়। মহাকবি নিজেই উল্লেখ করেছেন গ্রিসে ব্রোঞ্জযুগের উন্নত সভ্যতা। তিনি যে অ্যাকিয়ানদের কথা বলেছেন, তারা ছিল বহিরাগত। ওরা লোহার ব্যবহার জানতো। ফলে ওদেরই হাতে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে গ্রিসের ব্রোঞ্জ সভ্যতা ধ্বংস হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে গ্রিকভাষী অ্যাকিয়ানরা। অনেকের মতে ঐ অ্যাকিয়ানরা এসেছিল দানিউব নদীর উপত্যকা থেকে এবং আকৃতিতে ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও সুদর্শন।

ঐ অ্যাকিয়ানরা আবার পরাজয় স্বীকার করে দোরীয় নামক বহিরাগত এক উপজাতির কাছে। দোরীয়রাও লোহার ব্যবহার জানতো। এদের উন্নত অস্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল অ্যাকিয়ানরা। দোরীয়দের পরও এসেছিল নানা জাতি। সর্বোপরি, এখানকার আদিম অধিবাসী, অ্যাকিয়ান, দোরীয় এবং আরও বহু জাতির সংমিশ্রণে কালক্রমে গঠিত হয়েছে গ্রিক জাতি। আর ওদের জ্ঞান-

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। ওদের রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু সুদীর্ঘ নয়। নানা বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হতে সময় লেগেছিল আরও কয়েক শতাব্দী। তারপরই অনুকূল পরিবেশ লাভ করায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় এখানে। সে ইতিহাসও মাত্র কয়েকশো বছর। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পুনরায় শুরু হয় বৈদেশিক আক্রমণ। আর তখন থেকেই গ্রিসের আকাশে অন্ধকার ঘনীভূত হতে থাকে।

গ্রিকদের উন্নতির মূলে অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত বিজ্ঞানের ভিত্তি তাদের গড়তে হয়নি। একদিকে বিজ্ঞানে উন্নত বহু বহিরাগত জাতির সমাবেশ ঘটেছিল এবং ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে তারা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাতায়াত শুরু করেছিল। এদিক থেকে ফিনিশিয়দের কাছ থেকে তারা লাভ করেছিল অণুপ্রেরণা। তবে ওরা ফিনিশিয়দের মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল না। কেবলমাত্র বাণিজ্যের কারণেই তারা যাত্রা করতো।

গ্রিকরা নিকটবর্তী ক্রীট ও মিশর তো বটেই মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, এমনকি ভারতবর্ষেও আসতো। ওদের ছিল প্রবল অনুসন্ধিৎসা। একদিকে বিভিন্ন দেশের জনজীবনের সঙ্গে যেমন পরিচিত হতো, অপরদিকে তেমনই যেখানে যত নতুন আবিষ্কার দেখতো তাকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতো। উদাহরণস্বরূপ থেলস ও পিথাগোরাসের কথা ধরা যেতে পারে। এদের উভয়েরই মাতা গ্রিক কিন্তু পিতা ছিলেন ফিনিশিয়দের বংশধর এবং উভয়েই প্রথম জীবনে ছিলেন বণিক। বাণিজ্যের কারণে থেলস মিশরে গমন করলে সেখানকার উন্নত জ্যামিতি তার দৃষ্টিগোচরে আসে। ফলে জ্যামিতি সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞানলাভের আশায় তিনি বেশ কিছুদিন মিশরে অবস্থান করেন। পরে তিনি মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে সেখানকার উন্নত

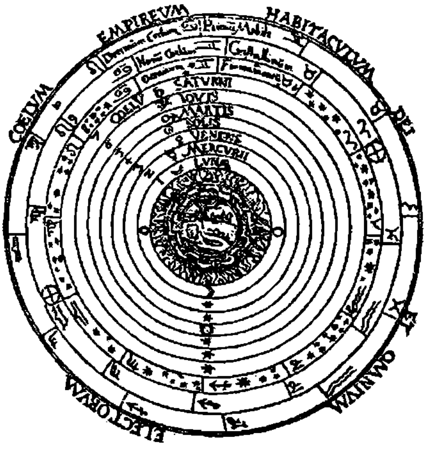

টলেমি ও তাঁর অঙ্কিত পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যাও আয়ত্ত করেন। অপরপক্ষে পিথাগোরাসও একাধারে ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও বণিক। তৎকালীন সভ্যদেশগুলোর উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য বহুদিন নানা জায়গায় অবস্থান করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ভারতেও এসেছিলেন এবং বৈদিক ভাষা শিক্ষালাভ করার পর ভারতবর্ষীয় দর্শন সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করেছিলেন। মোট কথা, গ্রিকরা নিজের দেশের আবিষ্কারগুলোকে নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন না। অপর দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানটা প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশভ্রমণ করেছিলেন। আর যেখানে যত মূল্যবান তথ্য পেয়েছেন সেগুলোকে আয়ত্ত করেছেন। বিজ্ঞানের নিয়মও তাই। সে দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। সামান্য উপকরণকে অবলম্বন করে বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরি হতে পারে।

গ্রিকরা যে বিভিন্ন সভ্যদেশগুলোর কাছ থেকে বিজ্ঞানের বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার উল্লেখ একাধিক গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রিকপণ্ডিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের ঋণ এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে মিশরের ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে গেছেন।

অন্যদিকে গ্রিসে বহু চিন্তানায়কের আবির্ভাব গ্রিক সভ্যতা বিকাশের আর একটি বড় কারণ। থেলস, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, আর্কিমিদিস-সহ পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলোর মধ্যে অন্যতম। অবশ্য সর্বস্তরের প্রতিভা বিকাশের সুবিধা ছিল। গ্রিস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও গণতান্ত্রিক আদর্শে রাজ্য পরিচালিত হতো। সব মানুষের সমান অধিকার ছিল। শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

গ্রিক একাডেমিতে ছাত্রদের বিজ্ঞান, দর্শন ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো

www.pathagar.com

সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদা সমান হওয়ায় এবং ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক সব আবিষ্কারের স্বীকৃতি থাকায় গ্রিসে এত প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল।

প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল শিষ্যদের দর্শন বোঝাচ্ছেন

প্রতিভা বিকাশের আরও কারণ ছিল। সেখানে কঠোর রাজতন্ত্র কিংবা পুরোহিতবর্গের কঠোর অনুশাসনও প্রচলিত ছিল না। সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদা যেমন সমান ছিল তেমনি ছিল মানবিকতাবোধ। কোনোরূপ সংস্কার তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

মহাকবি হোমারের মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড এবং ওডিসিতেও সে সুর স্পষ্ট। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকারা আপন অদৃষ্টকে স্বীকার করেন নি। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়তে চেষ্টা করেছেন। কোনো ক্ষেত্রে ভাগ্যের কাছে মাথা নত করেন নি তারা। সেখানে দেব-দেবীরও কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের দেব-দেবী সর্বশক্তিমান ছিলেন না। মানুষের মতো দোষগুণ উভয়ই গ্রিক দেব-দেবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেখানকার দেব-দেবী কাঁদতেন মানুষের জন্য আবার দেবতার দুঃখে মানুষও কাঁদতো। কোনো দেবতা অপরাপর দেশে কল্পিত দেবতার মতো মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হরণ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতেন না। অপরদিকে পুরোহিত সম্প্রদায়ের লেখা গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বা সৃষ্টিকর্তার বাণী হিসেবে আখ্যা দান করে মানুষের পৌরুষত্বকে খর্ব করা হয়নি। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব দান করে মানুষের পৌরুষত্বকে প্রকাশ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রিক সভ্যতা আজ বিশ্ববাসীর বিস্ময়।

www.pathagar.com

এছাড়াও সুষ্ঠুভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারও গ্রিকদের অগ্রগতির আর এক কারণ। গ্রিক পণ্ডিতরা যা আবিষ্কার করতেন এবং বিদেশ থেকে যে সব তত্ত্ব আহরণ করতেন সেগুলোকে লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। তাই পরবর্তীকালে যেসব পণ্ডিত বা চিন্তানায়ক এসেছিলেন তাঁদের গবেষণায় নিবেদিত হতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে পণ্ডিতরা মনে করেন, সে এক সর্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা এবং বিচার বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ। তারই উপর ভিত্তি করে কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানে অতিশয় সাফল্য। এগুলোর সবই যে গ্রিসের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রথমভাগে উদ্ভব ও বিকশিত হয়েছিল সে কথা মহাকবি হোমারের মহাকাব্যদ্বয় থেকে জানা যায়। বহু পণ্ডিতের মতে, প্রথম দিকের এই সভ্যতা অপরাপর দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও একমাত্র মানবতাবোধ ও ধর্মনীতির শাসনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল। তবে ধর্মনীতির শাসনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল। ধর্মনীতি বলতে গোঁড়ামি এবং সংস্কারের সমাবেশ নয়। যা মানুষের মহত্ত্বকে বিকশিত করে, নিজের উপর আস্থা স্থাপনে যত্নবান হতে সাহায্য করে, সর্বশ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিতে পারে, তাই-ই ছিল ধর্মজ্ঞান। ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের অভ্যুত্থানের যুগ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর চলেছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। তারপর ফিলিপের আমলে কঠোর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্বের সেই পরিমণ্ডল ভেঙে সঙ্কুচিত হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুবিশাল ক্ষেত্রটি। অবশেষে পরবর্তী রাজনৈতিক উত্থান-পতনের যুগে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল।

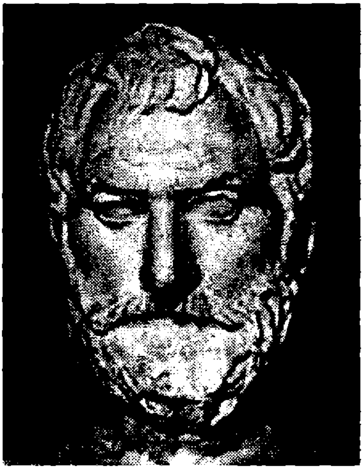

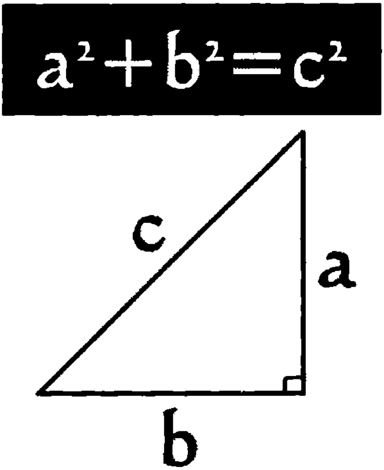

পিথাগোরাস ও তাঁর জ্যামিতিক চিত্র

www.pathagar.com

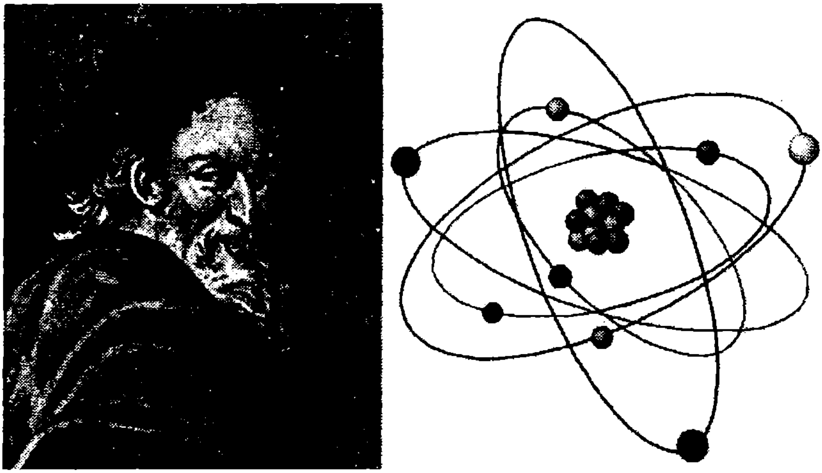

ডেমোক্রিটাস ও তাঁর পরমাণু মডেল

গ্রিসের বৈজ্ঞানিক তথ্য মূলত দর্শনের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহামনীষী থালেসের দ্বারা। অন্যদিকে থালেস থেকে প্লেটো পর্যন্ত দর্শনের যে ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল তাতে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ পর্যায়ে গ্রিক দর্শনের মহানায়কেরা যথা থেমস, অ্যানাক্সামেন্ডার, অ্যানাক্সাগোরাস, অ্যানাক্সামেনস, পিথাগোরাস, হেরাকিটিস প্রভৃতি বিশ্বের উপাদান এবং স্থূল বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কতগুলো তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তাছাড়া পৃথক পৃথকভাবে তারা অঙ্ক, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

এথেন্সের একটি স্কুলে প্লেটো ও অ্যারিস্টোটল দর্শন শিক্ষা দিচ্ছেন

www.pathagar.com

প্লেটোর দর্শনচিন্তা পরবর্তীকালে অন্যরূপ পরিবর্তন সাধন করে। প্লেটোর দর্শন ছিল অন্তর্মুখী। আধ্যাত্মজগৎ নিয়েই ছিল তার দর্শন। স্থূল বস্তুকে তিনি উপেক্ষাই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারই দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'প্লেটো একাডেমি' বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্দ্রিয়ার সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে করেছে মহান। সর্বযুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটল ছিলেন ঐ প্লেটো একাডেমিরই ছাত্র। তিনি উত্তরকালে যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেছিলেন তাতে একদিকে যেমন প্লেটোর দর্শন পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছিল অপরদিকে তেমনই পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছিলেন। আর অ্যারিস্টোটলের পরই এসেছিলেন মহামতি আর্কিমিডিস। তিনি গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রনায়ক।

গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে আছে গ্রিকদের অবিস্মরণীয় অবদান। গণিত ও জ্যামিতির সূচনা করেছেন ইউক্লিড ও পিথাগোরাস, গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন আর্কিমিডিস। পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্বন্ধে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু করেন অ্যারিস্টার্কাস। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত করেন হিপোক্রেটিস এবং জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন অ্যারিস্টোটল। এক কথায় বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন গ্রিকরাই। তাই আজ সেই সব মহামণীষীদের কয়েকজনকে বিজ্ঞানের এক একটি শাখার 'জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস, জীবজিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টোটল, উপস্থিতি বিদ্যার জনক আর্কিমিডিস।

সেকালে গ্রিসে বহু প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল। বিজ্ঞানের এক একটি শাখায় আবার অনেকের অবদান পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের নাম, আবির্ভাবকাল এবং আবিষ্কারের একটি তালিকা প্রদান করা হল:

www.pathagar.com

গ্রিক বিজ্ঞানী ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার

থালেস (খ্রি. পূ. ৬২৫-৫৪৫) : একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও পূর্তবিদ্যা বিশারদ। ইনিই প্রথম উচ্চারণ করেন, বিশ্ব জগতের রহস্যের মূলে প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান।

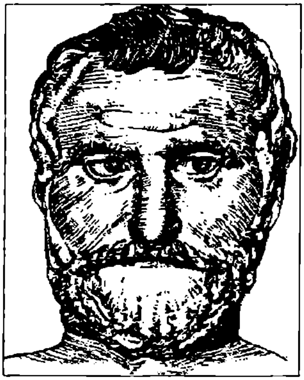

আবিষ্কারসমূহ : (১) সূর্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ (২) বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করে (৩) সমবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় সমান (৪) ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা (৫) ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের দ্বারা কোনো সুউচ্চ বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়।

থিওফ্রাস্টাস অ্যানাক্সামেন্ডার (খ্রি. পূ. ৬১১-৫৪৭) : **পাশ্চাত্য দর্শনের স্রষ্টা**। জ্যোতিষ, জ্যামিতি সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষক। ইনিই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর স্থলভাগকে যে সমুদ্র বেষ্টন করে আছে—এই সত্যটি তাঁর মানচিত্র থেকে প্রকাশ পায় এবং মানচিত্রটি দীর্ঘদিন নাবিকমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। এর লিখিত পুস্তক Nature (নেচার)।

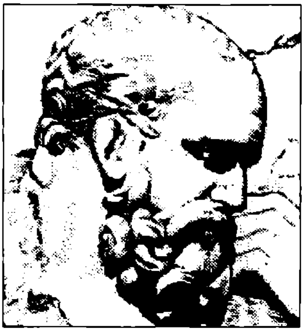

অ্যানাক্সামেনস (খ্রি. পূ. ৫৮৫-৫২৮) : বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি উল্লেখ করেন পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহরা বায়ুসমুদ্রে ভাসমান। প্রচার করেন, চন্দ্রের নিজস্ব কোনো দ্যুতি বা আলো নেই। ইনি বায়ুকে পৃথিবী সৃষ্টির মূল উপাদান হিসেবে ধরেছিলেন।

পিথাগোরাস (সম্ভবত খ্রি. পূ. ৫৭৫-৪৯৭) একাধারে দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য ক্রোটনে ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করেন এবং সমাজসংস্কার ও মানুষের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সংঘের সবাইকে

www.pathagar.com

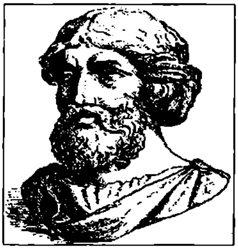

সন্ন্যাসজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করান। তিনি কিছু লিখে যাননি। সংঘের সদস্যদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচলিত তথ্যগুলো থেকে জানা যায়, সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছিলেন, সমকোণী ত্রিভূজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটির প্রবক্তা এবং তিনিই আকাশের গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকার কল্পনা করেন।

পার্মেনিডিস (জন্ম আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫১৬ অব্দ) : প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর লেখা

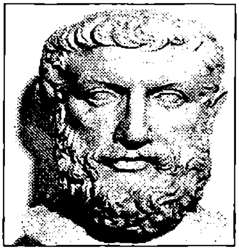

থেকে জানা যায় সক্রেটিসের ১৮ বছর বয়সের সময় পার্মেনিডিসের বয়স ছিল ৬৫। তাঁর দর্শনে কোনো কিছুর বিনাশ নেই এবং 'কিছু না' থেকে সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ বর্তমানে বিজ্ঞানের 'বস্তুর নিত্যতা সূত্র' তাঁর দর্শনেই পাওয়া যায়।

এল্কমেয়ন বা আলক মাওন (জন্ম সম্ভবত খ্রি. পূ. ৫০০ অব্দ): অপটিক নার্ভের আবিষ্কর্তা। আমাদের অনুভূতি ও মননশক্তির কেন্দ্রস্থল যে মস্তিষ্ক—এই সত্যটি তিনিই উদঘাটন করেন।

অ্যানাক্সাগোরাস (খ্রি. পূ. ৫০০–৪২৮) প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ইনিই প্রথম

চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উল্লেখ করেন পৃথিবী, চাঁদ ও আকাশের গ্রহগুলোর উপাদান একই। সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বলে মনে করতেন না। তাই তিনি নাস্তিক আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন এবং রাজদরবারে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

এম্পিডকলেস (খ্রি. পূ. ৪৯৪-৪৩৪) : প্রখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ও পদার্থবিদ। ইনিই প্রথম প্রমাণ করেন আলোর গতিবেগ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার নীতি তিনিই গ্রহণ করেছিলেন।

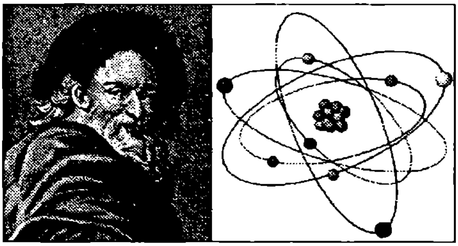

ডেমোক্রিটাস (জন্ম খ্রি. পূ. ৪৬০ অব্দ) : পরমাণুবাদের প্রথম প্রবক্তা। জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও গবেষণা করেছিলেন।

www.pathagar.com

হিপোক্রেটিস (খ্রি. পূ. ৪৬০-৩৭৭): চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রথম

তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলেন এবং মানবদেহ সম্বন্ধে গবেষণার প্রথম সূত্রপাত করেন। তিনি নিজে সুচিকিৎসক ছিলেন এবং ১০১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তার দীর্ঘদিনের চিকিৎসা জীবনের অভিজ্ঞতা সর্বকালের সমস্ত চিকিৎসাবিদ অনুসরণ করে আসছেন।

অ্যানারকাসিম (খ্রি. পূ. পঞ্চম শতাব্দী) : বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ। হাপরের আবিষ্কর্তা।

থিওডোরাস লাভেল (খ্রি. পূ. পঞ্চম শতাব্দী) : বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ। মাপনযন্ত্র, লেদ, রুলার, চাবি, সেটস্কোয়ার প্রভৃতি বহু জিনিসের আবিষ্কারক।

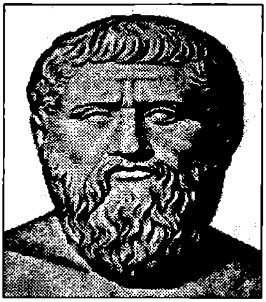

প্লেটো (খ্রি. পূ. ৪২৮–৩৪৮) : পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তা সত্ত্বেও গণিতে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান আছে। বিন্দু, রেখা, তল, ঘন ইত্যাদির নির্ভুল সংজ্ঞা প্রথম তিনিই দান করেছেন। প্লেটো ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শিক্ষাগুরু। তার দর্শন এখনও পৃথিবী ব্যাপী সমাদৃত।

ইউডক্সাস (খ্রি. পূ. ৪০৯–৩৫৬) : ইনিই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। Theory of proportion এবং Method of exhaustion-এর আবিষ্কার। তার এই আবিষ্কার আর্কিমিডিসকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে Method of exhaustion-এর থেকে Integral calculus-এর উদ্ভব।

হেরাক্লিডিস (খ্রি. পূ. ৩৮৮–৩১৫) : প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পৃথিবীর আহ্নিকগতির আবিষ্কর্তা। ইনিই প্রথম উল্লেখ করেন, বুধ ও শুক্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

মেনেকমাস (খ্রি. পূ. ৩৭৫–৩২৫) : কৌনিক জ্যামিতির আবিষ্কর্তা।

অ্যারিস্টোটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪–৩২২) : প্রখ্যাত দার্শনিক ও জীব বিজ্ঞানী। জীবজন্তুর আকৃতির তারতম্য অনুসারে জীবকে প্রথম ইনিই কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। জীববিদ্যার জনক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

www.pathagar.com

থিওফ্রাস্টাস (খ্রি. পূ. ৩৭৩-২৮৮) :

উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার গবেষক ও বহু তথ্যের আবিষ্কারক। ইনি প্রথম White Lead প্রস্তুত করতে সমর্থ হন।

ডিকেয়ারবাস (খ্রি. পূ. ৩৫৫-২৮৫) : পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে প্রথম অক্ষাংশের কল্পনা করেন।

হিরোফিলস (খ্রি. পূ. ৩০০ অব্দ) : প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও যন্ত্রবিদ। শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য উদঘাটন করেন এবং চোখের গঠন বৈচিত্র্য প্রদান করেন।

ইরাসিসট্রেটাস (খ্রি. পূ. চতুর্থ শতাব্দী) : রক্ত সংবহন সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক তথ্য আহরণ করেন। মস্তিষ্ক, ধমনী ও শিরা, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য তথ্য আহরণ করেছিলেন।

ইউক্লিড (খ্রি. পূ. ৩৩০-২৬০) :

প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ। প্রচলিত জ্যামিতিক তথ্যগুলোকে তিনি সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্কলিত করে মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন। তার জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতি নামে আজও প্রসিদ্ধ। আলোকের স্বরূপ ও তার প্রতিফলনের নিয়মগুলো সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন ইউক্লিড।

আর্কিমিডিস (খ্রি. পূ. ২৮৭-২১২) : উপস্থিতিবিদ্যার জনক। বলবিদ্যা ও পূর্তবিদ্যার

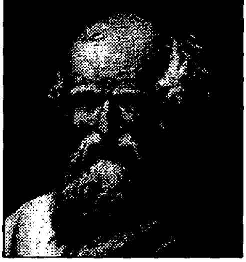

ভিত্তি স্থাপক। ইনিই প্রথম সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মহান কৃতিত্ব তারই। বহু আবিষ্কারের সঙ্গে আর্কিমিডিসের নাম জড়িত। তাদের মধ্যে তরলের প্লাবিতা সূত্র ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় তার সুমহান কীর্তি। গণিতেও আছে তার অসামান্য অবদান।

স্ট্রাটো (খ্রি. পূ. ২৮৭-২৫৯) : বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করার কৃতিত্ব স্ট্রাটোর। বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ।

www.pathagar.com

স্টেসিবাস (খ্রি. পূ. ২৮৫-২২২) : ক্ষৌরকারের পুত্র নামে খ্যাত এক বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ। ইনি ফোর্স পাম্পের আবিষ্কর্তা। পানিঘড়িও নাকি ইনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

অ্যাপোলোনিয়াস (খ্রি. পূ. ২৬০-২০০) : প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। কৌনিক জ্যামিতির গবেষক। প্যারাবোলা, হাইপারবোলা, ইলিপস প্রভৃতি শব্দগুলো ইনিই প্রথম ব্যবহার করেন।

ইরাটোস্থেনিস (খ্রি. পূ. ২৭৩-১৯২) : প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক। ইনিই প্রথম পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন।

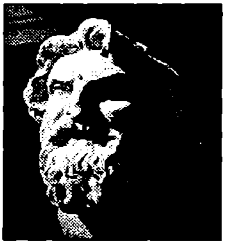

অ্যারিস্টার্কাস (খ্রি. পূ. ৩১০-২৩০) : প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়ে এবং পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন নির্ণয়ের প্রথম প্রয়াস অ্যারিস্টার্কাসের। তাঁর আরও এক সুবিশাল অবদান, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের কল্পনা।

হিপার্কাস (খ্রি. পূ. ১৯০-১২০) : পৃথিবীর অয়ন চলন সংক্রান্ত তথ্যের প্রবর্তক এবং গণিতের ত্রিকোণোমিতি শাখাটির উদ্ভাবক।

টলেমি সোতার (খ্রি. পূ. চতুর্থ শতাব্দী) : বিজ্ঞানে বিশেষ কোনো অবদান না থাকলেও বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পথকে প্রশস্ত করার জন্য গ্রন্থাগার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, শব ব্যবচ্ছেদের ঘর, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি অনেক কিছু স্থাপন করেছিলেন। এর ফল সুদূরপ্রসারী। যে টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ এককালে ভয়ানকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল, সে টলেমি ইনি নন। তিনি ক্লডিয়াস টলেমি এবং তার আবির্ভাবকাল খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী।

হীরো বা হেরন (খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী) : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিদদের মধ্যে অন্যতম। বাষ্পচালিত টারবাইনের আবিষ্কর্তা। জ্যামিতিতেও তাঁর অবদান আছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দুঃসময়

বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছিল প্রাচ্যভূখণ্ডে তথা বর্তমান এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে। মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, চীন ও ভারতবর্ষে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মূল্যবান শাখাগুলো কেবলমাত্র সৃষ্টি হয়নি, প্রত্যেকটি শাখা যথেষ্ট পরিপূর্ণতাও লাভ করেছিল। আর বিজ্ঞানে তাদের ঐ উন্নতিলাভ করার জন্যই সুখ-সমৃদ্ধির বন্যা বয়ে গিয়েছিল এবং বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সুসভ্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একমাত্র চীন সভ্যতা ছাড়া আর কোনো সভ্যতা দীর্ঘকাল টেকেনি। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সে সময় হোঁচট খেলেও অনুশীলনের কাজটা কিছুটা হলেও চলছিল। ফলে কয়েকশো বছরের ব্যবধানে পুনরায় জাগরণ এসেছিল। কিন্তু মিশর, ব্যাবিলনে বিজ্ঞানের সেই সমৃদ্ধ সময় আর ফিরে আসেনি।

প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলোর আত্মতৃপ্তির মনোভাব তাদের ধ্বংসের মূল কারণ। নিজেদের আবিষ্কারগুলোকে নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। ভেবেছিল, যা তারা আবিষ্কার করছে, তার উপর আর কিছু থাকতে পারে না। নিজেদের আবিষ্কারগুলোকে নিয়ে আরও গবেষণা করার মনোভাব যেমন হারিয়েছিল তেমনই কোথাও কোনো নতুন আবিষ্কার হচ্ছে কিনা সে খবরও তারা রাখার প্রয়োজন মনে করত না। তাই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় থাকা মাত্র কয়েকটি জাতি কিংবা উপজাতির হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যেমন উন্নত ব্যাবি-লনীয়রা ধ্বংস হয়েছিল আসিরিয়দের হাতে। অপরদিকে লৌহ নির্মিত অস্ত্র, রথ ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করে পারসিকরা ধ্বংস করেছিল মিশরকে এবং আর্যরা ধ্বংস করেছিল সিন্ধু সভ্যতাকে। মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ও ফিনিসিয় সভ্যতা কোনোরকমে টিকে ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর হারিয়ে গেছে চিরতরে। বর্তমানে সেই সভ্যতাগুলো গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে আর্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও নেমে আসে অন্ধকার এবং উক্ত সভ্যতাও আজকের গবেষণার বিষয়।

সভ্যতাগুলো এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির জন্য নানা কারণ বিদ্যমান। মানুষ যখন প্রথম নদীর তীরে বসবাস শুরু করেছিল তখন তারা ছিল দলবদ্ধ এবং একটা সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। সেই সমাজে সব মানুষের সমান অধিকার ছিল। সেদিনের মানুষ যা কিছু করতো, সবই দলগত স্বার্থে। ব্যক্তি স্বার্থ আদৌ ছিল না। যে

www.pathagar.com

কোনো আবিষ্কার সম্পদরূপে বিবেচিত হতো এবং দলের প্রতিটি মানুষের প্রতিভাকে কাজে লাগানো হতো। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি।

প্রথম প্রথম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে চাষবাস করতো। চাষের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সমবেতভাবে যে ফসল তারা উৎপন্ন করতো তা তারা সবাই আহার্যরূপে গ্রহণ করতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো। যারা বুদ্ধিমান তারা ছলে, বলে ও কৌশলে দখল করল প্রচুর জমি। আর তারই ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে দেখা দিল শ্রেণী বৈষম্য। যাদের অধীনে বেশি জমি থাকলো তারা লোকজনকে খাটিয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে মজুত রাখলো, আর যাদের জমিজমা কম ছিল অথবা আদৌ ছিল না তারা মহাজনের জমি ভাগে চাষ শুরু করল অথবা জনমজুরি খাটতে লাগল। এভাবে সমানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ধনী ও গরীব সম্প্রদায়।

শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার আগে মানুষের চাহিদা ছিল নূন্যতম এবং প্রত্যেকের মধ্যে ছিল সম্প্রীতির সম্পর্ক। সবাই চাহিদা পূরণ করতো পরিশ্রমের মাধ্যমে। কিন্তু এরই মাঝে বিনা পরিশ্রমে এক শ্রেণীর হাতে জমা হল প্রচুর সম্পদ। সম্পদ থেকে লোভ। বুদ্ধিবলে এবং সম্পদের লোভ দেখিয়ে আরও ভূমিকে তারা গ্রাস করে নিতে থাকল। ধীরে ধীরে ভূমিহীনদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলল।

সম্পদ লাভ করায় তাদের মধ্যে আরও একটা উপসর্গ দেখা গেল। সেটা কর্তৃত্ব করা। আগে দলকে পরিচালিত করতো দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচক্ষণরা। এখন যাদের হাতে সম্পদ জমা হল তারাই হয়ে উঠল ক্ষমতাধর। পাতার কুঁড়ে ঘরের পরিবর্তে মাথাচাড়া দিল সুউচ্চ প্রাসাদ। সৃষ্টি হলো রাজপথ, রাজা, রাজত্ব। শুরু হলো ডাকাতি, হানাহানি, রক্তারক্তি, লুটতরাজ এবং রাজনীতি। আর ঠিক তখনই সমাজের বুকে দেখা দিল মনুষ্যত্বের অবমাননা—নিষ্ঠুর ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথা। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই বিজ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটেছিল। ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ প্রায় সব দেশেই একই সঙ্গে দেখা দিল সেই জঘন্য প্রথা। পরের দিকে পাশ্চাত্যে গ্রিক ও রোমানদের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারও মূলে ছিল ঐ ক্রীতদাসেরা।

প্রধানত যুদ্ধ-বন্দীদেরই ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হতো। অন্যদিকে লুণ্ঠনকারীরা ধনসম্পদসহ বহু নর-নারীকেও জোর করে ধরে নিয়ে আসত এবং গরু-ছাগলের মতো বাজারে বাজারে বিক্রি করত। যাদের লোকের দরকার হতো তারা মূল্য দিয়ে কিনে আনতো এবং কেবলমাত্র প্রাণটা যাতে থাকে তার জন্য যতটুকু পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই দিত এবং রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রম করাতো। অত্যাচারও করতো যেমন খুশি তেমন। সেকালের সেই যে বিশাল বিশাল ইমারত, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের পিরামিড, প্রভৃতি সবকিছুর মূলে ছিল ক্রীতদাসের অবদান। এমনকি ভারতবর্ষের মহান আর্য-সভ্যতার মূলেও ছিল ক্রীতদাস প্রথা।

www.pathagar.com

ক্রীতদাস প্রথা যতই জোরদার হলো, ততই কারিগরি বিদ্যাটা ঐ ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। অবহেলিত ক্রীতদাসের সঙ্গে তাদের কারিগরি কৌশলও অভিজাতরা ঘৃণার চোখে দেখলেন এবং উপেক্ষা করলেন।

সেই বিদ্যা লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না কেউই। অপরপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষের কারিগরি দক্ষতাও হলো অবহেলিত। ফলে কয়েকশো বছরের ব্যবধানে বেশ কিছু জিনিস হারিয়ে গেল এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের চিন্তাও হলো ব্যাহত।

ধর্মের গোঁড়ামিও বিজ্ঞান-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। মানুষ প্রথম যেদিন চোখ মেলে তাকিয়েছিল প্রকৃতির দিকে—সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল ঝড়বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, খরা-বন্যাসহ প্রকৃতির ভয়াল রূপগুলোকে। আরও লক্ষ্য করেছিল, আকাশে সূর্য জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির ঘুম ভাঙে, রাতে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দীপ্তিমান সূর্য ও চন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কালো মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকে, কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়, পাহাড়ে চূড়ায় অথবা বনে বনে আগুন জ্বলে ওঠে, ইত্যাদি কত সহস্র ঘটনা! এসব দেখেশুনে প্রথমে তাদের মনে ভয় এসেছিল এবং পরে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করেছিল। জীবের জন্ম-মৃত্যুর কথাও তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের প্রথম পর্বেই তাদের মনে দুটি চিন্তা পাশাপাশি অবস্থান করতে শুরু করে। একটি চিন্তা প্রকৃতি সংক্রান্ত এবং অপরটি বেঁচে থাকার চিন্তা। ঐ বেঁচে থাকার চিন্তা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়েই স্থান লাভ করেছে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে চিন্তা।

প্রথম প্রথম এ দুই চিন্তার মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। ধর্ম চিন্তার দ্বারা মনকে করতো কলুষমুক্ত এবং বিজ্ঞান চিন্তার দ্বারা আহরণ করেছিল সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দেশে দেশে অভিজাত ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে দুই চিন্তার মধ্যে দেখা দিল সংঘর্ষ।

পুরোহিত সম্প্রদায়ই কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন দেশের সবচেয়ে অভিজাত সম্প্রদায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে সাধারণ মানুষের হাতে জমে উঠবে সম্পদ। কারণ কঠোর পরিশ্রম করতে পারতো ঐ সাধারণ মানুষই। অভিজাতরা কর্মবিমুখ ও বিলাসী। সাধারণের হাতে সম্পদ এলে অভিজাতদের আভিজাত্য নষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের পরিশ্রম করতে হবে। তাই স্বার্থপর পুরোহিত সম্প্রদায় মানুষকে বোঝালেন, তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি। তাদের অবহেলা করার অর্থ সৃষ্টিকর্তাকে অবমাননা। তারা আরও জানালেন, সৃষ্টিকর্তার করুণায় সূর্য-চন্দ্র আলো দেয়, মাঠে মাঠে ফসল ফলে, বৃষ্টিপাত ঘটে, নদী প্রবাহিত হয় ইত্যাদি। আর সৃষ্টিকর্তা রুষ্ট হলেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা সত্য, আর সব কিছুই মিথ্যা।

www.pathagar.com

পুরোহিত সম্প্রদায় এই সব বাঁধা বুলি আউড়িয়ে সন্তুষ্ট হলেন না, বংশ পরম্পরায় সুখসুবিধাগুলো যাতে ভোগ করতে পারেন তার জন্য রচনা করলেন সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশক নানা কাল্পনিক কাহিনী এবং নানা প্রকার বিধিনিষেধ। তাদের সে কাহিনীগুলো যদিও ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব তবুও যেহেতু সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রকাশ করছে, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলো না। বরং কাল যতই গড়িয়ে যেতে লাগলো ততই সংস্কারে পরিণত হলো।

বেশ কয়েক পুরুষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুরু হলো ধর্মের নামে গোঁড়ামি। কোনো শাস্ত্র নিয়ে আর ভালোভাবে গবেষণা হলো না। কেবল রচিত হলো রাশি রাশি সামাজিক অনুশাসন। প্রাচীন আবিষ্কারগুলোর মধ্যে যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাতেও সৃষ্টিকর্তার মহিমাকে যুক্ত করে পুনর্লিখিত হলো। জানানো হলো, প্রাচীন আবিষ্কারগুলো সত্যদ্রষ্টাদের দ্বারা লিখিত অথবা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। অতএব এরপর আর কিছু হতে পারে না এবং যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত। কোথাও কোথাও 'অপৌরুষের' আখ্যাও প্রদান করা হলো। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য অদৃষ্টকে স্বীকার করতে নানা প্রকার ছলাকলারও আশ্রয় গ্রহণ করা হলো। মানুষের বিশ্বাস হলো, পূর্বজন্মের কৃতকার্যের ফলে বর্তমান জন্মে কোনো মানুষ ক্রীতদাস আবার কেউ রাজা। জন্ম জন্মান্তরের সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস এবং সুকৃতির ফলে ইহজন্মে মানুষের কপালে সুখ আসে। কাল্পনিক পরজন্ম এমন লোভনীয় হয়ে উঠলো যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরকাল সর্বস্ব চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে রাজা ও পুরোহিতের সম্পূর্ণরূপে বশবর্তী হয়ে পড়লো। পার্থিব স্থূলবস্তু সম্বন্ধে তথা বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যক্ত হয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হলো আপামর জনসাধারণ।

বিজ্ঞানের চিরন্তন এক বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কার ও কোনোরকম গোঁড়ামি সমাজের বুকে চেপে বসলে, সর্বস্তরের মানুষের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে অসমর্থ হলে এবং দেশের স্থায়ী শান্তি বিরাজ না করলে সে বিদায় গ্রহণ করে। দেশে দেশে গণতন্ত্র যখন বিপন্ন হলো, সম্পদের জন্য হানাহানি শুরু হলো, মানুষের মধ্যে যখন বিভেদ রচিত হলো এবং মানুষ নানা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে উঠলো তখনই হারিয়ে গেল বিজ্ঞান-চর্চার পরিবেশ। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল হাজার হাজার বছরের সাধনায় লব্ধ উন্নত রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, রঞ্জনবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি প্রায় সবকিছুই। কেবলমাত্র টিকে থাকলো ধনীর বিলাসোপকরণ ও অস্ত্র নির্মাণের কৌশলগুলো। অবশ্য দুটিরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

গ্রিক বিজ্ঞানের দুঃসময়

পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী বেষ্টিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত প্রাচীন গ্রিস—যার গৌরবগাঁথা বলে শেষ করা যায় না। সেই গ্রিসের জ্ঞান-বিজ্ঞনেরও একদিন অবণতি হলো। উত্থান ও পতন, মহাকালের নিয়ম। উত্থান হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী।

আগেই বলা হয়েছে, গ্রিক রাজ্যগুলোর উন্নতির মূলে ছিল গণতন্ত্র। ছোট ছোট রাজ্যগুলো সেদিন নগর রাষ্ট্র বা 'পলিস' নামে খ্যাত হয়েছিল। এই পলিস কথাটি থেকে পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি কথাটির উদ্ভব হয়েছে। সেই পলিসগুলোর কোনো রাজা ছিল না। তাই গ্রিকরাই প্রথম জগৎকে দেখিয়েছিলেন রাজাকে বাদ দিয়েও রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। রাজ্যগুলো যেহেতু ছোট ছিল তাই তাদের লোকসংখ্যাও ছিল বেশ কম। বড় বড় রাস্তার মোড়ে অথবা কোনো ফাঁকা জায়গায় প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে সাধারণ মানুষের সভা বসতো। কোনো কোনো জায়গায় আবার চতুর্দিক অনাবৃত এক একটি সভাগৃহও ছিল। সভাগুলোই নির্দেশ করতো রাষ্ট্রনায়কদের এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্ধারণ করতো উক্ত সভাগুলো। এমনকি সেখানে অপরাধীর দণ্ড বিধানও করা হতো। অন্যদিকে কিছু কিছু সভা ছিল, যেখানে আলোচনা করা হতো—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান। তাতে উৎসাহিত হতো সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার থাকার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, সব বিষয়ে ছিল সবার যোগ।

গ্রিকদের মধ্যেও ক্রীতদাস প্রথা ছিল এবং ক্রীতদাসদের রাষ্ট্রে কোনো মৌলিক অধিকারও ছিল না। অবশ্য রাজ্যের নারীদেরও নয়। তবে মানবতার পূজারী গ্রিকরা ক্রীতদাসদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতো না। সাধারণত যুদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস হতো। যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের কাজে নিয়োগ করা হতো। কেউ কেউ পুলিশের কাজও করতো এমন নজিরও আছে। এমনকি ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে যোগদানেও কতগুলো নিয়ম রচিত হয়েছিল। তাই ক্রীতদাসও সেখানে ফেলনা ছিল না। আপন যোগ্যতায় স্বাধীন নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো। অতএব এরকম একটি দেশে সর্বশ্রেণীর মানুষ দেশের উন্নতিতে যে আত্মোৎসর্গ করবে—তাতে আর আশ্চর্য কি?

শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিল গ্রিকরা। অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকায় ক্রীতদাসরও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল অপরাজেয়।

www.pathagar.com

প্রসিদ্ধ গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরণী থেকে জানা যায়, পশ্চিম এশিয়ার দেশজুড়ে পারসিক জাতি সাম্রাজ্য গঠন করলেও গ্রিসকে পদানত করতে পারে নি। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর সাইরাস ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর, এমনকি গ্রিসের উত্তরে ম্যাসিডনিয়া পর্যন্ত জয় করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন গ্রিসে প্রবেশ করতে। এমনকি পারস্যের তৃতীয় সম্রাট প্রথম দারউস গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টা নগরী নিজের অধিকারে আনার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে মারা যান। আরও উল্লেখ করেছেন হেরোডোটাস, দারাউসের পুত্র জার্কসিস পিতার পরাজয়ের গ-ানিকে মুছে দেয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ পারসিক সৈন্যকে নিয়ে গ্রিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং দার্দানেলিস প্রণালীর উপর সারি সারি নৌকা সাজিয়ে সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিল বারশো জাহাজ বোঝাই রসদ ও যুদ্ধোপকরণ। প্রথম প্রথম গ্রিকরা বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও শেষের দিকে গ্রিক নৌবাহিনীর নেতা থেমিস্টকিসের অসাধারণ নৈপুণ্যে রসদ বোঝাই সমস্ত পারসিক জাহাজকে ছিন্নভিন্ন হতে হয়েছিল। পারস্য উপসাগরের কূলে এক শৈলশিখর থেকে জার্কসিস এই নিদারুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে কপালে করাঘাত করতে করতে স্বদেশে পলায়ন করেন।

পারসিকদের সঙ্গে গ্রিকদের বিরোধ প্রায় শতবর্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল। তবুও গ্রিসের কিছুই হয়নি। যুদ্ধ শেষে অতি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন দেশের সুখশান্তি। প্রকৃতপক্ষে তারই আমলে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সে গ্রিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল এবং সেই সময়টা ছিল গ্রিসের গৌরবময় যুগ।

গ্রিসের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ধারাটি অর্থাৎ গৌরবময় যুগটি চলেছিল গ্রিকবীর আলেজান্ডারের আমল পর্যন্ত। কথিত আছে, ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ তথা আলেকোজান্ডারের পিতা গ্রিসকে নিজের অধীনে আনেন। সেই থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় কঠোর রাজতন্ত্র। যে গ্রিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সংযম ও সর্বপ্রকারের আতিশয্য বর্জন—সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নেমে আসে প্রচণ্ড আঘাত। আলেকাজান্ডারের আমলে আবার আরও কঠোর রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তা সত্ত্বেও গ্রিসে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি লুপ্ত হলো না। কিন্তু আলেকজান্ডারের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারলো না। অথচ আদ্রিয়াটিক থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩-এ তার আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সর্বত্র দেখা গেল বিশৃঙ্খলা। গ্রিক সাম্রাজ্যের বুনিয়াদও ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। বিভিন্ন স্থান ভাগ করে নিলেন আলেকজান্ডারের বিভিন্ন সেনানায়করা। মূল গ্রিস ভূখণ্ডে শুরু হলো গৃহযুদ্ধ।

বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধক টলেমি সোতার (ক্লডিয়াস টলেমি নন) ছিলেন আলেকজান্ডারের অন্যতম সেনানায়ক। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ তারই

www.pathagar.com

ভাগ্যে করায়াত্ব ছিল। সেখানে ছিল আলেকজান্ডারের প্রতিষ্ঠিত নতুন নগরী আলেকজান্দ্রিয়া। টলেমির উৎসাহে সেই আলেকজান্দ্রিয়াই হয়ে উঠলো বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। এখানেই গ্রিক বিজ্ঞানের প্রথম ধারার সমাপ্তি ও দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজশক্তির উৎসাহে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রিক বিজ্ঞান পুনরায় তার গতি ফিরে পেল এবং বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানীরাও সমবেত হলেন। এই পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, হিপার্কাস, অ্যারিস্টার্কাস, ক্লডিয়াস টলেমি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। প্রকৃতপক্ষে, সেদিনের আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানচর্চাকে অবলম্বন করেই খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নতুনভাবে জেগে উঠেছে বিজ্ঞান।

আলেকজান্দ্রিয়া শহর মূলত গ্রিকদের বিজ্ঞান চর্চার স্থল বলে পরিচিত হলেও এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। গ্রিকদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ যদিও প্রবল ছিল এবং রাজশক্তিরও উক্ত মনোভাবের প্রতি সমর্থন ছিল, তবুও কালক্রমে আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে মিশরীয় এবং ইহুদীরাও বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে। কারণ দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানচর্চা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। তবে রোমানদের আক্রমণের সময় থেকে এর গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়। তথাপি এখানকার বিরাট পুঁথিশালাটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। কেবল অ্যারিস্টোটলের সংগৃহীত চার লক্ষের মতো পুস্তক সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সেখানে সর্বসাকুল্যে সংরক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ বা আরও বেশি ছিল। এই গ্রন্থাগারটি প্রাচীনকালের পৃথিবীর অন্যতম এক বিস্ময়ও বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর এই অমূল্য সম্পদকে নাস্তিকতার অভিযোগে ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংস করেন বিশপ থিওফিলাস। কিন্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নি।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান চর্চার আর এক বৈশিষ্ট্য এখানেই প্রথম রসায়ন বিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধভাবে চর্চা শুরু হয় এবং নারী বিজ্ঞানীও যোগ দেন। মারিয়া নামে এক ইহুদী মহিলার নাম পাওয়া যায়। তিনি রসায়নের বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। এর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। পৃথিবীর প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসেবেও একে চিহ্নিত করা যায়। মারিয়া রচিত একটি গ্রন্থও পাওয়া গেছে।

আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রথম রসায়ন চর্চা তথা কিমিয়ার প্রসার হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। সে সময়কার আরও দুইজন রসায়নবিদ ডেমোক্রিটাস (দ্বিতীয়) এবং জোসিমোস অনেকগুলো রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানচর্চা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় গ্রিক বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় ধারাটি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এর পর সারা ইউরোপের উপর নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ।

www.pathagar.com

রোমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

(খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রি. পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী)

ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ রোমানদের হাতেই সূচিত হয়েছিল। অনেক আগেই গ্রিক সভ্যতার মূলে ফাটল ধরেছিল। গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিদেশিরা চালিয়েছিল আক্রমণ। রোমানরা তখন পাকা ফল গাছ থেকে পেড়ে খাওয়ার মতো লুফে নিল গ্রিস এবং তাদের দর্শন ও বিজ্ঞানকে। ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে টলেমির সাধনার ফসল গ্রিসের বিজ্ঞানকেন্দ্রটিও রোমানদের অধিকারে চলে গেল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রায় সাতশো বছর পর্যন্ত ইউরোপে রোমানদের প্রাধান্য ও আধিপত্যের যুগ।

রোমান আমলের প্রথম দিকে গ্রিকদের দ্বারা বিজ্ঞানচর্চা কিছুটা অব্যাহত ছিল। তার কারণ, রোমানরা একরকম বর্বর জাতিই ছিল। ওদের না ছিল সাহিত্য, না ছিল দর্শন, না ছিল বিজ্ঞান, না ছিল ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা। গ্রিস জয়ের পর রাজশক্তি নিজেদের দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল গ্রিক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে। এমনকি ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিডনার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর কিছু গ্রিক পণ্ডিত তাদের পুঁথিপত্র সহ রোমে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করলে তাদের সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রিস জয়ের পর গ্রিসের উন্নত সংস্কৃতিকেও তারা জয় করেছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় তাই রোমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিকরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছিল। কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের দিকে রোমানরা কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি। তারা গ্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য ও শিল্পকলায় যেভাবে উন্নতি লাভ করেছিল, তার শতভাগের একভাগও বিজ্ঞানে উন্নতি করেনি। তবে ফলিত বিজ্ঞানে সে আমলেও কিছুটা বৈশিষ্ট্য রেখে গেছে। বিশেষ করে বলবিদ্যায় ও যন্ত্রবিদ্যায় বহু আবিষ্কার আছে রোমান আমলের। অপরদিকে স্থাপত্যবিদ্যায় ও পূর্তবিদ্যায় গ্রিকদেরও অতিক্রম করে গেছে তারা।

রোমানদের চরিত্রই ছিল আলাদা। তারা বিলাসী ও নিষ্ঠুর ছিল। যার কোনো ব্যবহারিক দিক নেই তার দিকে আদৌ লক্ষ্য করতো না। চিন্তাশীলতা তাদের জাতীয় চরিত্রের বহির্ভূত ছিল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসোপকরণ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য

www.pathagar.com

শ্রম ও বুদ্ধি নিয়োগ করতো তারা। নিবিড়ভাবে কোনোকিছুকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করা তাদের প্রকৃতিতে ছিল না। একেবারে ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্পন্ন কাঠখোট্টা মানুষ ছিল রোমানরা। ওই চরিত্রের জন্যই তারা যন্ত্রবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যায় উন্নতি করেছে কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে ও দর্শনে একেবারে অনগ্রসর থেকে গেছে। রোমানরা যেখানে উন্নতি করেছে তার প্রত্যেকটির উৎসস্থল গ্রিকদের বিজ্ঞান। অথচ চিন্তাশীলতা এবং বিশে-ষণ মনোভাব না থাকার জন্য গ্রিক গণিত, জ্যামিতি ও দর্শন সবই অবহেলিত হয়েছে।

রোমান আমলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ

১। **মার্কাস পোর্সিয়াস ক্যাটো** (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪–১৪৯)। ইনি প্রথম কৃষিবিদ্যার পুস্তক রচনা করেন এবং তার পুস্তকে ১২টি উদ্ভিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। **টেরেন্টিয়াস ভারো** (খ্রিস্টপূর্ব ১১৬–২৭) গ্রিকভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকের রচয়িতা। পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের ভারি সুন্দর বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের আমলে ভারোর কৃষিবিদ্যার পুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৩। **ভিট্রুভিয়াস** (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যা বিশারদ। তার বিখ্যাত গ্রন্থ De architecture প্রাচীনকালের পূর্তবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নগর ও বন্দর পরিকল্পনা, মন্দির স্নানাগার, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই আজও বইটির সমাদর রয়েছে।

৪। **স্ট্রাবো** (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) জাতিতে গ্রিক। প্রখ্যাত ভৌগোলিক। এর

রচিত ১৭ খণ্ডে বিভক্ত Geography বইটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ভূগোল গ্রন্থ। বইটিতে দেশ মহাদেশের কেবল ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নেই, ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, ইউরোপীয় জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, পৃথিবীর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি-সমভূমি প্রভৃতির বিশেষ বর্ণনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

৫। **ক্লডিয়াস টলেমি** (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)। ইনি ভূকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন। সেটি আধুনিককালে পরিত্যক্ত হলেও দীর্ঘদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছিল।

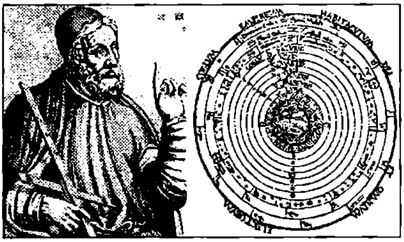

www.pathagar.com

৬। **প্লিনি** (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) পুরো নাম প্লিনিয়াস সিকান্দার। ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত

পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা। ১৬ খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা। গ্রন্থটি সর্বকালের এক অমূল্য সম্পদ। ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগে প্লিনির বিশ্বকোষ অনেক তথ্য সরবরাহ করেছিল। ফলে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। প্লিনির জন্ম ২৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাই তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ৭৯ খ্রিস্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যক্ষ করতে গেলে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৭। **পেডনিওস ডিওস্কোরিডিস** (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে প্রথমে ইনিই গবেষণা করেছিলেন। তার তালিকায় প্রায় ৬০০ উদ্ভিদ স্থান লাভ করেছিল। মূল, কাণ্ড ও পাতার গঠন বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্ণনা প্রথম তিনিই প্রদান করেন।

৮। **সেলসাস** (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) প্রখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে মানবজাতির বিরাট উপকার সাধন করেছিলেন।

৯। **গ্যালেন** (খ্রি. ১৩০ থেকে খ্রি. ২০০) পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা

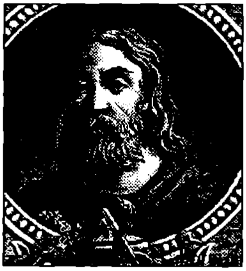

বিজ্ঞানীদের অন্যতম। এরই গবেষণায় শারীরবৃত্ত ও শারীরস্থান নামক দুটি শাখা পরিপূর্ণতা লাভ করে। গ্যালেনের সময় শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। নাহলে তিনি আরও বহু তথ্য প্রদান করতে পারতেন। সে যুগে হিপোক্রেটিসের পর এত বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর জন্মগ্রহণ করেননি।

১০। **ডায়োফ্যান্টাস** (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) রোমান আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। অনেকের মতে তিনিই আলেকজান্দ্রিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর। এর রচিত Arithmetica গ্রন্থটি চিরদিন সুধীমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে আসছে।

১১। **হাইপেসিয়া** (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) প্রখ্যাত রোম গণিতজ্ঞ থিওনের কন্যা। রোমান আমলের সর্বশেষ গণিতের গবেষক। বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা বিজ্ঞানী নামেও অভিহিত করা যায়। ইনি জাতিতে ছিলেন গ্রিক এবং অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। তার লেখা গণিতের সমালোচনা গ্রন্থটি মূল্যবান সম্পদ। ইনি অসামান্য সুন্দরীও ছিলেন। এই রূপ ও গুণ তার কাল হয়েছিল। খ্রিস্টান পাদরীরা তাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। বিধর্মী ও পৌত্তলিক আখ্যায়

www.pathagar.com

ভূষিত করে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর তারই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে আলেকজান্দ্রিয়ার গৌরব।

উপরোক্ত আলোচনা ও বিজ্ঞানীদের বিবরণী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সাতশো বছরের রোমানদের ইতিহাসে বিজ্ঞানে যা জমা পড়েছে তা গ্রিকদের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু রোমানদের পতনের পর ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এও সত্য যে, রোমান আমলের প্রথমভাগেই বিজ্ঞান ও সভ্যতার মণিমুক্তাগুলো সমৃদ্ধ হয়েছিল ওই গ্রিকদের দ্বারাই। রোমানরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। কারণ হিসেবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ওরা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক দিকটা বড় করে দেখতো। প্রকৃতিতে ছিল অতি নিষ্ঠুর। দস্যুবৃত্তি ও অবাধ লুণ্ঠন ছিল পেশা। এমনকি সম্পদের জন্য নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করতো। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং ধন-সম্পদ জমা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে। ধনীদের তখন নামকরণ হয় প্যাটরিসিয়ান এবং সর্বহারাদের প্রলেতারিয়েত।

ধনীদের তথা প্যাটরিসিয়ানদের অত্যাচারে ও শোষণে দেশে ভূমিদাসের উদ্ভব হয়েছিল এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চললো। অত্যাচার ও জুলুম নির্যাতনে জর্জরিত হল ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। শিক্ষা-দীক্ষা গেল রসাতলে। একজন মানুষের সেবায় নিযুক্ত হল হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সেই বিশেষ মানুষটিও বিলাসব্যসনে মত্ত থেকে তুচ্ছ করলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে।

শেষের দিকে অত্যাচারে জর্জরিত ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা জীবনকে তুচ্ছ করে মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। এদিকে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মালিকদের মধ্যেও লেগে গেল সংঘাত। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশাল রোমসাম্রাজ্য ভেঙে পড়লো। আর তখনই শুরু হয়ে গেল বিদেশিদের আক্রমণ। যেহেতু দেশরক্ষার ভার ছিল ঐ ক্রীতদাসদের উপর। তারা যুদ্ধ না করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদেশিদের আগমনকে পরিচ্ছন্ন করে দিল। সুযোগ পেয়ে ইউরোপের অন্যান্য জায়গা থেকেও ছুটে এল বিভিন্ন জাতি। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রোমসাম্রাজ্য।

সাতশো বছরের রোমানদের ইতিহাস—যা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ ও শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস। তাতে প্রাচীন সৃষ্টিগুলো যেমন অবহেলিত হয়েছিল তেমনই নতুন নতুন সৃষ্টি ও আবিষ্কার বিঘ্নিত হয়েছিল। রোমানদের অবহেলার ফলেই গ্রিকদের মহামূল্য অবদান এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞানের পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কেবল কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে টিকে থাকে কয়েকটি পুস্তক ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কৃত কতগুলো যন্ত্রপাতি।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় প্রাচ্যের ভূমিকা

(খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী)

প্রাচ্যে বিজ্ঞানচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হলে তথা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায়, সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় এবং নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে জাতি আবদ্ধ হওয়ায় বিজ্ঞানচর্চা হারিয়ে গিয়েছিল প্রাচ্য থেকে। বিজ্ঞান ধাবিত হয়েছিল মানবতায় বিশ্বাসী এবং সর্বসংস্কারমুক্ত পাশ্চাতের গ্রিকদের হাতে। হাজার বছরের অধিককাল বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের হাতের মুঠোয় ছিল। কিন্তু রোমানদের অত্যাচারে দেশে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলে বিজ্ঞান আবার ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো প্রাচ্যের দিকে। তার কল্যাণস্পর্শে পুনর্জাগরিত হল ভারতবর্ষ এবং যে চীনে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়েছিল সে চীনও জেগে উঠলো। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের যখন অন্ধকারযুগ, সেই যুগে মাত্র দুটি দেশই বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করেছিল।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় চীন

চীন সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। চীনাদের সৌভাগ্য, অপরাপর প্রাচীন জাতির মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয় নি। চীনের ভৌগোলিক অবস্থান সে জন্য সহায়ক ছিল।

গ্রিসের মতো চীনে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। খ্রিস্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগেই যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার জের চলছিল তখনও। কিন্তু গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, চীনে রাজতন্ত্র থাকলেও প্রায় প্রতিটি রাজবংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অত্যাচারী তারা ছিলেন না বা তাদের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়নি। মোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করেন, চীনের ইতিহাস—উন্নতির ইতিহাস।

এক থেকে দুশো বছরের ব্যবধানে গ্রিস লাভ করেছিল সক্রেটিসকে, ভারতবর্ষ লাভ করেছিল গৌতম বুদ্ধকে এবং চীন লাভ করেছিল কনফুশিয়াসকে। ফলে পৃথিবীর সেরা চিন্তানায়কগণ তিনটি দেশে আবির্ভূত হওয়ায় তিন দেশেরই ধর্ম ও বিজ্ঞান—উভয়ক্ষেত্রেই জোয়ার এসেছিল। যেহেতু এরা ছিলেন মানবদরদী এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিভেদ অপসারণ করেছিলেন, তাই মানবতার ক্ষেত্রে এরা

www.pathagar.com

নবযুগের সূচনা করেছিল। ধর্মের গোঁড়ামিকে অপসারিত করায় দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

সততা-অহিংসা-প্রেম-ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক। কেননা পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে ঈসা (আ.) ও হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর বাণীকে যখনই যারা অনুসরণ করেছে তখনই তাদের জড়তা দূরীভূত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ করেছে। আর যখনই বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কদাচার মানব সমাজের বুকে মাথা চাড়া দিয়েছে তখনই বিজ্ঞান তাদেরকে ছেড়ে গেছে। বিজ্ঞান পুরানো আবাসস্থল পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে।

কনফুশিয়াস

চীনে কনফুশিয়াস, লাওৎসে প্রমুখ মনীষী যে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছিলেন এবং যে অহিংসামন্ত্রে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারই প্রভাবে পরবর্তীকালে সূচিত হয়েছে মহাপ্লাবন। তার প্রভাব আজও চলছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬-এ হান রাজবংশের সূচনা থেকে দেশের শিক্ষাদীক্ষা, পথঘাট, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। হান রাজবংশের পতনের পর বাইরের যাযাবর জাতিদের আক্রমণে চীন নানান সমস্যায় জড়িয়ে যায়। সাড়ে তিনশো বছর ছিল তাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তির ইতিহাস। এই সময়টা হচ্ছে চীনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের যুগ। অতঃপর দেশে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে ওই দ্বিতীয় যুগটাই চীনের বিজ্ঞানের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। এবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলার সময়।

আগে থেকে চীনে লেখার প্রচলন আবিষ্কার হয়েছিল। পণ্ডিতরা গাছের পাতায়, মাটির ফলকে এবং কচ্ছপের খোলে লিখতেন। ১০৫ খ্রিস্টাব্দে লিখে রাখার সুষ্ঠু মাধম খুঁজতে গিয়ে সাইলুন নামে এক ব্যক্তি আবিষ্কার করলেন কাগজকে। প্রকৃতপক্ষে কাগজ আবিষ্কার করেই চীনারা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তরের সূচনা করেছে। কেননা এমন একদিন ছিল, যেদিন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ কাগজের জন্য চীনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং চীনাদের আবিষ্কারের জন্যই মানুষ তার মনোভাবকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হলো।

সাইলুন : কাগজ আবিষ্কারক

www.pathagar.com

প্রযুক্তি বিদ্যায় চীনের সমসাময়িক সে আমলে পৃথিবীর কোনো দেশ ছিল না বলা চলে। ওরাই প্রথম লোহা ঢালাই করতে শেখে এবং চুম্বকের গুণাবলী নির্ণয় করে। ৬২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তারা পোরাসিলেন আবিষ্কার করায় ব্যবসার পথও সুগম হয়েছিল। বহু বিদেশি ছুটে আসতো পোরাসিলেনের জিনিস কেনার জন্য। এ সময় তারা হস্তচালিত একচাকার গাড়ি এবং যন্ত্রচালিত নৌকার আবিষ্কারও করেছিল।

বারুদ তৈরির পদ্ধতিও চীনাদের আবিষ্কার। তাই ওরাই আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। তারা বারুদ পুরে হাউই তৈরি করতো এবং সেই হাউইকে যুদ্ধে ব্যবহার করতো ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে। এমনও শোনা যায়, হাউইর সাহায্যে তারা আকাশে ওড়ার পরিকল্পনাও করেছিল।

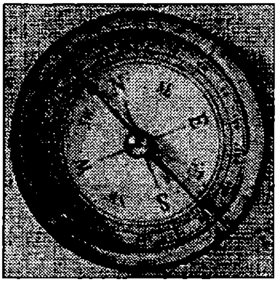
দিকদর্শন যন্ত্র : কম্পাস

চীনারা প্রথমে চুম্বকের গুণগুলো আবিষ্কার করেছিল বলে ওরাই প্রথম তৈরি করেছিল দিকদর্শন যন্ত্র। একাদশ শতাব্দীর দিকে তারা যন্ত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতো। পরে ওদের কাছ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাবিকেরা দিকদর্শন যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করে।

৫৯০ থেকে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনে সুই ও তাং নামক দুটি রাজবংশ রাজত্ব করে। এই দুই রাজবংশের আমলে চীনে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে প্রসারিত হয়েছিল। আবার তাং যুগের সম্রাট তাই সুংয়ের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। ঐ সময় চীনাদের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ায় ভারবর্ষের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। স্বদেশের বিজ্ঞান, সেই সঙ্গে ভারবর্ষীয় গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চীন লাভ করে পর্যটকদের মাধ্যমে। ফলে নতুনভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের কাজ শুরু হয়। তবে বিজ্ঞানের কোনো নতুন তথ্য এ সময় তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। সাহিত্যেই রেখেছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর। বিশ্বকবির সম্মানে ভূষিত চীনের তিন মহাকবি লী-পো, তু-ফ, প্যো-চুই ঐ সময়ই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাং রাজবংশের শেষের দিকে চীনে মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কিন্তু আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যায় না। সে সময় চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল এবং বড় বড় হস্তচালিত কারখানাও স্থাপিত হয়েছিল।

তাং রাজত্বের পরে চীনে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ে। এমনকি সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পেও সূচিত হয় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। পরবর্তী সুং রাজাদের রাজত্বের সময় শেষ রাত্রির প্রদীপের তেলের মতো বিজ্ঞানচর্চাটা যে অল্পস্বল্প বিদ্যমান ছিল তাও

www.pathagar.com

দুর্ধর্ষ তাতারদের আক্রমণে একরকম লুপ্ত হয়ে যায়। অবশেষে চেঙ্গিস খানের আক্রমণ চীনের বুকে আঘাত করলো প্রচণ্ডভাবে।

চেঙ্গিস খান

জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিপথটা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশ্য মঙ্গোল সেনাপতি কুবলাই খান চীনে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর চেষ্টা করেছিলেন চীনের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সে সময় চীনাদের জড়তা কাটতে কাটতেই কুবলাই খানের আমল শেষ হয়ে যায়। মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চার যে ধারাটি চীনে শুরু হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তারপর প্রায় পাঁচশ বছর শীতনিদ্রার মতো আচ্ছন্ন থেকেছে চীন। পরবর্তীতে চীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় জেগে উঠেছে। আর এই বিংশ শতাব্দীতে তারা সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় এক ধাপ এগিয়ে।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সাধনা

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল আর্য ঋষিদের হাতে। আর্যরা সঙ্গে করে এনেছিলো এক উন্নত বিজ্ঞান। কিন্তু লেখার পক্ষপাতী না থাকায় এবং ধর্মীয় আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় পরবর্তীকালে বিজ্ঞানে ভালোভাবে গবেষণা হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দীতে অনুশীলনের কাজ শুরু হয় এবং প্রাচীন আর্য-ঋষিরা বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সব মৌলিক

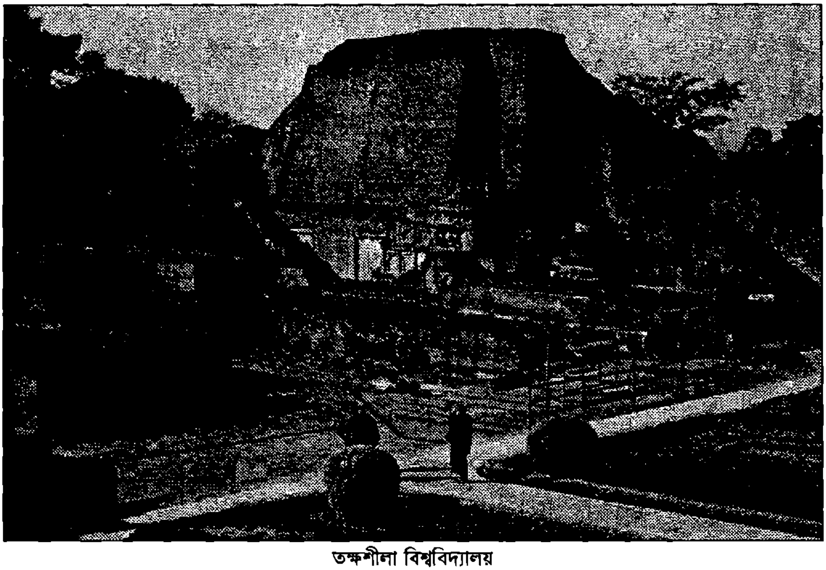
তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

তথ্য আহরণ করেছিলো সেগুলো সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলে। এই কাজে তৎকালীন গান্ধার দেশে তক্ষশিলা নামক বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখ করার মতো। দেশের বড় বড় পণ্ডিতরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে রচনা করেছিলেন বহু মূল্যবান গ্রন্থ। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান এবং ধাতু বিদ্যাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল এ সময়ের গ্রন্থগুলোতে। তক্ষশিলার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। সেখানকার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পানিনি, চাণক্য, জীবক প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। অনেকের মতে সুশ্রুত এবং পতঞ্জলিও সেখানকার ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে বিরাট বিপ্লব এসেছিল তার পুরোধা ছিলেন সুশ্রুত ও জীবক। আর উন্নত ধাতুবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যাকে সবসময় উপস্থাপন করেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি এবং প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ লৌহশিল্পে উন্নতি লাভ করে। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় অস্ত্রশস্ত্র গ্রিকদের চেয়েও উন্নত ছিল। প্রমাণস্বরূপ মহাবীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কয়েক ধরনের অস্ত্র। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানও গ্রিস অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। কেননা ঐ আলেকজান্ডারই নিজ সৈন্যদলে নিয়োগ করেছিলেন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদের।

রোমান আমলেও ভারতে প্রস্তুত ওষুধ ও লৌহদ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট ছিল। সেই কারণেই রোম ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে সময় রোমের বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী 'প্লিনি' দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে ভেষজ 'বি-লাসী নরনারী' প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহ করতে কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ভারতে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ, চন্দনকাঠ, নীলরঙ, হাতির দাঁত, কাপড় ও বাঘ রোমে রপ্তানি হতো। এমনও কথিত আছে, ভারতবর্ষীয় রেশম, জরিদার বস্ত্র ও মসলিন না হলে রোমের অভিজাত নরনারীর বেশ বিন্যাস সম্পূর্ণ হতো না। রোমানরা পার্থিয়া জয় করেছিল একমাত্র ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ মুক্ত রাখার জন্যই। এ সময়ের উন্নত লৌহ নিষ্কাশন প্রণালী ও রসায়নবিদ্যা চাণক্য ও পতঞ্জলির লেখা থেকে পাওয়া যায়। পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সে যুগের দুটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

মৌর্য বংশের পতনের পর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বহু বিদেশি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় গ্রিক শাসন চলে। তারপর আক্রমণ করে পারদ, শক, ইউ-চি প্রভৃতি যাযাবর জাতি। এই সময়টা ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবক্ষয়ের যুগ। অবশেষে ইউ-চি জাতির একটি শাখা কুষাণরা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের আমলে পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের

www.pathagar.com

বিজ্ঞানচর্চা কণিষ্কের আমলে শুরু হয়েছিল। এই যুগটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়।

নাগার্জুন

কণিষ্কের সময় দু'জন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। একজন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি চরক এবং অপরজন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ নাগার্জুন।

মহর্ষি চরক একটি আয়ুর্বেদ সংহিতা রচনা করেছিলেন। ঐ সংহিতা গ্রন্থটি চরক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। চিকিৎসা বিষয়ক এমন গ্রন্থ সেকালে পৃথিবীর কোনো দেশেই রচিত হয়নি। অসুখের বিবরণ ও চিকিৎসাবিধি যেভাবে চরক সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে তা দেখলে আজকের উন্নত চিকিৎসাবিদদেরও অবাক হতে হয়। প্রচুর ভেষজের গুণাগুণও বর্ণিত হয়েছে উক্ত সংহিতায়। তাই মধ্যযুগে চরক সংহিতাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। আজও পৃথিবীর যেখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে অনুসরণ করা হয় সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয় চরক সংহিতাকে। অবশ্য সুশ্রুত সংহিতাও পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে সুশ্রুত সংহিতা ছিল মূলত শল্য চিকিৎসার পুস্তক। রসায়ন-বিজ্ঞানী নাগার্জুন সে যুগের আর একটি বড় বিস্ময়। তিনি একাধারে ছিলেন রসায়নবিদ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে রসায়ন-বিজ্ঞানে গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে নাগার্জুনের হাতেই। তিনি পারদ, গন্ধক ঘটিত কতগুলো যৌগের আবিষ্কর্তা। পারদ সম্বন্ধে এমন মূল্যবান গবেষণা নাগার্জুনের পূর্বে পৃথিবীর কোনো দেশে হয় নি।

পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের আমলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান আরও উন্নতি লাভ করে। এই সময় আবির্ভূত হন আর্যভট্ট ও বরাহমিহির। দুজনেই ছিলেন অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ ও জ্যোতির্বিদ। আর্যভট্ট রচিত আর্যভট্টীয় ও বরাহমিহির রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা সে যুগের দুটি অমূল্য বিজ্ঞানশাস্ত্র। এগুলোও বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এদের উভয়কে সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে মনে করা হয়।

গুপ্ত যুগে ধাতু শিল্প ছিল অতি উৎকৃষ্ট। দিল্লিতে সে সময় প্রস্তুত চন্দ্ররাজের (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের) যে লৌহস্তম্ভটি আছে তাতে এখনও মরিচা পড়েনি। তাছাড়া বীজগণিত, পাটীগণিত, কৃষিবিদ্যা ও আবহবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণাও সে সময় হয়েছিল। মনে হয় সে সময় ভারতবর্ষ সিমেন্ট জাতীয় এক ধরনের পদার্থ আবিষ্কার করেছিল।

গবেষকদের মতে, গুপ্তযুগই ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সুবর্ণ যুগ। এই সময় কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। আর নাগরিকের জীবনে সমৃদ্ধি, উদার ধর্মমত, পরমত সহিষ্ণুতা ও সৌন্দর্যবোধ সারা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল।

www.pathagar.com

তাই এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমের বিশাল রোম সাম্রাজ্য থেকে পূর্বে শ্যাম কম্বোজ পর্যন্ত।

গুপ্ত রাজবংশের পতনের (৫০০ খ্রিস্টাব্দে) পরও ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এগিয়ে চলেছিল। বিশেষত হর্ষবর্ধনের আমলে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরে পালযুগে বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী নামক আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও নালন্দার গৌরব অল্প হ্রাস পাওয়ায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তবুও দেশ-বিদেশ থেকে তখনও নালন্দায় পড়াশোনা করার জন্য বহু ছাত্রের আগমন হতো। মোটকথা, সমসাময়িক সময়ে এত বড় এবং এত বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অপর কোনো দেশে ছিল না।

চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিং

উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শন প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় থাকলেও বিজ্ঞান অবহেলিত হয়নি। ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র সবকিছুই শিক্ষা দেয়া হতো। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিংয়ের বিবরণী থেকে জানা যায়, সে সময় নালন্দায় ভেষজ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন আচার্য বাগভট। এই বাগভটের লেখা আয়ুর্বেদশাস্ত্র জনপ্রিয়তায় চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার প্রায় সমকক্ষ হয়েছিল।

গণিতে সে সময় ভারতবর্ষের সমকক্ষ কোনো দেশ ছিল না। আর্যভটের পরে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্য গণিতের নানা শাখা উদ্ভাবন করেছিলেন। বিশেষত ভাস্কারাচার্য মধ্যযুগের ভারতবর্ষের একটি বড় বিস্ময়। নিউটনের পাঁচশ বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন এবং চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি কলমবিদ্যা বা ক্যালকুলাসের প্রয়োগ করেছিলেন। এই মহাপ্রতিভাধর ভাস্কারাচার্যই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের শেষ অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

পতঞ্জলি (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক) :

পতঞ্জলি

লৌহ শাস্ত্রকার ও রসায়ন বিজ্ঞানী। পতঞ্জলি রচিত গ্রন্থের নাম 'লৌহশাস্ত্র'। লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণ পদ্ধতি তিনিই প্রথম বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর অপর কোনো প্রাচীন গ্রন্থে ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ নেই।

প্রথম আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) :

আর্যভট্ট

প্রসিদ্ধ অঙ্কবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কোপারনিকাস, গ্যালিলিওর হাজার বছরেরও অধিককাল পূর্বে ইনি পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিশুদ্ধ গণিতেও আর্যভট্টের অবদান আছে।

বৌদ্ধ চরক (খ্রিস্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী) :

রচিত পুস্তক 'চরক সংহিতা'। কতগুলো উদ্ভিদের ভেষজ গুণের বর্ণনা এবং সুসংবদ্ধভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা তিনিই করেছিলেন। তাই 'চরক সংহিতা' পৃথিবীর সকল দেশ অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। উইলিয়াম হার্ভের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন চরক।

ব্রহ্মগুপ্ত

ব্রহ্মগুপ্ত (আবির্ভাবকাল-আনুমানিক ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে) :

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। এর রচিত ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ও চরক সংহিতার মতো নানা দেশে সমাদৃত হয়েছিল। ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্রহ্মগুপ্তই আবিষ্কার করেছেন।

www.pathagar.com

বরাহমিহির (জন্ম-আনুমানিক ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে) :

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আবহতত্ত্ববিদ। বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা প্রস্তুত তাঁর অক্ষয় কীর্তি। আজও ভারতবর্ষের পঞ্জিকা বরাহমিহিরের নীতিকেই অনুসরণ করে।

নাগার্জুন (খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দ) :

নাগার্জুন

প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ধাতু, ধাতুভস্ম ও পারদ-গন্ধক ঘটিত কঞ্জলি ব্যবহার করেন। ভারতে রসায়ন চর্চারও পথিকৃত তিনি।

শ্রীধরাচার্য (আবির্ভাবকাল-আনুমানিক দশম শতাব্দীর শেষভাগ) :

শ্রীধরাচার্য

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্রের আবিষ্কর্তা। বীজগণিতের সেই নিয়মটি আজও শ্রীধরাচার্যের প্রণালী নামে বিখ্যাত। শ্রীধরাচার্যই প্রথম পাটিগণিত থেকে বীজগণিতকে পৃথক করেন।

ভাস্করাচার্য (জন্ম-আনুমানিক ১১১৪ খ্রিস্টাব্দ) :

অভিকর্ষের নিয়ম আবিষ্কারক। ক্যালকুলাসের আবিষ্কর্তা। ভাস্করাচার্যের মতো প্রতিভাধর বিজ্ঞানী খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অবনতির কারণ

আর্যদের বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অভ্যুত্থান এককালে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ভেসে যায় দেশ। নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, নতুন উদ্দীপনায় পুনরায় শুরু হয় বিজ্ঞানচর্চা। কালক্রমে এই ধর্মেও এসে যায় গোঁড়ামি এবং সংস্কার। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মও বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে একদল টীকাকারের উদ্ভব হয়। তারা কেবলমাত্র বেদ, বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতির মূল্যায়ণ করতে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের ধারেকাছে গেলেন না। পরাশর, ব্যাস, বিশিষ্ট গৌতম প্রভৃতি

www.pathagar.com

ঋষিগণ মানুষের মন ও শরীর উভয়ের দোষকে দূরীভূত করার জন্য ধর্মচিন্তা এবং বিজ্ঞান চিন্তা দুই চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মনকে গ-ানিমুক্ত করার জন্য রচনা করেছিলেন ধর্মপুস্তক, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য রচনা করেছিলেন আয়ুর্বেদ পুস্তক, ধর্মানুষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ে পালন করার জন্য রচনা করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান। মোটকথা, জ্ঞানের সব শাখাতেই তারা করেছিলেন বিচরণ। তারা মনে করতেন, সব বিষয়ে শিক্ষালাভ না করলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির বিকাশ হলে পণ্ডিতরা আসল নীতি থেকেই দূরে থাকলেন। প্রাচীন ঋষিদের নাম ভাঙিয়ে গেলেন আর সম্ভব-অসম্ভব কাহিনীর জাল বিস্তার করে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। ধর্মের চেয়ে সংস্কার বড় হলো। আর্য ঋষিদের মূল বক্তব্য হলো বিকৃত। যে অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী ও একেশ্বরবাদ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ছিল মর্মবাণী, কালক্রমে তাদের সেই বাণী নিয়োজিত হলো স্বার্থে, বিভেদ সৃষ্টি করলো মানুষে মানুষে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। তাই বিজ্ঞান পুণরায় পথ খুঁজে নিল। মানুষে মানুষে জাতিগত ও পেশাগত বিভেদ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনাশের মূল কারণ। যখনই যে জাতি দেশপ্রেম, অহিংসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর রচনা করেছে তখনই সে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

আরব জাতির বিজ্ঞানচর্চা

একসময় আরবও ছিল পণ্ডিত ও গবেষকদের দেশ। কিন্তু মানব সভ্যতা কিছুটা পাহাড়ী নদীর মতো। যখন তার যাত্রা শুরু হয় তখন সে থাকে উদ্দাম। সবরকমের বাঁধাকে তুচ্ছ করে শুধু এগিয়ে যায়! আর যখন সে সমতলভূমিতে অবতরণ করে তখন অতি ক্ষুদ্র বাঁধাও তার গতিপথকে ব্যাহত করে। চলার পথও অনেকে হারিয়ে ফেলে। যত রকমের জঞ্জাল এসে জড় হয় গতিমুখে। তখন কোনো নদীর সরাসরি আর সাগরে যাওয়া হয় না। কেউ হারিয়ে যায় আবার কেউবা বহু বক্রপথ অতিক্রম করে অবশেষে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়।

একদিন আরব জাতির পণ্ডিত ও গবেষকদের হয়েছিল এই একই অবস্থা। দীর্ঘদিন পর তাদের মধ্যেও জমেছিল জঞ্জাল। চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল তার অর্জিত স্রোতধারাকে। ঠিক সেই দুঃসময়ে বিরাট এক প্লাবনকে বহন করে আনলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)। এতদিন ধরে যে ময়লা জমেছিল, কয়েক বছরের মধ্যে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আরব খুঁজে পেল তার পথ।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের পর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর বাণী সঞ্জীবণী মন্ত্রের মতো আরবের সমস্ত জড়তাকে বিনাশ করলো। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো আরববাসী। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাদের পূর্বপুরুষদের ছবি। খ্রিস্টজন্মের বহু আগে তাদের দেশের বণিকরাও বাণিজ্যের জন্য গমন করতো সুদূর মিশর ও ভারতবর্ষে। সে সব জায়গা থেকে বয়ে এনেছিল বিজ্ঞান ও দর্শনকে। সুষ্ঠু লেখার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন এ দেশের পণ্ডিতবর্গ।

মহানবী হযরত মোহম্মদ (স.)-এর মহামন্ত্র জপ করতে করতে আরব ব্রতী হলো জ্ঞান সাধনায়। বুঝতে পারল নিজের দৈন্য। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়লো উন্নত গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে। এ বিষয়ে আরবের কয়েকটি উপজাতির দানই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কথিত আছে, সীমান্তবর্তী আরব উপজাতীয়রা বাইজান্টাইন রাজ্যের সেনাবাহি-নীতে যোগদান করেছিল। 'উমাইয়া' নামক আরবের এক উপজাতির কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছিল সিরিয়ার সরকারি কাজকর্মে এবং আরও কিছুসংখ্যক লোক যোগ দিয়েছিল রোমের সেনাবাহিনীতে। ওদের সঙ্গেই প্রথম গ্রিক সভ্যতা ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতির পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে যারা পণ্ডিত ছিলেন তারা গ্রিক ভাষা শিখে গ্রিক বিজ্ঞানকে নিজের দেশে প্রচার করেন এবং কিছু কিছু বইও আরবে এনে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তাদের দেখাদেখি আরও বহু পণ্ডিত গ্রিসে গমন করেন সেখানকার দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের প্রায় ত্রিশ বছর পর একটা বড় সুযোগ এসে গেল আরবীয়দের। শিক্ষানুরাগী উমাইয়ারা সিরিয়া অধিকার করে সেখানে মুসলিম শাসনব্যবস্থা কায়েম করলেন। রাজধানী স্থাপন করলেন দামাস্কাসে। জাতিকে গঠন করার জন্য রাজধানী দামাস্কাসে গড়ে তুললেন একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেদিন তারা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি না হলে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয় না এবং জাতির মেরুদণ্ডও শক্ত হয় না। তাই দেশের যেখানে ছিলেন যত জ্ঞানী-গুণী তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করা হলো দামাস্কাসে। দেখতে দেখতে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দামাস্কাস জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটা বড় কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালো।

দামাস্কাসের এই গৌরব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসিয়রা দামাস্কাস অধিকার করলেন এবং শাসন কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করলেন বাগদাদে। দামাস্কাসের গৌরব সূর্য অস্তমিত হল বটে। তবে আব্বাসিয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করলেন না। দামাস্কাসের চেয়েও বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলেন বাগদাদে এবং দামাস্কাস থেকে সমস্ত পণ্ডিতকে ধরে এনে বসালেন বাগদাদের বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে।

বাগদাদের দ্বিতীয় খলিফা আল মনসুরের রাজত্বকালে বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রটি আরও উন্নতি লাভ করে। আল মনসুরের প্রচেষ্টায় এবার বিদেশ থেকেও বহু পণ্ডিতকে আনা হয় এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আল মনসুরের চেষ্টায়ই আরবে প্রথম বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়।

আরব্য উপন্যাসে যার নাম অমর হয়ে আছে, সেই 'হারুন আল রশিদ' ছিলেন বাগদাদের আব্বাসিয় বংশের তৃতীয় খলিফা। তার রাজত্বকালকেই পণ্ডিতরা আরবের সুবর্ণ যুগ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ২৪ বছর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যা আরবকে দিয়ে গেছেন তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মভীরু ও প্রজা বৎসল এই মহান সম্রাট বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করার জন্য প্রথমে প্রাচীন গ্রিক ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলোকে সংগ্রহ করেন। পরে দেশীয় ভাষায় সেগুলোকে অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করেন বহু সংখ্যক পণ্ডিত। পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন মংখ নামের জনৈক ভারতবর্ষীয়

www.pathagar.com

চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি 'চরক সংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা'কে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

হারুণ আল রশিদের পরবর্তী খলিফা অর্থাৎ বাগদাদের চতুর্থ খলিফা আল মামুনও বিদ্যান ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার সময়েও অনুবাদ হয়েছিল বহু গ্রিক ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিয়োগ করেছিলেন 'হনয়ান ইবন ইশাক' নামের জনৈক পণ্ডিতকে। ইশাক প্রসিদ্ধ গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী গেলেনের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকগুলো এবং টলেমীর কয়েকটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হন। তার পুত্র ইশাক ও ভায়ের ছেলে হুবায়াস অনুবাদ করেছিলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং হিপোক্রেটিসের লেখা একাধিক চিকিৎসাশাস্ত্র। আল মামুনের সময়ই আরবের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আল খিরমিজির ভারতবর্ষীয় অঙ্কশাস্ত্রগুলোকে অনুবাদ করে গণিতে গবেষণার পথকে সুগম করেন।

আল মামুন বিদেশি গ্রন্থগুলোকে কেবলমাত্র অনুবাদ করিয়ে থেমে থাকেন নি, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার পথকেও উন্নত ও প্রশস্ত করেন। বাগদাদে স্থাপন করেছিলেন আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। আল ফায়খানি নামে জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানী উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। তিনি একজন বড় গণিতজ্ঞও ছিলেন। কথিত আছে, তারই উৎসাহে আল খিরমিজির রচনা করেছিলেন 'অল জেবর ওয়াল মোকাবালা' নামক বীজগণিতের গ্রন্থটি। 'আলজেবরা' বা 'বীজগণিত'–এই নামটি এসেছে তারই গ্রন্থটির নাম থেকে।

উপরোক্ত তথ্যগুলো প্রমাণ করে, আরবের বিজ্ঞানচর্চার জোয়ার আসে অনুবাদের মাধ্যমে। তবে এ কথাও সত্য যে, যারাই অনুবাদক ছিলেন তারাই স্ব-স্ব বিষয়ে এক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাই তারা কেবলমাত্র অনুবাদের মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নি, গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সেই হিসেবে এদের অনুবাদক বললে, এদের প্রতিভার প্রতি অসম্মানই প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া জাতীয় জাগরণের দিনে অনুবাদের মাধ্যম গ্রহণ ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। বিদেশি জ্ঞান ভাণ্ডারকে দেশের সবার সামনে উন্মুক্ত করার ঐ একটি মাত্রই উপায়। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তাই দেখা যায় ইউরোপের রেনেসাঁস এসেছিল অনুবাদের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের দেশগুলোও পুনর্জাগরিত হয়েছিল বিদেশি গ্রন্থগুলোকে অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে।

সেকালে আরবে একদল দার্শনিকেরও আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের দর্শনেও স্থান পেয়েছিল বিজ্ঞান। গ্রিক দার্শনিকদের মতো এরাও পার্থিব বস্তু, পরমাণু বিশ্বজগৎ প্রভৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যারা গবেষণা করেছিলেন, তাদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল

www.pathagar.com

ফারখানি, আল বাতানী ও সাবিত ইবন কুরা, গণিতজ্ঞ আল খিরমিজী এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিন্‌হা ও আলরাজির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলরাজিকে তার সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে সম্মান দান করা হয়েছে।

ইবনে সিনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আরবে বিজ্ঞান চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বিজ্ঞানচর্চা একরকম বন্ধ হয়ে যায়।

গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র নয় কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রেও আরবরা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কথিত আছে, সম্রাট হারুন আল রশিদ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মধ্যযুগে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রের অবিস্মরণীয় রাজা শার্লমানকে যেসব উপহার পাঠিয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে একটি যন্ত্রচালিত ঘড়ি ছিল।

www.pathagar.com

অন্ধকার যুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

(খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী)

এ সময় গ্রিসে রোমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রিক সভ্যতার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটেনি। একটু একটু জ্বলছিল কিন্তু আলোর প্রকাশ পাচ্ছিল না। তারপর গথ, হুন, ভ্যান্ডাল, জার্মান প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যেরও একদিন পতন হলো। সেই থেকে শুরু হলো একটানা যুদ্ধ-বিগ্রহ। বিঘ্নিত হলো দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে গেল।

অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর মাঝে এসে স্পেন ও ভূমধ্য সাগরের উপকূলভাগে মুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একরকম কোণঠাসা হয়ে পড়লো সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ড। বলাবাহুল্য সে সময় ইউরোপের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। রাজ্যময় অরাজকতা, যখন-তখন বৈদেশিক আক্রমণ। ইউরোপের ইতিহাসে সে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিন।

দুর্যোগের দিনে ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন ধর্মযাজকরা। তারা দেশের মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন ঈশ্বর পুত্র যীশুর মহান বাণী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বপ্রথম উগ্র ও অত্যাচারী জার্মানিদের মধ্যে এলো কিছুটা পরিবর্তন।

মধ্যযুগের অন্ধকারে শার্লমানই হচ্ছেন এক ক্ষীণ আলোকবর্তিকা। পোপের গুরু দায়িত্বকে তিনি পালন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। বর্বর জাতিগুলোকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। গ্রিসের ও রোমের লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য নিয়োগ করলেন বহু পণ্ডিতকে। রাজধানী আকেন নগরীকে গড়ে তুললেন রোমের অনুকরণে। নাম দিলেন নতুন রোম।

সেদিন খ্রিস্টান জগতের পতন রুখেছিলেন শার্লমান। কিন্তু পরের দিকে ফল ভালো হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে শার্লমানের আমল থেকে পোপ এবং ধর্মযাজকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। 'চার্লস'-এর আমল পর্যন্ত ছিল পোপ ও সম্রাটের ভালো সম্পর্ক। পরবর্তীতে সদ্ভাবটুকু টিকে থাকল না। একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু

www.pathagar.com

হল বিরোধ। আর সর্বনাশা সেই বিরোধই ইউরোপকে নিমজ্জিত করলো ধর্মান্ধতার অন্ধকূপে। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার যে ক্ষীণ আভাসটুকু শার্লমানের সময় থেকে শুরু হয়েছিল, তা পুরোপুরি হারিয়ে গেল।

প্রকৃতপক্ষে ঐ একাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে শুরু হয় ধর্মান্ধতা ও সামন্ততান্ত্রিকের যুগ। এই সময় থেকে সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে শুরু হয় বিরোধ। বহু আগে থেকে অর্থাৎ রোমান আমল থেকে ইউরোপে উদ্ভব হয়েছিল ভূমিদাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের। অভিজাত সম্প্রদায় এবং সামন্তদের অধীনে থাকতো ভূমিদাস এবং সৈন্য সামন্তরা। তাই সামন্তরাই ছিল রাজার শক্তি। যখন পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ শুরু হল, তখন ধর্মবিশ্বাসের ফলে কিছু কিছু সামন্ত পোপকে সমর্থন জানালো। ফলে শক্তিশালী হয়ে সম্রাটের মতো পোপ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। আরও পরে পোপের চেষ্টায় অধিক সংখ্যক সামন্ত পোপের অনুগামী হওয়ায় পোপের ক্ষমতা সম্রাটের শক্তির প্রায় সমতুল্য হয়ে পড়লো। আর তখনই প্রকাশ পেল ধর্মযাজকদের প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচার ও ধর্মের নামে গোঁড়ামি।

সেই অবসরে ধর্মযাজকরা শিক্ষাটাকেও কুক্ষিগত করে ফেললেন। তাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষায়তনের পরিবর্তে গীর্জাগুলোই পরিণত হল এক একটি শিক্ষাকেন্দ্রে। বিদ্যা বিতরণের ভার গ্রহণ করলেন ধর্মযাজকরাই। শিক্ষার্থী যারা আসতো, তাদের হাতে কোনো পুস্তক দেয়া হতো না। ধর্ম সম্বন্ধে কেবল উপদেশ প্রদান করা হতো। আর শোনানো হতো ধর্মীয় আবরণে আচ্ছাদিত কতগুলো কাল্পনিক কাহিনী। যার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের নামে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করা। সেই কাহিনীগুলোর মূলে কারও সন্দেহ প্রকাশের উপায় ছিল না। কাহিনীগুলোর মূলে সন্দেহ প্রকাশের অর্থ ছিল চর্চার অবমাননা। কোনো ব্যক্তি টু শব্দ করলেই কঠোর শাস্তি লাভ করতো। চার্চ কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার মৃত্যুতে কেউ শোক প্রকাশ করতে পারতো না। তাকে কবর দেয়ার জন্য লোক পাওয়া যেত না, জনজীবনকে যেন একেবারে স্থবির করে রেখে দিয়েছিলেন তৎকালীন ইউরোপের পুরোহিত সম্প্রদায়।

পুরোহিতদের আবার সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল বিজ্ঞানচর্চার উপর। বোধহয় তাদের ধারণা হয়েছিল, দেশের কারিগর ও শিল্পী সম্প্রদায় বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যদি কোনো যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় তাহলে ঐ যন্ত্রের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থ এলেই মানুষ নিয়ম ভঙ্গ করবে। ঐ একই কারণে বিদেশে নৌকাযোগে বাণিজ্য করতে যাওয়াও তারা পছন্দ করতেন না, বাণিজ্যকে রুখবার জন্য তারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রচার করতেন, ঈশ্বরের আদেশে সমুদ্রে বিচরণ করে ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানবরা। তাদের ইচ্ছানুসারে সমুদ্রে সৃষ্টি হয় ঝড়-তুফান আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় দেশ। সমুদ্রবক্ষে নৌকা ভাসিয়ে গমন করলেই তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে এবং রুষ্ট হয়ে জীবনহানি, সম্পদহানি ঘটাবে।

www.pathagar.com

মানুষ বিশ্বাস করেছিল এসব আজগুবি কথা। বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য সব কিছুই ওদের কৃপায় একেবারে রসাতলে যায়। আকাশের বিদ্যুৎ আকাশে লুকিয়ে থেকে মানুষের দিকে মুখব্যাদান করতো, কেটলির ফুটন্ত পানি থেকে বাষ্প মুক্ত হয়ে হতাশ মনে আকাশে মিশে যেতো, কয়লা পেট্রোলিয়াম ও ধাতব আকরিকগুলো পাতালপুরীতে বন্দি জীবন-যাপন করতো—সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না কারোর। অদৃষ্টের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের জন্য কোনো মানুষকে সেদিন চিকিৎসা করা হতো না। হাজার হাজার মানুষ বিনা চিকিৎসায় নিয়তির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতো। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল এই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার। সমগ্র ইউরোপই যেন সরে দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে। তাই ঐতিহাসিকগণ ইউরোপের ঐ সময়টাকে নাম দিয়েছেন ইউরোপের অন্ধকার যুগ।

তবে খুঁটিনাটিভাবে হিসাব করলে এ যুগেও বিজ্ঞানের কিছু কিছু অবদান চোখে পড়বে। যদিও সংখ্যাটা নিতান্তই অল্প। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে চাকা লাগানো লাঙ্গল ও গম পিশে আটা তৈরির যন্ত্রই প্রধান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বায়ুচালিত পেষাই কলের প্রবর্তন হয়। কয়েকজন বিজ্ঞানীরও নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রোকাস (৫ম শতাব্দী), স্টিফানাম (৭ম শতাব্দী), ক্যালিনিকাস (৭ম শতাব্দী), বীড ও অ্যালকুইন (৮ম শতাব্দী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানচর্চার বীজ নিহিত হয়েছিল এক সময়। অন্ধকার যুগের শেষের দিকে ফরাসী পণ্ডিত অবিলার্ড প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় রূপান্তরিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালিতেও স্থাপিত হয়েছিল বলোনা নামে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে অপ্রতিহত জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল ঐ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান।

আরও একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। ইউরোপের ধর্মান্ধতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছিল কুটির শিল্পের উপর। তাই দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছিল কুটির শিল্পের অগ্রগতি। তার ফলও হয়েছে সুদূর প্রসারী। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে এই ইউরোপ ভূখণ্ডেই হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানে ইউরোপের জয়যাত্রা

(খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী)

পটভূমি

দীর্ঘদিন অন্ধকার থাকার পর চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপে আসে বিজ্ঞানের জাগরণ। এই জাগরণ আবার এসেছিল দু'জন পুরোহিতের মাধ্যমে। একজন সন্ন্যাসী রোজার বেকন, আর একজন ইতালির বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক পেত্রার্ক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম রোজার বেকনই পোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'একমাত্র আলোকবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা'। তার ঘোষণা শুনে শিউরে উঠেছিল সমগ্র উইরোপ।

রোজার বেকন

রোজার বেকন জন্মেছিলেন ইংল্যান্ডে। তবে ইউরোপের নবজাগরণের পথিকৃত তাকে বলা হয় না। পণ্ডিতদের মতে ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস এসেছিল পুরোহিত পেত্রার্কের হাত ধরে সর্বপ্রথম ইতালিতে। পেত্রার্কই প্রথম ইউরোপের প্রাচীন ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তারই প্রচেষ্টায় গ্রিক ও রোমের লুপ্ত সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার পুনরুদ্ধার করা হয়। বিজ্ঞান চর্চারও সূত্রপাত করেন তিনিই। তবে মূলত তিনি ছিলেন দার্শনিক ও কবি।

বোক্কাচিও

পেত্রার্কের পর ইতালির আর একজন বাস্তববাদী মহাশিল্পীর নাম করতে হয়। তিনি হচ্ছেন, বিশ্বসাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি 'ডেকামেরন' নামক গদ্য আখ্যায়িকার লেখক বোক্কাচিও। যে সময় একমাত্র ধর্মমূলক গ্রন্থ লেখা এবং পড়া ছাড়া আর সবকিছুই ছিল নিষিদ্ধ, সেই যুগেই পেত্রার্ক এবং বোক্কাচিও জনসাধারণকে উপহার দিলেন তৎকালীন সমাজের নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র। সেদিন হতচকিত হয়ে যায় ইউরোপের মানুষ। এতদিনে যেন নতুন করে চিন্তা করতে শিখলো তারা।

www.pathagar.com

গুটেনবার্গ

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেয়ালী জার্মান শিল্পী গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ইউরোপের নবজাগরণের মূলে আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এতদিনে অতীতের চিন্তাবিদদের লেখা জনসাধারণের সহজলভ্য হলো। খ্রিস্টের বাণী থেকে শুরু করে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছুই প্রকাশিত হলো। সেগুলো দেখে সমগ্র ইউরোপ কেবল মুগ্ধই হলো না—কাগজের উপর নিজের ছবিটিও ভালোভাবে লক্ষ্য করলো।

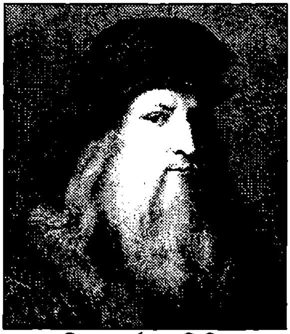
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

সে সময় ইতালিতে আবির্ভাব ঘটে আর একটি বিস্ময়কর প্রতিভা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। একাধারে তিনি ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একদিন এসেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন। তিনি নিজেও ছিলেন বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা। ভিঞ্চির মতো মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফেলেরও ইতালির রেনেসাঁসের মূলে আছে যথেষ্ট অবদান। অথচ এরা দু'জনই ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রকর। এদের অঙ্কিত চিত্রগুলো আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু।

নিকোলাস কোপারনিকাস

তারপর ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। ৭০ বছরের বৃদ্ধ কোপারনিকাস তখন মৃত্যুশয্যায়। তার লেখা একটি গ্রন্থ পোপ তৃতীয় পলের হাতে পড়ে। পোপ বইটি পড়ে চমকে উঠলেন। বাইবেলকে অস্বীকার করে কোপারনিকাস লিখেছেন 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না; পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে'। প্রবল সাড়া পড়ে গেল ধর্মাভিরু ও ধর্মগোঁড়ামিদের মধ্যে। কিন্তু কোপারনিকাস তখন জাগতিক হিসাবনিকাশের বাইরে। তাকে শাস্তি প্রদান করতে না পারায় আরও ক্রুদ্ধ হলেন পোপ। বারবার তাকে অভিশাপ প্রদান করে ক্ষান্ত হলেন না, তার বইটিও বাজেয়াপ্ত করলেন।

কোপারনিকাসের পর এল গ্যালিলিওর কাল। তিনিও ঘোষণা করলেন সেই এক কথা। 'সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে' এবার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো পুরোহিত সম্প্রদায়ের। ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার করছেন বলে রাজদরবারে তাকে অভিযুক্ত করা

www.pathagar.com

হল। চরম শাস্তির ভয় দেখিয়ে গ্যালিলিওর কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়া হল, তিনি যা বলেছেন সবই ভুল—একমাত্র বাইবেলের কথাই অভ্রান্ত।

জোর করে গ্যালিলিওর মুখ বন্ধ করা হলেও জনসাধারণের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিল। কেন একই কথা বারবার শুনতে হচ্ছে তাদের? তাছাড়া গ্যালিলিও যে দূরবীনের সাহায্যে সবাইকে দেখিয়েছেন সূর্য পরিক্রমারত গ্রহদের আকার? তিনি আরও প্রমাণ করেছেন, পৃথিবী আকাশের গ্রহদের মতোই গোলাকার।

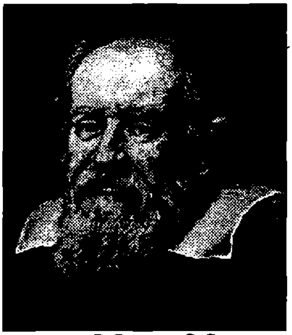

গ্যালিলিও গ্যালিলি

গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলোর ফল হল সুদূরপ্রসারী। তার আবিষ্কার থেকে ইউরোপের মানুষ প্রথম বুঝতে পারে, পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবীর তিনভাগ স্থান অধিকার করে আছে কেবল পানি-পানি আর পানি। সেখানে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানবের ভয় নেই। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি অশরীরী আত্মার রুদ্ররোষ নয়। এগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

জেগে উঠলো ইউরোপের দুঃসাহসী নাবিককুল। 'সপ্তডিঙা' সাজিয়ে বাণিজ্যের প্রয়োজনে পাড়ি দিল দূরভূমিতে। বাণিজ্যের মাধ্যমে শুরু হলো নবজাগরণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের যুগ থেকেই ইউরোপীয়দের মানসিক জগতে এসেছিল নানা পরিবর্তন। একদিকে চলতে থাকে গ্রিক ও রোমান যুগের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার এবং অপরদিকে শুরু হয় বর্তমান সমাজের পটভূমিতে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। ফলে ইউরোপ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত গ-ানিকে মন থেকে মুছে ফেলে যুক্তিবাদী হয়ে উঠলো। ঐ যুক্তিবাদী মন নিয়ে আশপাশের বস্তুরাশির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়েই বরণ করে নিল বিজ্ঞানকে। তারই পরোক্ষ প্রভাব হলো আবিষ্কারের পর আবিষ্কার।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে ভৌগোলিক আবিষ্কার কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুটি কারণে ইউরোপীয়দের মধ্যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েকটি ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডে যোগদান করতে গিয়ে ইউরোপীয়রা প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচ্যের ঐশ্বর্যকে। ঐ ঐশ্বর্য তাদের প্রলুব্ধ করেছিল, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা মাথায় এসেছিল। দ্বিতীয়ত ইউরোপীয়দের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য অনেকখানি নির্ভর করতে হতো প্রাচ্যের উপর। যানবাহনের অসুবিধা, দস্যু-ডাকাতের ভয় ইত্যাদিকে তুচ্ছ করেও তারা স্থলপথে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো। ইতালির ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরের বণিকরা আরবীয়

www.pathagar.com

বণিকদের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। কিন্তু তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে নিলে সেই ব্যবসার পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তখনই তাদের দৃষ্টি পড়ে সমুদ্রের উপর।

ইতিমধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর সবদেশের সঙ্গে জলভাগ যুক্ত এবং পৃথিবীটা গোলাকার। জর্জ পূর্বাম, জোহানস মূলার ওয়ালদার পূর্বের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে সংশোধিত করেছিলেন এবং প্রস্তুত করেছিলেন কতগুলো নৌপঞ্জিকা। আকাশের নক্ষত্রদের সম্বন্ধে একাধিক মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন আলব্রেখট ডুরার। চীনাদের কাছ থেকে লাভ করেছিল সমুদ্রে দিক নির্ণয় করার যন্ত্র। এবার সত্যি সত্যিই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো তারা।

সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রথম উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল পর্তুগীজ নাবিকরা। তারা প্রায়ই জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে আফ্রিকার উপকূলবাসী মূরদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করতো। ফলে আফ্রিকার উপকূলবর্তী অন্যান্য দেশের প্রতি তাদের কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল। তাছাড়া ভারত মহাসাগরের মসলা দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরবীয় বণিকরা মসলা সংগ্রহ করে ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হতো বলে পর্তুগীজরা সরাসরি মসলা দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করে। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীর একটি পাণ্ডুলিপি জনৈক পর্তুগীজ রাজবংশীয় ব্যক্তির হাতে পড়ায় তিনি প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিজেই সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তুত করেন কয়েকটি মূল্যবান মানচিত্র ও নকশা। আর ওই কারণে পর্তুগীজদের পক্ষে সমুদ্রে অভিযান চালানো সহজ হয়ে ওঠে।

মার্কো পোলো

অভিযানকারীদের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ভারতবর্ষে আসার পানিপথ আবিষ্কার করা। প্রথমে বার্থলোমিউ ডিয়াজ নামে এক দুঃসাহসী নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ভারতে আসার জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। কিন্তু ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্তে এক অন্তরীপে উপনীত হওয়ার পর প্রবল ঝড়ের জন্য আর অগ্রসর হতে পারলেন না। দুঃখিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন সেখান থেকে। অন্তরীপটির নাম রেখে এলেন ঝটিকা অন্তরীপ।

বার্থলোমিউ ডিয়াজ সেদিন দুঃখিত হলেও খুশি হলেন তৎকালীন পর্তুগালের রাজা। কারণ, এ পর্যন্ত কোনো ইউরোপীয় নাবিক এতদূর অগ্রসর হতে পারেননি। তার যেন মনে হল, এবার সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে অবশ্যই পৌছানো যেতে পারে। পর্তুগালের রাজা তখন 'ঝটিকা অন্তরীপ' নামটি বাতিল করে নাম রাখলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ' বা 'কেপ অফ গুড হোপ'।

www.pathagar.com

১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই পর্তুগালের রাজার নির্দেশে এবার লিসবন থেকে ভারবর্ষের দিকে যাত্রা করলেন ভাস্কো দা গামা নামে এক সাহসী নাবিক। প্রায় দশ মাস ক্রমাগত জাহাজ চালিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে তিনি অবতরণ করলেন কালিকট বন্দরে। পর্তুগালের রাজার অনুমান সত্য হল এবং সেই থেকে ভারতবর্ষের দ্বার পাশ্চাত্যের কাছে মুক্ত হল।

ভাস্কো দা গামা

পর্তুগীজরা যখন সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ঠিক সেই সময় স্পেনের নাবিকরাও উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী গোল, গ্যালিলিওর এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে জেনোয়া নিবাসী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভাস্কো দা গামার আগেই ভারতে আসার জন্য স্পেনের পক্ষ থেকে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর তিনি একটি দ্বীপে অবতরণ করে ধারণা করে নিয়েছিলেন ভারতবর্ষেই অবতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন এ কথা মৃত্যুর আগেও জানতে পারেননি।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

ভাস্কো দা গামা ও কলম্বাসের আবিষ্কারের কথা দেখতে দেখতে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। নব আবিষ্কৃত রাজ্যগুলোর অধিকার নিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার মানচিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরকে একটি রেখা দিয়ে ভাগ করে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করেছিলেন। পশ্চিমভাগ লাভ করলো স্পেন এবং পূর্বভাগ লাভ করলো পর্তুগাল। এর ফলে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা থাকলো স্পেনের অধিকারে আর উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে এশিয়া এবং মসলা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পেল পর্তুগাল। ঐ বিভাগ করায় স্পেনের বিশেষ কিছু সুবিধা না হওয়ায় স্পেন ক্ষুণ্ন হলো, কিন্তু পোপের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য উপায় চিন্তা করতে হলো।

স্পেনীয় সরকারের অধীনে সে সময় কাজ করতেন ম্যাগেলান নামক এক পর্তুগীজ নাবিক। স্পেনের পক্ষ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে ভারতে আসার জন্য তিনিই প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তার আগ্রহকে স্বাগত জানালেন স্পেনের রাজা। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যাগেলান পাঁচটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশে। একই উদ্দেশ্য কলম্বাসেরও ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে তার

www.pathagar.com

সঠিক ধারণা ছিল না। তাই আমেরিকার পশ্চিম উপকূলকে ভারতবর্ষ মনে করে ভুল করেছিলেন। ম্যাগেলান কিন্তু সে ভুল করলেন না। আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে যেতে যেতে একদিন একটি প্রণালীতে এসে উপস্থিত হলেন। এই প্রণালীটি আজও ম্যাগেলান প্রণালী নামে খ্যাত। অতঃপর উক্ত প্রণালী ত্যাগ করে আরও অগ্রসর হতে লাগলেন পশ্চিম দিকে। এবার দৃষ্টিগোচর হল এক স্থির, শান্ত ও অতলান্ত মহাসমুদ্র। সমুদ্রের এই রূপ দেখে ম্যাগেলানই নামকরণ করলেন 'প্রশান্ত মহাসাগর'।

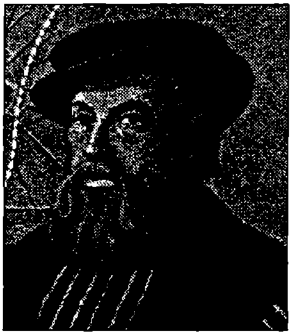
ম্যাগেলান

অনিশ্চিত দিন-রাত কেটে গেল। ম্যাগেলান ধৈর্য হারালেন না। একদিন সত্যিই সত্যিই দৃষ্টিগোচর হল কতগুলো দ্বীপ। আনন্দিত ম্যাগেলান দলবলসহ অবতরণ করলেন। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

দ্বীপপুঞ্জে জনবসতি ছিল এবং তাদের রাজাও ছিলেন। ম্যাগেলান রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে এক সর্দারের হাতে প্রাণ হারালেন। দুঃখিত হলেন রাজা। ম্যাগেলানের সঙ্গী-সাথীদের প্রচুর মসলা এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে। তারা ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, সর্বশেষে আটলান্টিক মহাসাগর ঘুরে ফিরে এল স্পেনে। ভূ-প্রদক্ষিণ করার কৃতিত্ব অর্জন করে ম্যাগেলান ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রইলেন।

মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো দা গামার ভারতে আগমন, ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ—সারা ইউরোপের বুকে প্রবলভাবে সাড়া তুললো। এবার সৌভাগ্যের চাবি হাতের মুঠোয় পাবার জন্য বেরিয়ে পড়লো ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকগণ। তাদের কৃতিত্বের জন্যই পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রায় সব দেশের সঙ্গে স্থাপিত হল যোগাযোগ। নব আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে অধিকার স্থাপনের অভিপ্রায়ে ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে লিপ্ত হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। এই সংগ্রামই বিশ্বের ইতিহাসে 'ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগ্রাম'।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য ইউরোপে যে সাড়া পড়েছিল তাতে চরম উন্নতি লাভ করেছিল নৌ-বিজ্ঞান। অবশ্য এ বিষয়ে স্পেন ও পর্তুগালের বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোনো অবদান নেই। মহত্তর অবদান রেখেছেন ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তাদের প্রথম আবিষ্কার, সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান নির্ণয়। তবে নৌবিদ্যায় সমৃদ্ধ হয় ইংরেজ বিজ্ঞানী গিলবার্টের চুম্বক কম্পাসের দ্বারা অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে। তারপর সেই

www.pathagar.com

সময় জন নেপিয়ার আবিষ্কার করেন লগারিদম। এবার বড় বড় গুণ ভাগ করা সহজ হওয়ায় নাবিকদের অনেক সুবিধা হয়।

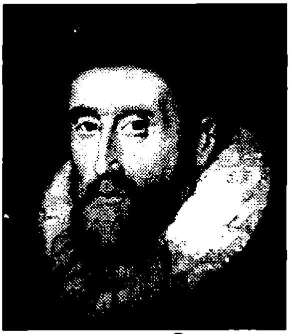
জব নেপিয়ার

অতঃপর বিজ্ঞানীরা নাবিকদের প্রয়োজনে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হন। সরকারও এই কাজে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ শহরে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানকার অধিকর্তা নিযুক্ত হন জন ফেমস্টেড। সুদীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে চাঁদের গতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি কতগুলো তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ তালিকাগুলোর দ্বারাই প্রথম দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু ফেমস্টেডের পদ্ধতিটি ক্রটিমুক্ত ছিল না। সেই কারণে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের গবেষণা অব্যাহত থাকে। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রিশ্চিয়ান হাইঘেনস পেন্ডুলামের সাহায্যে সময় ঠিক করে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য একটি ক্রনোমিটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু জাহাজের দোলায় পেন্ডুলাম সঠিক সময় নির্দেশ করতে না পারায় সমুদ্রে ক্রনোমিটার যন্ত্রটিও কার্যকরী হল না। তখনই ফরাসী সরকার ও বৃটিশ সরকার উভয়ই সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারকের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

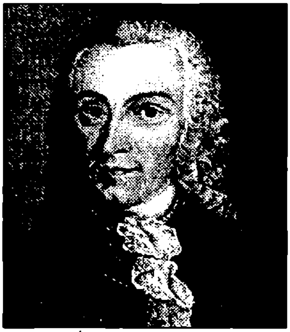
টোবায়েস মেয়ার

১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী টোবায়েস মেয়ার স্থির নক্ষত্রপুঞ্জের তুলনায় চাঁদের অবস্থান নির্ণয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলো অপেক্ষা মেয়ারের পদ্ধতি ক্রটিহীন হওয়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। অবশেষে ইংল্যান্ডের জন হ্যারিসন এবং ফ্রান্সের পিয়েরে লিয়র পৃথক পৃথকভাবে নিখুঁত ক্রনোমিটার যন্ত্র প্রস্তুত করার পর দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয়। তাই অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা নির্ণয় পদ্ধতি সমুদ্র যাত্রার প্রত্যক্ষ ফল।

ইউরোপের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রবল আলোড়ন আসে তার মূলে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত কতগুলো বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগ লাভ করেছিলেন, অপর দিকে নতুন প্রতিভার ব্যাপক সমন্বয় ঘটেছিল।

www.pathagar.com

প্রথমে ইংল্যান্ডের কথা ধরা যেতে পারে। সেখানকার 'গ্রেশাম' কলেজে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে জন উইলকিনস নামে একজন উৎসাহী বিজ্ঞানী ইংল্যান্ডের তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠন করেন 'ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি বিজ্ঞান সংস্থা। কতগুলো রাজনৈতিক কারণে উক্ত সংস্থার কাজকর্ম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞান সংস্থা ভালোভাবে কাজকর্ম শুরু করে।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি। দ্বিতীয় চার্লসের আমলে গঠিত এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই সোসাইটি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে উক্ত সোসাইটি সদস্যদের 'ফেলো'—এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করার রীতি প্রচলন করে।

এ সময় ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে যেমন—রোম, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালিতে অনুরূপ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তবে কতগুলো সংগঠন দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে নি। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে রোমে 'একাডেমিয়া ডি লিন্সি' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল সেটি মাত্র ২৯ বছর স্থায়ী হয়েছিল। গ্যালিলিও ছিলেন উক্ত সংস্থাটির সঙ্গে জড়িত।

রোমের পরে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে 'একাডেমিয়া ডেল সিমেন্টো' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এটিও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত 'প্যারিস একাডেমি অব সায়েন্স'। ফরাসী বিপ্লবের পর উক্ত সংস্থাটির কার্যত্রে অনেক বিস্তৃত হয় এবং লন্ডনের রয়েল সোসাইটির মতই সুনাম অর্জন করে।

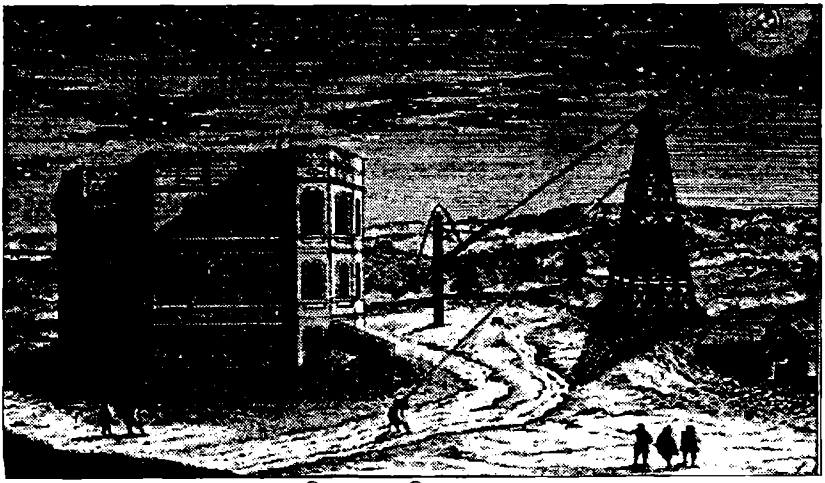

প্যারিস একাডেমি অব সায়েন্স

www.pathagar.com

এ সময় জার্মানিতেও কয়েকটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল। তবে কোনো সংস্থাই স্থায়ী হতে পারেনি। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে লাইবনিটসের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত 'বার্লিন একাডেমি' স্থাপিত হলে জার্মানির বিজ্ঞানীরা উক্ত একাডেমির মাধ্যমে ভালভাবে গবেষণা চালাতে সক্ষম হন।

বার্লিন একাডেমি

১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে 'সেন্ট পিটার্সবার্গ একাডেমি' স্থাপিত হলে জার্মানির বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

পরের দিকে আরও কিছু কিছু বিজ্ঞান সংস্থা গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হয়ত অনেক হবে। কিন্তু লন্ডনের রয়েল সোসাইটি, ফ্রান্সের প্যারিস একাডেমি অব সায়েন্স এবং বার্লিন একাডেমির সুনাম কোনোকালেই নষ্ট হবে না। ওই সব সংস্থার সঙ্গে বিদেশিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ভারবর্ষের প্রায় ১৮ জন বিজ্ঞানী

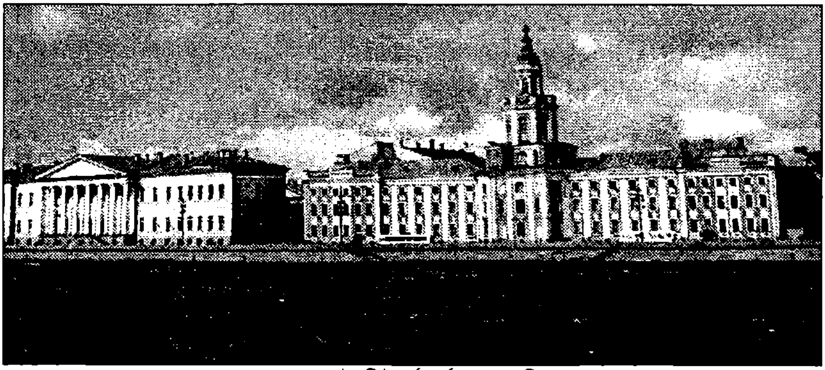

সেন্ট পিটার্সবার্গ একাডেমি

www.pathagar.com

রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডি. এন. ওয়াদিয়া, পঞ্চানন মাহেশ্বরী, মেঘনাদ সাহা, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, শ্রীনিবাস রামানুজন, শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বিজ্ঞানী একদিকে যেমন রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তেমনই আরও বহু বিদেশি সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

রয়েল সোসাইটি

ইউরোপের শিল্পবিপ্লব

বাণিজ্য ও নৌচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা ছিল সেগুলো দূরীভূত হওয়ায় প্রাচ্যের দেশগুলো ইউরোপের হাতের মুঠায় এসে গেল। যদিও এ বিষয়ে স্পেন ও পর্তুগাল সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল তবুও ফলটা ভোগ করেছিল ইংরেজরাই। তারা প্রথম থেকে কুটিরশিল্পে ছিল উন্নত। এবার এশিয়ার দেশগুলো আমেরিকা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজের দেশে গড়ে তুললো শিল্পের পর শিল্প। তাছাড়া সে সময় ইংরেজরা লাভ করেছিল অসাধারণ প্রতিভাবান কয়েকজন বিজ্ঞানীকে। তারাই শিল্প উৎপাদনের সহায়ক নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে বিপ্লব এনেছিলেন।

এই শিল্পের প্রয়োজনেই কয়লাখনিগুলোকে ঠিকমত ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সেও এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

আগে শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কাঠকেই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ইংল্যান্ডে যেভাবে শিল্পের প্রসার ঘটলো তাতে কাঠ আর সহজলভ্য হলো না। তখনই শিল্পপতিদের দৃষ্টি পড়লো কয়লার উপর। কিন্তু খনির উপরের স্তরের কয়লা বের করা যত সহজ ছিল, ভেতর থেকে কয়লা উত্তোলন তত সহজ ছিল না। সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো খনি থেকে পানি সরানো। ফোর্স পাম্পের ব্যবহার অবশ্য

www.pathagar.com

পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু খুব গভীর থেকে পানি তোলা ফোর্স পাম্পেরও সাধ্যের বাইরে ছিল। কারণ, এই জাতীয় পাম্প দ্বারা পানিকে নিষ্কাশন করতে হলে দরকার হতো প্রচুর শক্তি। তাই প্রথমে উক্ত বিষয়ে ঘোড়াকে কাজে লাগানো হয়েছিল। কথিত আছে, ইংল্যান্ডের কোনো কোনো কয়লা খনিতে পানি নিষ্কাশনের কাজে পঁচিশটি বা তারও বেশি ঘোড়াকে ব্যবহার করা হতো।

এই অসুবিধা কিছুটা দূর করেন ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন থমাস স্যাভেরি ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি স্টিম পাম্প তৈরি করে খনি থেকে পানি নিষ্কাশনের কাজ অনেকটা সহজ করে দিলেন। তারপর 'থমাস নিউকোমেন' আবিষ্কার করেন 'এ্যাটমোসফেরিক স্টিম ইঞ্জিন'। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউরোপের প্রায় সব খনিতে উক্ত ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে পানি নিষ্কাশন করা হতো। অবশেষে জেমস ওয়াট নতুন ধরনের স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর কয়লা উত্তোলনের কাজ খুবই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

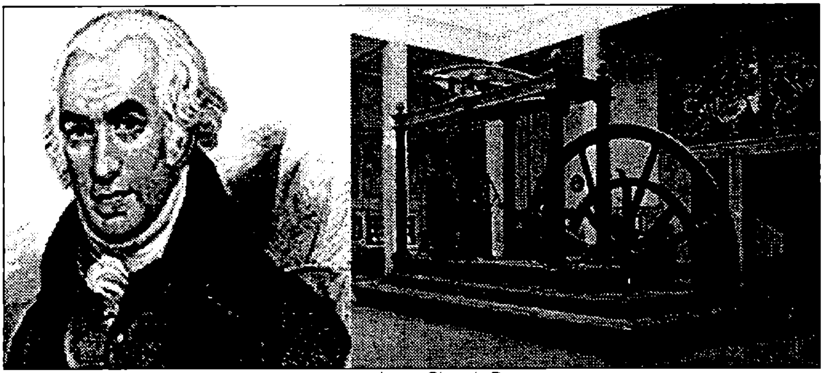

জেমস ওয়াট ও স্টিম ইঞ্জিন

এবার জ্বালানি এবং কাঁচামাল কোনোটিরই অসুবিধা হলো না। তার উপরে ইংল্যান্ড স্থাপন করেছিল জাতীয় ব্যাংক। ওই ব্যাংক সরকার থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাইকে ঋণ দান করতো। তাই একদিকে যেমন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটলো অপরদিকে গড়ে উঠলো বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ আগেই সম্ভব হয়েছিল, এবার আবিষ্কৃত হল সুতাকাটার যন্ত্র, কলের তাঁত, বাস্পীয় ইঞ্জিন, লোহা গলানোর ইঞ্জিন, ইস্পাত প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক কিছু। বাস্প শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে শিল্পের আর কোনো অসুবিধা রইল না। একটা ইঞ্জিন একশটা মানুষের কাজ একাই সম্পন্ন করলো। ইংল্যান্ডে দেখা দিল শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লব প্রধানত বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে এসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইংল্যান্ডের আর্দ্র জলবায়ু ছিল বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'জন কে' আবিষ্কার করেন দ্রুতগামী মাকু, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে হারগ্রিবস আবিষ্কার

www.pathagar.com

করেন একসঙ্গে আট গাছা সুতা কাটার যন্ত্র। আর ঠিক সেই সময়ই 'আর্করাইট' উদ্ভাবন করলেন পানি দিয়ে চালিত যন্ত্র ওয়াটার ফ্রেম। এবার মানুষকে তাতে আর হাত লাগাতে হল না। যন্ত্রই চালালো তাঁতকে। সবশেষে জেমস ওয়াট যখন বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করলেন তখন আর কোনো সমস্যা থাকলো না। বস্ত্রশিল্পে এলো যুগান্তকারী সাফল্য।

জেমস ওয়াটের ইঞ্জিন অপরাপর শিল্পকেও করলো সমৃদ্ধ। এবার ইংরেজদের উপনিবেশগুলো থেকে জাহাজযোগে আসতে লাগলো রাশিরাশি কয়লা, লোহা ও পাথর। রবার্ট ফুলটন নামে এক বিজ্ঞানী নৌকার সঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে যুক্ত করে নৌকাকে দ্রুতগতি দান করলেন। পালতোলা জাহাজের কালও শেষ হয়ে এল। অপরদিকে জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুত করলেন রেল ইঞ্জিন। দূরত্বকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা সম্ভব হলো। তবে এই সমস্ত আবিষ্কারের পেছনে আছে জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তাই শিল্প বিপ্লবের প্রধান নায়ক হিসেবে জেমস ওয়াটকে ধরা যেতে পারে।

মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট হতে চায় না। মানুষ এগিয়ে যেতে চায়। ঠিক সেই অবস্থাই হলো ইংল্যান্ডের। তারা চাইলো আরও বেশি উন্নতি। বহু প্রতিভাবানকে নিয়োগ করা হলো। জেমস ব্রিন্ডলির পরিকল্পনায় প্রতিটি শহরের চারদিকে আধুনিক প্রণালীতে খাল খনন করা হলো। বাষ্পচালিত নৌকা যোগে এলো প্রচুর কাঁচামাল। স্থলপথে কারখানার কাছে সেগুলোকে বহন করে নিয়ে চললো রেল ইঞ্জিন। আর তখনই ইংল্যান্ড সারা বিশ্বের কারখানায় পরিণত হয়ে গেল।

শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের তুলনায় ইংল্যান্ডের আর্থিক কাঠামো অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছিল। যার জন্য স্বয়ং নেপোলিয়নকেও হিমশিম খেতে হয়েছিল ইংল্যান্ডের কাছে। কঠোর নির্দেশ জারি করেও ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে পারেননি। ফলে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হয়েছিল ফ্রান্সে শিল্পের প্রসারের জন্য।

ইংল্যান্ড বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছিল বলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিচিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গড়ে তুলেছিল নিজের উপনিবেশ। তাই এককালে বলা হতো, 'ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না'। অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলেই শক্তি বাড়ে এবং বুদ্ধিও বাড়ে। যার জন্য কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে ইংল্যান্ডই সেদিন লাভ করেছিল চরম উৎকর্ষ। তাদের কাছ থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্যের দেশগুলো অনেক পরে ওদের মাধ্যমেই লাভ করেছে নবযুগের উপকরণ। যে প্রাচ্য একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান রূপে পরিচিত হয়েছিল, বিজ্ঞানে উন্নতভাবে গবেষণা চালিয়ে সেই প্রাচ্যকে সে আয়ত্ত করলো। একটানা শোষণের ফলে প্রাচ্যকে অন্তঃসারশূন্য করে নিজের দেশকে শিল্পে-সম্পদে ভরিয়ে তুললো। পুরাতন জীর্ণ সংস্কারগুলোকে

www.pathagar.com

ছিন্ন করে মধ্যযুগে ইউরোপই প্রথম বেরিয়ে এসেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ যে সর্বগ্রাসী গ্রিক সভ্যতা, তার ভালোটুকুই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল আর যেগুলো ভালো মনে করেনি তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিল। এককথায় পুরাতনকে ভিত্তি করে রচনা করেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সুদৃশ্য ইমারত। কিন্তু প্রাচ্য তখনও কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেবল পুরাতনকে নিয়েই মাতামাতি করছিল। তাছাড়া শিক্ষা থেকেও অনেক দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল তারা। তাই তার ভাগ্যে জুটেছে অপরিসীম দুঃখ, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ।

ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রযাত্রা

ইউরোপে বিজ্ঞানের রাজ্যে যে আলোড়ন এসেছিল প্রকৃতপক্ষে তার সূচনা হয়েছিল পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির হাতে। আধুনিক বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। পেন্ডুলাম ঘড়ি, থার্মোমিটার, দূরবিণ যন্ত্র প্রভৃতি বহু জিনিসের আবিষ্কর্তা। সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্যদের অবদানকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনকে।

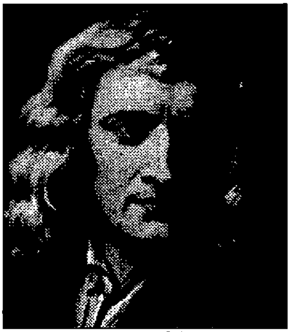
আইজ্যাক নিউটন

বিজ্ঞানের রাজ্যে তিনি এক মহাবিস্ময়। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারক এবং অঙ্কশাস্ত্রের কয়েকটি শাখার উদ্ভাবক। পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান তারই হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই দুইজন অমিত প্রতিভাধর ছাড়াও বহু বিজ্ঞানী সেদিন গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রেখেও গেছেন স্থায়ী কীর্তি। তাদের মধ্যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সৃষ্টি করেছেন ফ্রান্সের রেনি ডেকার্ত। সম্ভাব্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ফেরমা ও পাস্কাল, চুম্বকের গুণাগুণ আবিষ্কর্তা গিলবার্ট। ধূমকেতু সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের আবিষ্কারক এডমন্ড হ্যালি।

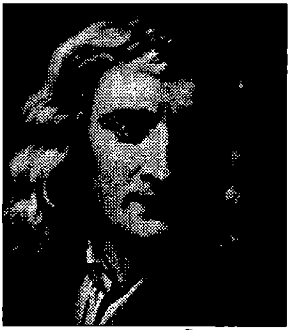
এডমন্ড হ্যালি

উদ্ভিদ কোষের আবিষ্কারক রবার্ট হুকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জন রে, শরীরতত্ত্ববিদ ইউলিয়াম হার্ভে, গণিতজ্ঞ অ্যালফেন্সে বোরেলি ও লাইবনিটস এবং অসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল প্রমুখ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। এই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যন্ত্রবিদ জেমস ওয়াট, হারগ্রিভস, জর্জ স্টিফেনসন। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন ডি.

www.pathagar.com

এলেমবার্ট, ল্যাগরাঞ্জ ল্যাপলাস, গস, জেমস ব্রাডলি, উইলিয়াম হার্শেল, ইম্যানুয়েল কান্ট, থমাস রাইট ও লিজেন্ডার।

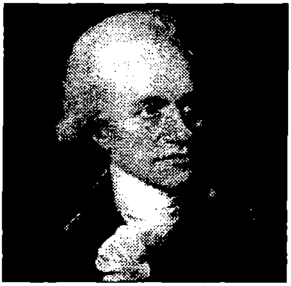
উইলিয়াম হার্শেল

এই শতাব্দীতে রসায়ন বিজ্ঞানও সঠিক পথটি খুঁজে পায়। যারা এ বিষয়ে যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন তারা হলেন জোসেফ ব-াক, হেনরি ক্যাভেন্ডিস, জোসেফ প্রিস্টলি, শীলে, হামফ্রে ডেভি, এন্টনি ল্যা ভোসিয়ার, চার্লস প্রভৃতি।

তড়িৎ বিজ্ঞানকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লুইগি গ্যালভানি, আলেকজান্দ্রা ভোল্টা, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জোহান মিশেল ও কুলম্ব।

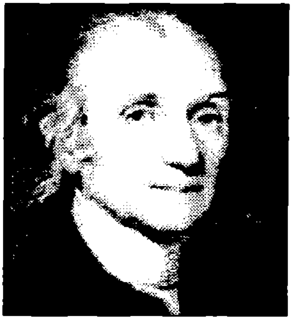
হেনরি ক্যাভেন্ডিস

ডাক্তার জেনার এই শতাব্দীতেই আবিষ্কার করেন বসন্তের টীকা। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত করেন তিনি। থার্মোমিটার, স্টীম ইঞ্জিন, বেলুন, সুতো বোনার কল প্রভৃতি এই শতাব্দীর আবিষ্কার। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে এই সময়ই।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান একটানা অগ্রগতির ইতিহাস। বহু আবিষ্কারক এই শতাব্দীতেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং অসংখ্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোকপাত এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। তাছাড়া আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বক, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা—সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বৈপ্লবিক অবদান। এ যুগে আবির্ভূত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের মাত্র কয়েকজনের নাম করা হলো।

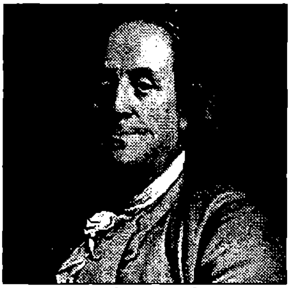
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন—গেলুসাক, অ্যাভোগেড্রোজ, ডালটন, বার্জিলিয়াস, থমসন, মিতশার্লি, ডুলং, পেটিট, ক্যানিজারে, মেন্ডালিয়ভ, বুনসেন, ক্রুকস, র‍্যারে, র‍্যাসজে, মোসলে, কুরি দম্পতি, বেকারেল ও রাদারফোর্ড।

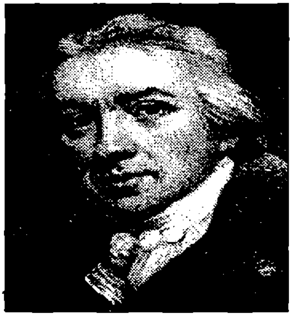
ডাক্তার জেনার

www.pathagar.com

কুরি দম্পতি: পিয়েরি কুরি ও মেরি কুরি

বিদ্যুৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন অ্যাম্পেয়ার, উরস্টেড, ওহম, সিবেক, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হুইটস্টোন, কারশফ, ফিটজারাল্ড, হার্টজ।

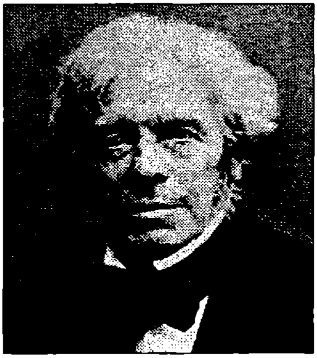

মাইকেল ফ্যারাডে

লুই পাস্তুর

চিকিৎসা জগতে বিপ্লব এনেছেন লুই পাস্তুর, কোখ, বেহরিং, রোনাল্ড রস, পাভলভ সহ বহু বিজ্ঞানী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যা নগণ্য! সেগুলোর মধ্যে স্টিম লোকোমোটিভ, স্টিমবোট, সেফটি ল্যাম্প, স্টেথিসস্কোপ, তড়িৎচুম্বক, দিয়াশলাই, ডায়নামো, টেলিগ্রাফ, বাইসাইকেল, মেশিনগান, টরপেডো, ডিনামাইট, টাইপরাইটার, টেলিফোন, সেলুলয়েড, ফোনোগ্রাফ, ইলেকট্রিক বাল্ব, মাইক্রোফোন, ফাউন্টেনপেন, ফটোগ্রাফি, মোটরসাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, সাবমেরিন, রেডিও, এক্সরে প্রধান।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের পরিধি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। মানুষের সভ্যতাও হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান নির্ভর। স্টিম ও বিদ্যুতের যুগ অতিক্রম করে আজ মানুষ সম্মুখীন হয়েছে পরমাণুর যুগে। হাজার হাজার গবেষক পৃথিবীর অজস্র গবেষণাগারে গবেষণারত। বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজ

www.pathagar.com

মানুষের মনে কেবল সেই চিন্তা। এই শতাব্দীতে মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে, এই শতাব্দীতে মানুষ পরিচয় পেয়েছে পরমাণুর ধ্বংসাত্মক রূপ ও কল্যাণকর রূপ দুটোই। পৃথিবীর উপরের আয়নমণ্ডলের রহস্য উদঘাটন করেছে, উদঘাটিত হয়েছে বিশ্বের অনেক অজানা রহস্য। পৃথিবীর বেশিরভাগ দুরারোগ্য ব্যাধিকে নির্বাসিত করে এবং উন্নত শল্যচিকিৎসার সাহায্যে অকালমৃত্যুকে জয় করা সম্ভব হয়েছে।

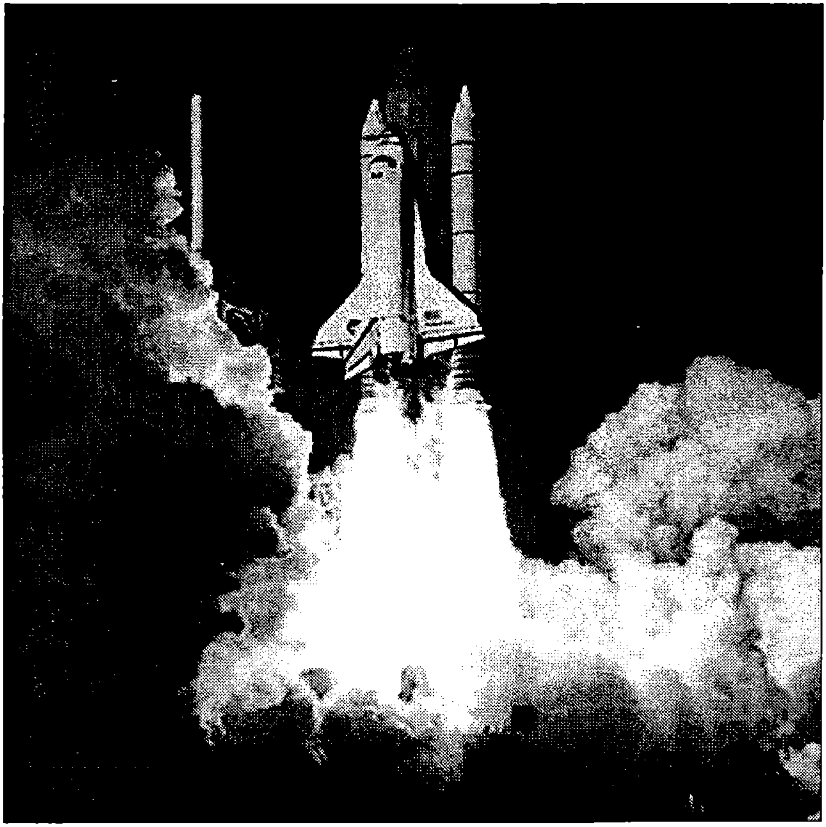

রকেট

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী এবং আবিষ্কারের সংখ্যা অল্প কথায় বলে শেষ করা যাবে না। তবে এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে পড়ে উড়োজাহাজ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ট্যাঙ্ক, রাডার, আয়ানো স্কোপ, টেলিভিশন, রকেট, সাইক্লোট্রন প্রভৃতি বিস্ময়কর যন্ত্র। পেনিসিলিন স্টেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক এবং কতগুলো জটিল জৈব যৌগের বিশে-ষণ ও জীবকোষের পরিচয় জানা গেছে। পারমাণবিক চুল্লী এই শতাব্দীর আরেকটি অবিস্মরণীয় অবদান।

www.pathagar.com

এশিয়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

জাপান : প্রযুক্তি বিদ্যার চারণভূমি

জাপানের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও রাজা বা মিকাডোর কোনো ক্ষমতা ছিল না। কার্যত প্রধানমন্ত্রী বা সোগান ছিলেন দেশের সব ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকতো সামন্তরা আর সামন্তদের অধীনে থাকতো সেনাবাহিনী। তাই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই সামন্ত শ্রেণী ও সোগান উভয়ে ছিল অত্যাচারী। তবুও জাপানিদের মধ্যে একটা বড় গুণ বিদ্যমান। তারা দেশকে ভালবাসে। নিজেদের মধ্যে তারা যাই করুক না কেন, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করে না। তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ ছিল ছেলেমেয়েদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করানো। ধর্মশিক্ষাও প্রদান করা হতো। ধর্মের নামে কুসংস্কারকে প্রাধান্য দেয়নি তারা। দেশপ্রেম, জাতীয়তা বোধ, সংস্কারমুক্ত মন, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মজ্ঞান এসবই বিজ্ঞানের পরিপূরক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাপান বিজ্ঞানে উন্নতির শিখরে পৌঁছায়। উন্নতির মূল সোপান ছিল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। জাপানের ইতিহাস প্রমাণ করে, জাতির চরম সর্বনাশের দিনে যদি জাতির মধ্যে দেশপ্রেম মুছে না যায় তাহলে সে জাতির উন্নতির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জাপান বহির্বিশ্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়েছিল। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো ইউরোপীয় বণিকরা জাপানে হানা দিয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতেই। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন জেসুইট ধর্মযাজকগণ। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি অনেকেই এসেছিল বাণিজ্যের জন্য। তাদের স্বার্থপর মনোভাব জাপানীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। জাপানিরা বুঝতে পেরেছিল, ওরা বাণিজ্যের নামে দেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের সংস্পর্শ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য রাজা জারি করেন কঠোর আদেশ। সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের জাপান ত্যাগ করতে বাধ্য করানো হয় এবং স্বধর্মত্যাগী জাপানীদের হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা তিনি তার ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে চিরকাল অটুট রাখতে পারবেন। শেষপর্যন্ত তাকেও হার মানতে হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে।

www.pathagar.com

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ একদিন আমেরিকার নৌ-সেনাপতি 'কমোডর পেরী' এসে হাজির হলেন রাজ দরবারে। দাবি জানালেন, মার্কিন জাহাজ ও নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একাধিক জাপানী বন্দর উন্মুক্ত রাখতে হবে। এবার পেরির দাবিকে উপেক্ষা করতে ভয় পেল জাপান। তার সঙ্গে আছে সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ও আধুনিক সমরাস্ত্র। জাপান বুঝি ওদের সঙ্গে তুলনা করলো নিজেদের। তারপর ভয়ে মেনে নিল পেরীর দাবিকে।

আমেরিকা এবার জাপানের সঙ্গে চালালো অবাধ বাণিজ্য। তাদের দেখাদেখি ইংরেজ, রাশিয়াসহ আরও কয়েকটি দেশ সম্পাদন করলো বাণিজ্য চুক্তি। জাপান আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলো না। শিকার হলো ঔপনিবেশিকদের।

বিদেশি বণিকদের কার্যপ্রণালীতে বিক্ষুব্ধ হলো জাপানের জনসাধারণ। সূচনা হলো এক অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের। দেশপ্রেমিক তরুণরা ছিল এই বিপ্লবের নেতা। কিছু কিছু সামন্তও যোগ দিলেন সেই বিপ্লবে। রাজা মুৎসুহিতোরও এ বিষয়ে সমর্থন ছিল। কারণ, সোগান ও সামন্তদের স্বেচ্ছাচার তিনি পছন্দ করতেন না। সুযোগ পেয়ে মুৎসুহিতো তরুণদের সহায়তায় দেশের সামন্তদের ক্ষমতাচ্যুত করালেন আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও মানলেন না। অন্যদিকে জনগণের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য স্থাপিত হলো বিজ্ঞান গবেষণাগার। কিয়াটো ও টোকিওতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন পাশ্চাত্যের পণ্ডিতজনেরা। দেশের তরুণরা যাতে বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো এবং বুদ্ধিমান ছেলেদের উৎসাহিত করা হলো।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হলেন না মুৎসুহিতো। বিদেশের সাহায্য নিয়ে কলকারখানায় ভরিয়ে দিলেন দেশ। বেকার সমস্যা থাকলো না। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ। আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত করা হলো জাপানের সেনাবাহিনীকে। ইংরেজের মতো নৌবাহিনীকে উন্নত করার জন্য স্থাপন করা হলো জাহাজের কারখানা ও পোতাশ্রয়।

জেগে উঠলো জাপান। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করে মাত্র পঁচিশ বছরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা লাভ করলো। তারপর শুধু উন্নতির ইতিহাস। বিজ্ঞানের কল্যাণে জাপান যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছিল সে কথা প্রমাণ করে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং বিগত দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ।

কারিগরি বিজ্ঞানে জাপানের মতো উন্নত দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তার অবদান কম নয়। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ

www.pathagar.com

করার জন্য ১৯৫৮ সালে হিডেকি য়ুকাওয়া এবং ১৯৬৫ সালে সিনিচেরো তমোনাগা এই দুই জাপানী বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

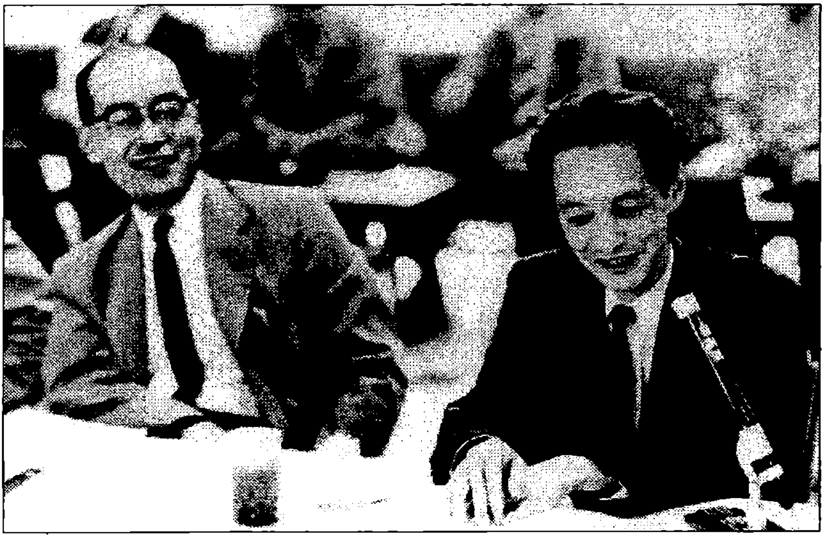

হিডেকি য়ুকাওয়া ও সিনিচেরো তমোনাগা দুই নোবেলজয়ী

চীন সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চা

সভ্যতা ও কৃষ্টিতে চীন এতখানি গৌরববোধ করতো যে, সে নিজের রাজ্যকে 'স্বর্গীয় রাজ্য' নামে অভিহিত করতো। মনে করতো, তাদের দেশের মতো সুসভ্য দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। তাই বিভেদের সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে তারা ঘিরে রেখেছিল নিজেদের। ঠিক যেন প্রাচীনকালে তৈরি তাদেরই প্রাচীরের মতো। বিদেশের সান্নিধ্য তাদের কাছে ছিল একেবারেই অসহ্য। বিদেশি মাত্রই ছিল বর্বর আর বিদেশের শিক্ষা ও সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ অবহেলার বস্তু। বিদেশি প্রভাব যাতে দেশের উপর না পড়ে সে বিষয়েও ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

গোঁড়ামি ও অহঙ্কারবোধই চীনের অধঃপতনের মূল কারণ হয়েছিল। তারা মনে করেছিল, তাদের দেশ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে তার চেয়ে বেশি আবিষ্কার করা কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের দেশে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এমন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। তাদের দেশের চেয়ে বড় পণ্ডিত পৃথিবীর কোনো দেশে আবির্ভূত হয়নি এবং তাদের দেশের সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এ কারণে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় বণিকরা এসে চীনে হাজির হলো তখন চীন সরকার কঠোর আদেশ জারি করলো তাদের উপর। অত্যাচার এবং অপমানও করলো তাদের। সব রকমের অপমান সহ্য করেও চীনে পড়ে রইল বিদেশি বণিকরা। শেষ পর্যন্ত চীনের শূন্য

www.pathagar.com

আস্ফালন ধরা পড়লো বিদেশের কাছে। ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করলো চীনের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে ওই যুদ্ধটি প্রথম অহিফেনের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে চীনারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হলো নানকিংয়ের সন্ধিচুক্তি। চীনের সুবিখ্যাত হংকং বন্দর ছেড়ে দিতে হলো ইংরেজদের, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করতে হলো প্রচুর অর্থ। তাছাড়া ক্যান্টন, সাংহাই, নিংপো, অ্যাময় এবং ফুচো—এই পাঁচটি বন্দর বিদেশিদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হলো। ধুলিসাৎ হলো চীনের দম্ভ। তবুও তাদের চোখ খুললো না।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে। এই যুদ্ধই দ্বিতীয় অহিফেনের যুদ্ধ। চীনারা এবারও শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো। পুনরায় দু'জনকেই দিতে হলো যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং এবার আরও কয়েকটি শহর হাতছাড়া হয়ে গেল। অসম্মানজনক বহু শর্তও তাকে মানতে হলো। বিদেশিদের বিজ্ঞানকে অনুসরণ করতে তবুও সচেষ্ট হলো না। ফলে ধীরে ধীরে বিদেশিরা বিচ্ছিন্ন করতে লাগলো চীনের ভূভাগকে।

এই সুযোগে চরম আঘাত হানলো প্রাচ্যের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাপান। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল লুচু দ্বীপপুঞ্জ। কেবল চীন নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ সেদিন বিস্ময়ে তাকিয়েছিল জাপানের দিকে। মাত্র পঁচিশ বছর আগে যে দেশের নাম কেউ জানতো না, সে দেশের এত শক্তি কোথায় ছিল?

চীনও এত সহজে তার মনোভাব পরিবর্তন করলো না। অতীতের কঙ্কালটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলো। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সচিব 'জন হে'র মুক্তদ্বার নীতি তার জীর্ণ ও ঘুণেধরা কঙ্কালটিকে সম্পূর্ণরূপে মাটি চাপা দিল।

চোখ ফুটলো চীনাদের। প্রথম থেকেই তারা ছিল জাতীয়তাবাদী। দেশের চরম দুর্দিনে তারা ঐক্যবদ্ধ হলো এবং বিদেশিদের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের জন্য চারদিকে শুরু হলো বিদ্রোহ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলো। বহু বিদেশি এবং বিদেশি ধর্ম যাজককে হত্যা করলো বিদ্রোহীরা। ধর্মান্তরিত চীনাদেরও তারা রেহাই দিল না। নির্মমভাবে তাদেরও হত্যা করা হলো। বিদেশি দূতাবাসগুলোকেও জ্বালিয়ে দিল। এবার প্রমাদ গুণলো বিদেশি শাসকগোষ্ঠী। তারা সমবেত হয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলো। তাদের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর কাছে মুক্তি সংগ্রামীদের হার মানতে হলো। ব্যর্থ হলো চীনের প্রথম গণঅভ্যুত্থান। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও জার্মানী প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় চীন সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেলো। দ্বিতীয়ত গণজাগরণ সূচিত হওয়ায় বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ পেল চীন।

দেশের আপামর জনসাধারণ যখন জেগে ওঠে তখন তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। একদিন বিদেশের প্রচণ্ড শক্তিকেও হার মানতে হলো। বিদ্রোহের মাধ্যমে একদিন চীনের জনসাধারণ মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটালো। ১৯১১

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা 'সান ইয়াৎ সেন' গঠন করলেন প্রজাতান্ত্রিক সরকার। তারপর থেকে চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যেমন ঘন.ঘন পরিবর্তন এলো তেমনই বুঝতে পারলো, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আত্মসাৎ করা ছাড়া উপায় নেই।

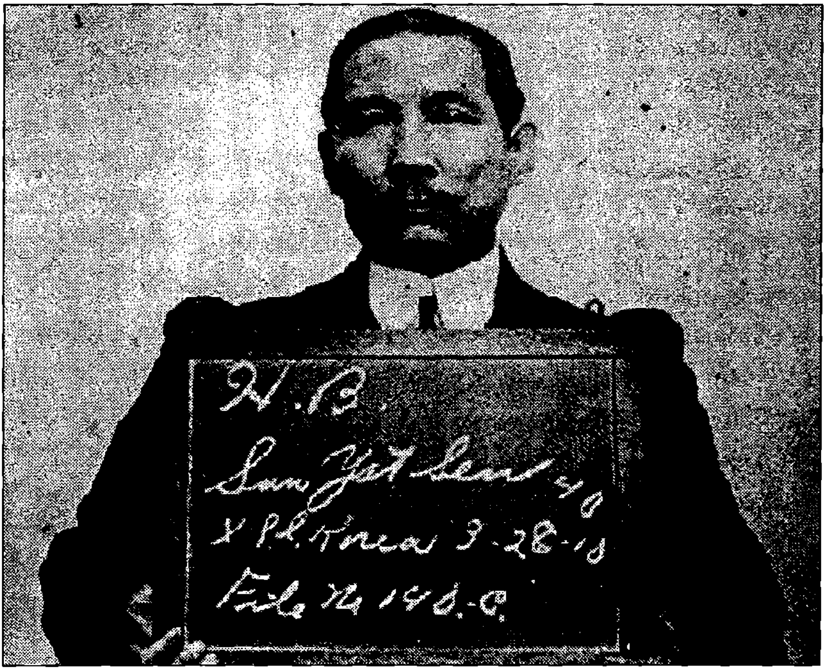

সান ইয়াৎ সেন

সান ইয়াৎ সেনের সুযোগ্য শিষ্য 'চিয়াং কাইশেক' বিদেশি ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিলেন। এতদিনে চীনে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। বিজ্ঞান শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান করা হল এবং স্থাপন করা হল বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং কলকারখানা। বিদেশি সমরনায়কদের পরিচালনায় চীনে জাতীয় সামরিক বাহিনীও গঠিত হল। দেখতে দেখতে লুপ্ত গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনলো চীন। তবে জাপান কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মতো বিজ্ঞানে এতখানি অগ্রসর সে হতে পারেনি। বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানে ওরা কিছু কিছু স্থায়ী অবদান রাখতে পেরেছে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চীনের দু'জন বিজ্ঞানী 'সুপ ডাও লেক' এবং 'চেন পিও ইয়াং' বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার।

এশিয়ায় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

প্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশকে এককালে ইউরোপের কোনো-না-কোনো দেশের অধীনে থাকতে হয়েছিল। বিলাসী ও দুর্বল রাজশক্তি ছিল এর মূল কারণ। ঊনবিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতেই প্রাচ্যে জনজাগরণ শুরু হয় এবং সে জাগরণও এসেছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসি বিদ্রোহই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চোখ খুলে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ কঠোর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি লাভ ঘটে সেই থেকেই। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়েছিল বলেই উনবিংশ শতাব্দীর আগেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। প্রাচ্য তাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নিজেদের দুর্বলতা। শেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রাচ্যেও বিপ্লব আসে। প্রথম বিপ্লব আসে জাপানে, তারপর চীনে, তারপর তুরস্ক, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে।

নতুন তুরস্কের স্রষ্টা হচ্ছেন মুস্তাফা কামাল আতার্তুক পাশা। পরাজয়, অপমান ও লাঞ্ছনা যখন তুর্কী জাতিকে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল তখনই তার আবির্ভাব। জাতির চরম অধঃপতনের দিনে তার জাতীয়তাবাদী দল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মুহম্মদকে পদচ্যুত করে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। বিদেশি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তিনি ভালোভাবে পরিচিত হয়েছিলেন বলে প্রথমে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যত্নবান হন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে কলকারখানা স্থাপন করেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলেই কামাল পাশার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। অল্পদিনে তার দেশও লাভ করলো বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদে তুরস্কের চেহারাটাও পরিবর্তিত হয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পারস্যের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অনেক আগে থেকে এখানকার খনিজ তেলের লোভে মধু-সন্ধানী ভ্রমরের মতো গুনগুন করছিল বিদেশিরা। শেষে তাদের বিষাক্ত হুলের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল পারস্যকে। অবশ্য পারস্যের স্বৈরাচারী ও দুর্বল শাসকরাই ছিল এর জন্য দায়ী। জাতীয় সংকট যখন চরমে পৌছায়, ধনুকের মতো তখন জাতির মেরুদণ্ডটা বাঁকা হয়ে পড়ে, তখনই আবির্ভাব ঘটে মহান জাতীয়তাবাদী নেতা 'রেজা শাহ পহলবী'র। নবীন তুরস্কের অনুপ্রেরণায় জাতির চরম সংকটময় মুহূর্তে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে দিলেন দীক্ষা; দুর্বল রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রের। শেষে পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে স্বদেশে বয়ে এনে নতুন করে গড়ে তুললেন পারস্যকে।

মিশরও ঘুমিয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন। বৈদেশিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ তার অতীতের ভাবমূর্তিকে বিস্মৃত করিয়ে রেখেছিল। পুনরায় দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনেন সৈয়দ জগলুল পাশা। ইংরেজের কঠিন নাগপাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করে বিজ্ঞানের সুফলকে তিনিও সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চিন্তাকে সঞ্চারিত করলেন দেশবাসীর অন্তরে। মিশরও জেগে

www.pathagar.com

উঠলো। তবুও তিনি বৃটিশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেননি দেশকে। তার মৃত্যুর পর 'নাহাস পাশা' তার আরদ্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করেন।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ভারতবর্ষ

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে আনাগোনা শুরু করলো বিদেশি বণিক সম্প্রদায়। লুব্ধ দৃষ্টিতে বারবার তাকালো ঐশ্বর্যশালী এই দেশটার দিকে। কিন্তু কেন্দ্রের প্রবল রাজশক্তির দিকে লক্ষ্য করে মনের বাসনা মনে চেপে কেবল ব্যবসাই করতে লাগলো। আর হাজার রকমের চেষ্টায় দু-একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করার অনুমতি পেল।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় ভারতবর্ষ-সিংহাসন নিয়ে শুরু হলো গোলযোগ। আর ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ভারতবর্ষ। ইংরেজরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসেছিল। এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তারা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারবর্ষের গৌরবসূর্য অস্তমিত হলো।

শুরু হলো বিদেশিদের শাসন ও শোষণ। দেশে নেমে এলো চরম দুঃসময়। আপন সভ্যতা ও কৃষ্টি সবই লুণ্ঠিত হলো বিদেশির পায়ের তলায়। পরিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষ যেন আপন মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে বরণ করলো দাসত্বকে।

ভারতবর্ষের এমনই ভাগ্য যে, সেই সুদূর অতীত থেকে এ দেশে হানা দিয়ে চলেছিল বিদেশির পর বিদেশি। পণ্ডিতদের মতে, সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকারী মানুষ এসেছিল বাইরে থেকে। আর্যদের মাতৃভূমি যে ভারতবর্ষ নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আর্যদের পরে গ্রিক, পহ্লব, শক, কুষাণ, হুন, তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি যেসব রাজবংশ ভারতবর্ষ শাসন করে গেছে, তারা কেউই ভারবর্ষীয় নয়। তবে এরা ভারতবর্ষে এসেছিল এবং স্থায়ীভাবে বসবাসও করেছিল। দেশের সম্পদ থাকতো দেশে।

রাজা রামমোহন রায়

পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, তার ঠিক পনের বছর পর এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। ভারবর্ষের নবজাগরণকে ডেকে আনলেন তিনিই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহন রায় বুঝতে পারলেন, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা না করলে এ দেশের মানুষ কিছুতেই জাগরিত হবে না। কোনোদিন ভাঙবে না তার মোহনিদ্রা।

www.pathagar.com

প্রথমেই তিনি যত্নবান হলেন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পাশ্চাত্যের উন্নত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিদ্যা প্রভৃতিকে আয়ত্ত করতে হলে একমাত্র ইংরেজি ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। তার সংস্কারমুক্ত মন আরও বুঝেছিল, হাজার হাজার বছর ধরে যেসব কুসংস্কারের বেড়াজাল ভারতবাসীকে আবদ্ধ করে ফেলেছে তাকেও না কাটালে জাতির উন্নতি কোনোকালেই হবে না। তাই ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও কুসংস্কারগুলোকে বিতাড়িত করার জন্য একা সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলেন। বিজ্ঞান তখনই ফিরে এলো ভারতবর্ষে। রামমোহনকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলো ভারবর্ষের জাগরণ।

রামমোহন সেদিন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে 'অ্যাংলো স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। সাথে ছিলেন দু'জন বিদেশি। তারা হলেন ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা বিস্তারে এরা যা করে গেছেন তা ভারবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন হিন্দু কলেজ এবং ডিরোজিওর ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়ে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে এক তরুণ সম্প্রদায়—যাদের চেষ্টায় ও যত্নে ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

এছাড়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানও কম নয়। ব্রাহ্মণ সন্তান ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও কোনো কুসংস্কার তার মনে দানা বাঁধতে পারেনি। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশে বহন করে আনার জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে যত্নবান হয়েছিলেন এবং বহু বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সময় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব না হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হতে হয়ত আরও একশো বছর কেটে যেত। শিক্ষা প্রসারের দ্বারা জাতীয় জাগরণকে ত্বরান্বিত করতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ভাবটা যেন এই, পরাধীন জাতি—তাদের কেরাণী বিদ্যাই যথেষ্ট। বিজ্ঞান ওদের জন্য নয়। ভারবর্ষের প্রথম গণঅভ্যুত্থান সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের কিছু কিছু সুযোগ দান করলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। দেশে ইতিমধ্যে রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রবর্তন হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কেন্দ্র। তবুও সে সব জায়গায় উচ্চপদে ভারতবর্ষীয়দের কোনো অধিকার ছিল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন ভারতবর্ষীয় গভীরভাবে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের একজন ছিলেন আচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি নিজেই উদ্যোগী

www.pathagar.com

হলেন বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করতে। এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আবদুল লতিফ, ভিজিয়ানা গ্রামের জমিদার-সহ অনেকে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সেদিনই উন্মুক্ত হলো ভারতবর্ষীয়দের কাছে।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন

স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন এই গবেষণাগারে গবেষণা করেই লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার। আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্য কোনো গবেষণাগারের এমন সৌভাগ্য হয়নি। রমন ছাড়া আরও কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী এই গবেষণাগারে গবেষণা করেছিলেন। তাদের মধ্যে শ্রীনিবাস কৃষ্ণান ও ড. মেঘনাদ সাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল, তার মূলে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ।

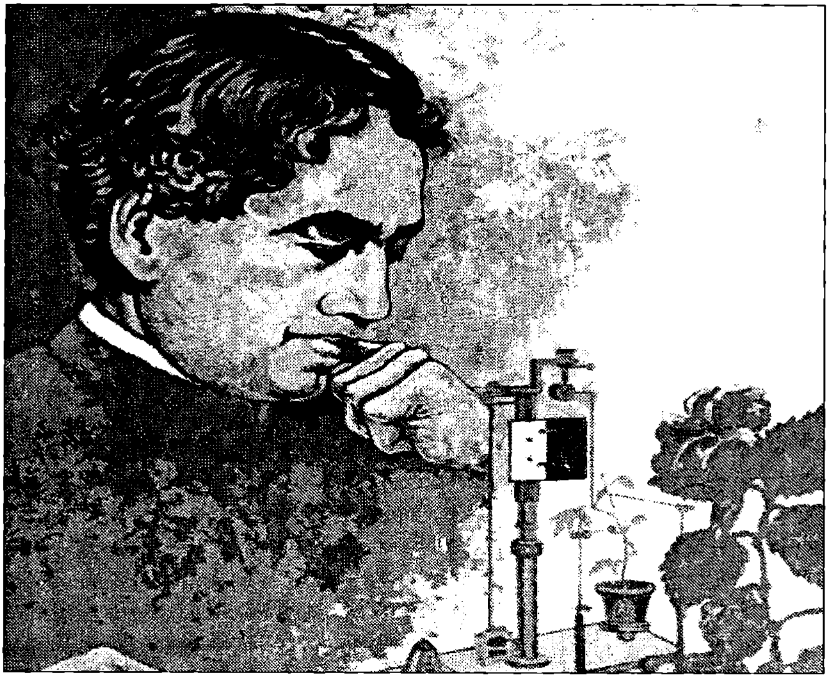
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের অবদান কোনোদিনই ভারতবর্ষের মানুষ ভুলতে পারবে না। আর সেদিন অমিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল বলেই ভারতবাসীর মনে সাহস এসেছিল। ভারতবর্ষ এতদিনে বুঝতে পেরেছিল, বিজ্ঞানরাজ্যেও এ দেশের লোক স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করতে পারে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অন্যদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদানের কোনো তুলনা হয় না। বিজ্ঞানে তার অবদান এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে তার কৃতিত্ব, তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন একদল তরুণ বিজ্ঞানীকে। ড. মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. দেবেন্দ্রমোহন বসু, ড. প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ মহান বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। বস্তুত ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রফুল্ল চন্দ্রের অবদানের কোন তুলনা হয় না।

ভারতে তৎকালীন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে আর একজনের অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশিষ্ট শিল্পপতি, টাটা আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা স্যার জামসেদজী টাটা। শিক্ষা প্রসার ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন। তারই দানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে করে ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাগারটির সম্মান অনেকখানি বর্ধিত করেছেন। জামসেদজীর আরও একটি বড় কীর্তি বোম্বের টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্কিম চালু করা। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামক প্রতিষ্ঠানটিও ভারতবর্ষের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। কলকাতায় ড. মেঘনাদ সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণাগার হিসেবে পরিচিত।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষের বুকে বিজ্ঞানের যে বীজ বপণ করেছিলেন আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের শত শত বিজ্ঞানী গবেষণারত আছেন বিভিন্ন গবেষণাগারে। তাদের মধ্যে আছেন বিশ্বের প্রথম সারির বহু বিজ্ঞানী। ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে অনগ্রসর—এ কথা আজ আর কেউ

www.pathagar.com

বলতে পারবে না। কারিগরি বিজ্ঞানে ইংল্যান্ডের পরই তার স্থান। পরমাণু বিষয়ক গবেষণায়ও সে পেছনে পড়ে নেই। বর্তমানে কারিগরি বিজ্ঞানের যে উন্নত সমারোহ মহাকাশ বিজ্ঞান, তাতেও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। বিশ্বের বিজ্ঞানে অগ্রসর যে কোনো জাতির মতো সেও মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে চলেছে একের পর এক মহাকাশযান।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ সাফল্য লাভ করেছে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী—কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারের মাধ্যমে। ভারতসন্তান ড. উয়েল্লেপ্রাগদা সুব্বা রাও (আমেরিকা প্রবাসী) অরিওমাইসিন, সুবামাইসিন প্রভৃতি বহু অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কর্তা। শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় শল্যচিকিৎসকরা বিশ্বের সমস্ত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। হৃৎপিণ্ড, চোখ, কিডনি প্রভৃতি মানবদেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গগুলোকে অধিরোপন প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে সংযোজিত করতে ভারতবর্ষীয় শল্যচিকিৎসকরা সফল। ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধেও তারা গবেষণা করেছেন। ক্যান্সার অপারেশনের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন ড. সুবোধ কুমার মিত্র।

রসায়ন বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের অবদানও বড় কম নয়। মারকিউরাস নাইট্রাইট নামক যৌগটির আবিষ্কর্তা হিসেবে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ইলেকট্রোলাইট সম্বন্ধে গবেষণা ও ফিসারট্রপস পদ্ধতিতে তরল জ্বালানি উৎপাদন ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ক্যাডমিয়াম ও দস্তার সঙ্কর প্রস্তুতিতে ড. পঞ্চানন নিয়োগী, কোলয়ডিয়েল রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদ্ভিদকোষ থেকে অ্যাস্করবিক অ্যাসিড নিষ্কাশনে ড. বীরেশচন্দ্র গুহ, জৈব যৌগের জটিল অণু সম্বন্ধে গবেষণায় টি. আর. শেষাদ্রি, ম্যাগনেটো কেমিস্ট্রিতে ভাটনগর, প্রভৃতি বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। সংশে-ষণী পদ্ধতিতে বহু জটিল জৈব যৌগকে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখেন। তেজস্ক্রিয় ধাতু সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানীরা।

পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'রমন এফেক্ট'-এর জন্য স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। সূর্যরশ্মিকে বিশে-ষণ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন ড. মেঘনাদ সাহা। আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণায় বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন ড. শিশিরকুমার মিত্র। মহাকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণায় এস. চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, মেসন কণিকা সম্বন্ধে গবেষণায় প্রশংসা অর্জন করেছেন দেবেন্দ্রমোহন বসু। আলোকবিজ্ঞানে কে. এস. কৃষ্ণান, পরমাণু বিজ্ঞানে ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বেতারতরঙ্গ ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির কুমার মিত্র ও ড. বিক্রম সারাভাই প্রভৃতির খ্যাতিও জগৎ জোড়া।

www.pathagar.com

পরিসংখ্যানে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীসের অবদান সারা বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। অঙ্কে শ্রীনিবাস রামানুজন এবং ভূতত্ত্বে ডি. এন. ওয়াদিয়ার অবদান অনস্বীকার্য।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে ভারতবর্ষ স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করেছে। উদ্ভিদ সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ছত্রাক বিজ্ঞানে ড. সহায়রাম বসু, জীবাশ্ম সম্বন্ধে গবেষণায় ড. বীরবল সাহাণী, গুপ্তাবীজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণায় পঞ্চানন মাহেশ্বরী প্রভৃতির অবদান বিজ্ঞান কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারবে না। ভারতসন্তান হরগোবিন্দ খোরানা (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) জীবকোষের গঠন নির্ভুলভাবে পাঠ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। আর উক্ত পুরস্কার লাভ করেছেন ড. সুব্রামনিয়াম চন্দ্রশেখর, ইনিও আমেরিকা প্রবাসী।

www.pathagar.com

রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

রসায়ন হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্যতম একটা শাখা। রসায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য একটা ধারাবাহিক আলোচনা করা হলো। যারা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী না, তারাও যাতে এ বইটি পড়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারে তার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগের রসায়ন

বিজ্ঞানের এ শাখাটিতে জড় পদার্থের গঠন, তার গুণ বা ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তার পরিবর্তন এবং একটি জড়ের উপর অন্য জড় পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। রসায়ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি কবে, সে কথা সঠিকভাবে বলার কোনো উপায় নেই। অভিজ্ঞজনদের মতে, বিজ্ঞানের এই শাখাটির জন্ম হয়েছিল প্রথমে। মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায়, সেই আদিযুগে, যেদিন মানুষ যাযাবরের মতো জীবনযাপন করতো সেদিন তার সম্পদ ছিল পশু। পশুর মাংস খেতো, দুধ খেতো, আবার দুধকে দইয়ে পরিণত করেও খেতো। তাছাড়া সেদিনও শিখেছিল পাকা পাকা মিষ্টি ফলের রসকে পচিয়ে মদ জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে। তাই দেখা যায়, রসায়নের উৎপত্তি সেই আদিম যুগ থেকেই।

রসায়ন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ধাতুবিদ্যা। রসায়নের প্রাচীন যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, খ্রিস্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে মানুষ তামা ও সোনাকে কাজে লাগিয়েছিল। সেদিন মানুষ ভালোভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো না কিংবা বর্ণমালারও হয়তো সৃষ্টি হয়নি। তবে সেদিনের মানুষ তামা এবং সোনাকে কোনো আকরিক থেকে নিষ্কাশন করতে পারেনি। মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যেত বলেই কাজে লাগিয়েছিল। তামাকে ব্যবহার করেছিল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে এবং সোনাকে গ্রহণ করেছিল মূল্যবান পদার্থ হিসেবে। এটাই মানব সভ্যতার প্রথম স্তর। তারপর মানুষের প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগে উত্তরণ।

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কাছে প্রাকৃতিক তামা যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, তখন বাধ্য হয়ে খোঁজ করতে হলো তামা জাতীয় পদার্থকে। তাদের অনুসন্ধিৎসার

www.pathagar.com

কাছে উন্মোচিত হলো প্রকৃতিকে। মানুষ পুনরায় লাভ করলো টিন ও রুপা। অন্যদিকে খ্রিস্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে তামার সঙ্গে টিনের মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল তামার সঙ্কর ব্রোঞ্জ।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। বিশেষত ধাতুর উপকারিতা অনুভব করায় নতুন নতুন ধাতু আবিষ্কারের দিকে মানুষের মনোনিবেশ ঘটে। সে সময় মানুষের হাত ও পা ছিল পাথরের মতো শক্ত ও সুগঠিত। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-শীত-গ্রীষ্ম দমাতে পারতো না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও মানুষ এতো কাহিল হতো না। বুকে তাদের ছিল অসীম সাহস এবং কর্তব্যে ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাদের মনোবলের কাছে পাহাড়ও দু'ফাঁক হয়ে যেতো। তাই বিশ্ব প্রকৃতি জয় করতে পেরেছিল মানুষ। মানুষ খুঁজে পেয়েছিল লোহা এবং সীসাকে।

বিজ্ঞানের গবেষণাকারীরা অনুমান করেন, খ্রিস্টজন্মের এগারশো বছর আগে প্রথম লোহা নিষ্কাশন করেছিল দোরীয় নামের এক বর্বর জাতি। তারপর লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। প্রকৃতপক্ষে ওই সময় থেকেই লৌহযুগের সূচনা।

লোহা আবিষ্কারের পরে মানুষ কিছু কিছু ধাতব আকরিককে কাজে লাগাতে শুরু করে। সেগুলোর মধ্যে হিঙ্গুল বা পারদের একটি অক্সাইড প্রধান। হিঙ্গুল ছাড়া অন্যান্য রঙ-বেরঙের আকরিকগুলোকে সংগ্রহ করে ধাতব ও মাটির পাত্রকে চিত্র-বিচিত্র করতো। গুহার গায়ে অঙ্কিত ছবিকে রঙিন করতো। সেই থেকে মানুষ নানাবিধ রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিল বলেও মনে হয়। এরপর তারা যে কাপড় বুনতে শিখলো এবং কাপড়কে রাঙাতো নানা রঙে। কাপড়কে আবার পরিষ্কার করার জন্য খুঁজে আনলো সাজিমাটিকে। আর যারা সাজিমাটি পেল না তারা বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও পাতার ছাই ব্যবহার করলো বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে। রসায়ন বিজ্ঞানে রঞ্জক পদার্থ ও ক্ষারের আবিষ্কারকে কেউ কেউ আবার খ্রিস্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে স্থান দিতে চান। তাদের মতে সে সময় কাঁচও আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, মিশরেই প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে রসায়নের চর্চা হয়েছিল। মিশর সেদিন রসায়ন শাস্ত্রকে বলতো 'কিমিয়া' আর যারা রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করতেন তাদের বলতো 'কিমিয়াবিদ'। পরবর্তীকালে আরবরা এই বিদ্যার নামকরণ করেছিল 'অ্যালকেমি'। খ্রিস্টজন্মের বহুপূর্বে চিনও রসায়ন চর্চা শুরু করেছিল।

প্রাচীন ভারতেও রসায়ন চর্চা হতো। কনাদ প্রভৃতি ঋষি পরমাণুর কথা বলে গেছেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলোতে বহু গাছগাছড়ার রস থেকে ক্ষার প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা আছে, আরও আছে বিভিন্ন ধাতু থেকে প্রাপ্ত ওষুধের কথা। সে যুগে 'রস' বলতে ভারতে গাছগাছড়ার ছাল বা পাতাকে পেষণ করে যে তরল পদার্থ পাওয়া যেত তাকে চুলায় জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরির পদ্ধতিকে বোঝাতো। খ্রিস্টিয়

www.pathagar.com

প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত মহর্ষি চরক জরা বা রোগনাশক ওষুধের নাম রেখেছিলেন রসায়ন।

পরবর্তীকালে অন্যান্য সভ্য দেশগুলোর মতো ভারতেও কিমিয়াবিদ্যা বা অ্যালকেমির প্রসার লাভ ঘটে। তারা সিঁদুরকে জ্বালিয়ে পারদ তৈরি করতেন এবং পারদ থেকে সোনা তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়েছিলেন। ভারতীয় গবেষকদের মতে, প্রাচীন ভারত নাকি পারদ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক দুটি মূল্যবান ধাতুকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে নাগার্জুন সর্বপ্রথম ওষুধের জন্য পারদ-গন্ধক ঘটিত এক ধরনের যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নামকরণ করেছিলেন কঞ্জলি। তার আবিষ্কৃত অন্যান্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে স্বর্ণসিন্দুর এবং রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ নামক পারদের দুটি যৌগ প্রধান। সেদিন নাগার্জুন ওষুধে পারদ ও অন্যান্য ধাতুকে প্রয়োগ করার নাম দিয়েছিলেন রসায়ন। তাই 'রসায়ন' কথাটি আজকের দিনের নয়। রসায়ন চরক ও নাগার্জুন ব্যবহৃত পরিভাষা। তারা দু'জন ছিলেন স্ব-স্ব কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ। চরক উদ্ভাবিত ক্বাথ বা উপ-ক্ষার প্রস্তুতপ্রণালী আজও যেমন অব্যাহত আছে, তেমনই আয়ুর্বেদে নাগার্জুন আবিষ্কৃত পারদের যৌগিকগুলোর ব্যবহার কোনোদিনই বন্ধ হবে না।

অভিজ্ঞজনদের মতে, স্বর্ণপ্রসু যে প্রাচীন গ্রিস—সেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হলেও রসায়ন সম্বন্ধে তারা একরকম নীরব ছিলেন। তারা 'হিন্দু রসায়নের' সংস্পর্শে আসার পরই রসায়ন চর্চা আরম্ভ করেন এবং সভ্যতার শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় রসায়ন চর্চা শুরু হয়।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি মূল পদার্থে বিভক্ত করেছিলেন। তাদের মতে, পঞ্চভূতে গড়া এই পৃথিবী। এমনকি পৃথিবীর জীব এবং উদ্ভিদ জগৎও এর বাইরে নয়। পরবর্তীকালে গ্রিক রসায়নবিদগণ মূল পদার্থরূপে মাটি, পানি, বায়ু ও আগুনকে গণ্য করেছিলেন। কণাদ ও ডিমোক্রিটাস মনে করতেন, পদার্থের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম কণা—যাকে ভাঙা যায় না এবং গড়াও যায় না, তাকেই বলা হয় পরমাণু।

মধ্যযুগের রসায়ন

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মধ্যযুগে একদল রসায়নবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের বলা হয় অ্যালকেমিস্ট বা কিমিয়াবিদ। কারও কারও মতে, এরা সবাই ছিলেন তান্ত্রিক সাধু। এদের কাজ ছিল বিভিন্ন গাছগাছড়ার ছাল-পাতা এবং ধাতু ও ধাতব আকরিককে নিয়ে গবেষণা করা। উদ্দেশ্য ছিল, লোহা ও অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার উপায় আবিষ্কার।

www.pathagar.com

আর একটি প্রচেষ্টাও ছিল তাদের। তারা চেয়েছিলেন এমন একটি পদার্থ তৈরি করতে, যা খেলে মানুষ অমর হয়ে যাবে। এক কথায় 'অমৃত' আবিষ্কার। কিন্তু পরশমণি কিংবা অমৃত, দুটির কোনোটিই তারা আবিষ্কার করতে পারেন নি। এ থেকে বোঝা যায়, কল্পনার বস্তু চিরদিন কল্পনার মধ্যেই থেকে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাদের কল্পনা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, বিজ্ঞানকে নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, তাদের সেই কল্পনা রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রাচীন স্তর থেকে একেবারে আধুনিক স্তরে টেনে এনেছে।

অমৃত এবং পরশমণির সন্ধান করতে গিয়ে তারা সেদিনই প্রস্তুত করেছিলেন ফ্লাক্স, বেসিন, ক্রুশিবল, বকযন্ত্র, ওয়াটার বাথ, স্যান্ডবাথ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি। তাছাড়া চোলাইকরণ, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিও তারা আবিষ্কার করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে আমরা আরও লাভ করেছি সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড, কোহল, ভিনেগার প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী। তাই মধ্যযুগে রসায়ন বিজ্ঞানে অ্যালকেমিস্টদের অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান

ইউরোপে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্ম। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর আগে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের অনেকগুলো দেশে কিমিয়াবিদ্যার প্রসার ঘটেছিল। কথিত আছে, 'আর্নল্ড অব ভিল্লোনোভা' নাগার্জুনের মকরধ্বজের মতো সর্বরোগের এক ধরনের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে 'রেমন্ডগুলো' এবং 'বেকন' নামে দু'জন কিমিয়াবিদ পরশপাথর তৈরি করেছিলেন বলে শোনা যায়। তারা যে জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটিকে পারদে ফেলে দিলে স্বর্ণরেণু উৎপন্ন হতো। কিন্তু আসল জিনিসটি সম্বন্ধে কারও কিছু জানা নেই।

রবার্ট বয়েল

রসায়নবিদ্যা নিয়ে আধুনিকভাবে গবেষণা আরম্ভ করেন রবার্ট বয়েল। তিনিই সর্বপ্রথম গ্যাসের ভৌতধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষার প্রয়োগ করেন এবং সেই থেকে রসায়নের বিকাশ হয়। তারপরই বস্তুর উপাদান, ধর্ম এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যাকেই রসায়ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। সর্বাধুনিক কালে রসায়ন বিজ্ঞান বলতে বোঝায়, যে বিজ্ঞান পদার্থের উপাদান ও গঠন, তাপ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বস্তুর উপাদানগত পরিবর্তন এবং দুই বা ততোধিক পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে।

www.pathagar.com

এ সময় রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রধান দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়। সেই বিভাগ দুটি হলো, অজৈব রসায়ন ও জৈব রসায়ন। বিভিন্ন জড় বস্তুর উপাদান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান অজৈব রসায়নের এবং জীবজন্তু ও গাছপালা থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংক্রান্ত আলোচনা জৈব রসায়নের অন্তর্ভুক্ত। খনি থেকে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জৈব রসায়নের এবং ধাতু ও ধাতব আকরিকগুলো অজৈব রসায়নের আওতায় পড়ে।

অন্যদিকে অজৈব রসায়নকে অকার্বনিক রসায়ন এবং জৈব রসায়নকে কার্বনিক রসায়নও বলা হয়। জীব ও উদ্ভিদের মূল উপাদান কার্বন বলেই এই ধরনের নামকরণ। রসায়নের প্রধান এই দুটি বিভাগ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিভাগ আছে। সেগুলোর মধ্যে ভৌত রসায়ন, বৈশে-ষিক রসায়ন ও ফলিত রসায়নই প্রধান। রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান এই দুই বিজ্ঞানের সীমারেখায় পড়ে এসব তত্ত্ব ভৌত রসায়নের অন্তর্গত। বৈশে-ষিক রসায়নের বিষয়বস্তু হলো, বিভিন্ন ধাতুর অবস্থান নির্ণয়, পৃথকীকরণ প্রভৃতি। আর শিল্প উৎপাদনজনিত যে রসায়ন তাকেই বলা হয় ফলিত রসায়ন।

রসায়নের কয়েকটি ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ

জৈব পদার্থ

প্রাচীনকালের মানুষ কতগুলো জৈব যৌগিক পদার্থকে ব্যবহার করতো। সেদিন তারাও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো তেল, ঘি, মাখনকে। চুল ও দেহের বিভিন্ন অংশে সুগন্ধি লেপন করে প্রসাধনও সম্পন্ন করতো। সুগন্ধি পদার্থকে প্রস্তুত করতে সেসময় তারা রসায়নের দ্বারস্থ হয়নি। ফুলের রেণু, চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসকে তারা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতো। জীবদেহ ও উদ্ভিদ থেকে এগুলো সংগৃহীত হতো বলে সে-সময়ই এসব বস্তুর নামকরণ হয়েছিল জৈব পদার্থ। আর অতীতের মানুষ লবণ, ফিটকিরি, চুন, অ্যাসিড, ক্ষার প্রভৃতিকে জড়বস্তু থেকে লাভ করতো বলে নাম দিয়েছিল অজৈব পদার্থ।

জৈব পদার্থগুলো যে প্রকৃতিজাত, অনেক দিন পর্যন্ত এমন ধারণা ছিল মানুষের। এগুলোকে মানুষ কোনোমতেই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে না এবং কোনোকালে পারবেও না। কলা, আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি পাকলে সুগন্ধি ছড়ায়, প্রস্ফুটিত ফুল, লেবু, ইউক্যালিপটাস গাছের মনমাতানো গন্ধ, জীবদেহের স্রাব, রক্ত প্রভৃতিকে কী মানুষ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত ধারণার মধ্যে এলো পরিবর্তন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভোইসিয়ারই প্রথম জৈব যৌগকে বিশে-ষণ করতে সমর্থ হলেন। তিনি জানালেন, জৈব যৌগের উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন নামক দুটি মৌলিক পদার্থ অবশ্য বিদ্যমান।

www.pathagar.com

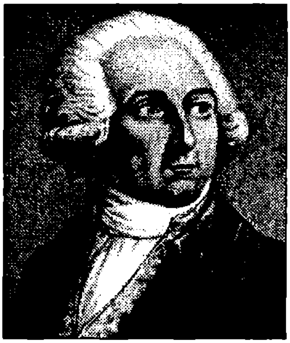

ল্যাভোসিয়ারই

ল্যাভোসিয়ারের এই গবেষণা একাধিক বিজ্ঞানীকে উৎসাহিত করে। তারাও এবার এগিয়ে এলেন জৈব যৌগকে বিশে-ষণ করতে। শেষে তারা জানতে পারলেন, জৈব যৌগে কার্বন ও হাইড্রোজেন ছাড়াও নাইট্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে। তারা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে আরও ধরা পড়লো, পৃথিবীতে কার্বন ও হাইড্রোজেন এবং কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত জৈব যৌগের সংখ্যাই সর্বাধিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, প্রাণশক্তি ব্যতীত জৈব যৌগ প্রস্তুত হতে পারে না।

জৈব রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় সময় হচ্ছে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ। উইলার নামে ১৮ বছরের এক তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণাগারে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ একদিন লাভ করলেন 'ইউরিয়া' নামক একটি জৈব যৌগ। এই ইউরিয়াকে পাওয়া যায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রস্রাবে। অথচ উইলার লাভ করলেন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামক একটি অজৈব বস্তুকে উত্তপ্ত করে। প্রথমে তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, জৈব যৌগকেও মানুষ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজে স্বীকার করলেন না উইলারের কথা। সে সময়ের বিজ্ঞানীদের জোরালো যুক্তি ছিল, অ্যামোনিয়াম সায়ানেট অজৈব বস্তু হলেও উইলার অ্যামোনিয়াম সায়ানেটের উপাদান অ্যামোনিয়া ও সায়ানিক অ্যাসিড গ্রহণ করেছিলেন প্রাণিজগৎ থেকে। উইলার হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও উইলারের পরীক্ষা প্রভাবিত করেছিল অনেককেই। এবার তারা চেষ্টা করলেন, সম্পূর্ণ অজৈব যৌগ থেকে জৈব পদার্থ তৈরি করতে।

প্রথমে কৃতকার্য হলেন, 'কোলবে' নামের এক বিজ্ঞানী। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সংশে-ষণী পদ্ধতিতে তিনি তৈরি করে ফেললেন অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তারপর বার্থলে কার্বন ও হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে তৈরি করলেন মিথেন গ্যাস। কোনো কোনো বিজ্ঞানী সন্ধান ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থকে যোগ করেও সুফল লাভ করলেন। তখনই পরিবর্তিত হলো প্রাচীন ধারণা। মানুষের বিশ্বাস জন্মালো, প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতীত জৈব যৌগগুলোকে প্রস্তুত করা সম্ভব।

জৈব রসায়ন সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, জৈব যৌগের আণবিক সঙ্কেত অজৈব যৌগের মতো নির্দিষ্ট নয়। একই আণবিক সঙ্কেত দ্বারা বহু সংখ্যক জৈব যৌগকে

www.pathagar.com

প্রকাশ করা যায়। যেমন C_2H_6O সঙ্কেত দ্বারা দুটি, C_6H_{14} সঙ্কেত দ্বারা ৫টি, $C_{10}H_{13}O_8N$ সঙ্কেত দ্বারা ১৩৫টি যৌগকে নির্দেশ করে ইত্যাদি।

দেখা গেল কার্বন পরমাণুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহত ও জটিল অণু গঠন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে বৃহত ও জটিল অণুগুলোকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এখনো গবেষণা অব্যাহত আছে। বর্তমান শতাব্দীতে কৃত্রিমভাবে বহু জটিল অণুর সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন। কৃত্রিম রেশম, সেলুলয়েড, প্লাস্টিক, টেরিলিন, নাইলন প্রভৃতি বস্তুর আবিষ্কার ঐ জটিল অণু সম্বন্ধে গবেষণার পরোক্ষ ফল। তাছাড়া মানুষ এখন কুইনাইন, নীলরঙ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, বহু ওষুধপত্র উদ্ভিদের কাছ থেকে গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করছে। এখন দেখা গেছে, সব রকমের জৈব যৌগকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব—এমনকি প্রোটিনকেও কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সম্ভব।

জৈব যৌগ সম্বন্ধে গবেষণা চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যুগান্তর উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে। পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক জৈব রসায়নেরই অবদান। তাই বলা যেতে পারে, জৈব রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণা মানুষের অকাল মৃত্যুকেও রুদ্ধ করেছে। কৃত্রিমভাবে বিজ্ঞানীরা এমন সব খাদ্যও প্রস্তুত করেছেন—যার সামান্য অংশগ্রহণ করলেই শরীরে প্রয়োজনীয় আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভিটামিন সরবরাহ করতে পারে। অধিক খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রাণের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মানব জীবকোষের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন কতগুলো জটিল জৈব যৌগকে। সেগুলোকে নির্ভুলভাবে পাঠ করে জেনে নিয়েছেন জীবনের রহস্য। সেই জৈব যৌগগুলোর অধিকাংশকে আবার কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতেও সক্ষম হয়েছেন। তাই আজ প্রাণি-বিজ্ঞানের সঙ্গে জৈব রসায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। মানুষ এখন কেবলমাত্র জীবকোষ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে না—গবেষণাগারে একটি টেস্টটিউব বেবিকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ

তৎকালীন কিমিয়াবিদরা পরশপাথর খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সোনা, রূপা, তামা, টিন, লোহা, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থগুলোকে নিয়ে দীর্ঘদিন তারা গবেষণা করেছিলেন বলে সে সময়ই তারা বুঝতে পেরেছিলেন, এই পদার্থগুলোকে ভাঙলে বা বিশে-ষণ করলে কেবল ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না। তাই ওই পদার্থগুলোর তখনই তারা নামকরণ করেছিলেন মূল বা মৌলিক পদার্থ। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা খুব অল্প। এদের দুটি, তিনটি বা তারও অধিক সংখ্যায় যুক্ত হয়ে অসংখ্য বস্তু তৈরি করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে বিশাল বস্তুজগৎ—তার মূলে আছে মাত্র কয়েকটি মূল পদার্থ।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের ধারণা ওই সময়ের কিমিয়াবিদরা প্রদান করেছিলেন। তবে তাদের আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেশি নয়। আমাদের পরিচিত কতগুলো ধাতুকেই তারা আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানে ১০৫-এর মতো মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন। এছাড়া হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, জেনন-সহ কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমেত মোট ১১টি গ্যাসীয় পদার্থ। এগুলোর মধ্যে সবগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। অনেকগুলো বর্তমান শতাব্দীতে প্রস্তুত করা হয়েছে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে।

যৌগিক পদার্থ এবং মিশ্র পদার্থ সম্বন্ধে ধারণাও গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টদের মধ্যে। সেকালে তারা ধরে নিয়েছিলেন, দুই বা ততোধিক পদার্থ একে অপরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিশে গেলেও যদি তাদের স্ব-স্ব ধর্ম বজায় থাকে তাহলে তাকে বলা হয় মিশ্র পদার্থ। ওরা মিশে গিয়ে যদি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট কোনো পদার্থ উৎপন্ন করে তাহলে তাকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ।

দহন ও অক্সিজেন

প্রাচীনকাল থেকে পদার্থের দহন সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেসব ধারণা হাস্যাকর মনে হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে প্রাচীন ভুল-তত্ত্বের অবদানও কম না। কারণ, বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি তত্ত্বকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে একাধিক মূল্যবান তথ্য। বিশাল রোম সাম্রাজ্য যেমন একদিনে গড়ে ওঠেনি, তেমনি আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সুউচ্চ চূড়াটিও একদিনে অথবা এক-আধ বছরে গঠিত হয়নি। তার মূলে রয়েছে হাজার হাজার বছরের বহু মানুষের শ্রম, উদ্ভাবিত বহু তথ্য। সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ভুল তথ্য ঢুকে গিয়েছিল। তবে যুক্তি ছিল। তা না হলে সেটি বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আখ্যা লাভ করতো না।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের এমন কিছু কিছু সত্য উদঘাটিত হয়েছে, যে তথ্যগুলোর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কতগুলো ভুল সিদ্ধান্তের উপর। বস্তুর দহন সংক্রান্ত তথ্যগুলো তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের কোনো শাখাই যখন পরিপূর্ণ হয়নি এবং মানুষ যখন বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কেবল মনগড়া কাহিনীকে দাঁড় করে ব্যাখ্যা করতে চাইতো। দহন সম্বন্ধে অ্যারিস্টোটলের মত ছিল, প্রত্যেক দাহ্য বস্তুর উপাদান ছাই ও আগুন। দহনের ফলে আগুনটা বেরিয়ে আসে আর অবশিষ্টরূপে পড়ে থাকে ছাই। অ্যারিস্টোটলের এই মতবাদই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল।

www.pathagar.com

অবশেষে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'জন বেকর' নামে এক বিজ্ঞানী আগুন সম্বন্ধে একটা নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। তিনি বললেন, দাহ্য বস্তুর মধ্যে এমন এক উপাদান আছে, যা বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।

বেকরের এই মতবাদকে সমর্থন করে 'স্টাল' নামে এক বিজ্ঞানী ফোজিস্টন মতবাদ প্রচার করলেন। তিনি বললেন, দাহ্য বস্তুর মধ্যে যে উপাদানটি জ্বলতে সাহায্য করে সেটির নাম ফোজিস্টন। ফোজিস্টনকে দেখা যায় না, এমনকি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবও করা যায় না। অগ্নিশিখার আকারে যখন বেরিয়ে আসে তখনই আমরা দেখতে পাই। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ফোজিস্টনের পরিমাণ সব পদার্থে সমান থাকে না। কয়লা, তেল প্রভৃতি দাহ্য বস্তুতে এর পরিমাণ সর্বাধিক। সোনা, রুপা, লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে এর পরিমাণ নিতান্তই অল্প। কাঠকে পুড়িয়ে ফেললে যে অবশিষ্ট পড়ে থাকে সেটি ফোজিস্টনহীন বস্তু বা ছাই। ফোজিস্টন অপসারিত হওয়ার পর বস্তুর ওজন সবক্ষেত্রেই কম।

প্রায় দেড়শ বছর ধরে ফোজিস্টন-ভূত বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে ভর করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ারের প্রচেষ্টায় ঐ ভূত নেমে যায়। তিনি টিন ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে বাতাসে পুড়িয়ে যে ছাই পেয়েছিলেন তাকে ওজন করে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই দেখেছিলেন মূলবস্তু অপেক্ষা ছাইয়ের ওজন বেশি।

ল্যাভোসিয়ারের দেখাদেখি শীলে এবং প্রিস্টলিও পরীক্ষাগুলো করেছিলেন। তারাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন, বায়ুতে কোনো পদার্থের দহনের সময় বায়ুর অক্সিজেন ঐ পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। ধাতুতে যুক্ত হলে ধাতব অক্সাইড গঠিত হয় বলে ওজন বেড়ে যায় এবং কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলে বস্তুতে অবস্থিত কার্বন ও হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নামক দুটি অদৃশ্য গ্যাস উৎপন্ন করে। ঐ গ্যাসগুলো উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। ফলে যে ছাই পড়ে থাকে তার ওজন কম হয়। ল্যাভোসিয়ার, শীলে এবং প্রিস্টলির দহন সম্বন্ধে প্রদত্ত তত্ত্ব এখনও স্বীকার করা হয়।

পরমাণু

গ্রিক পণ্ডিত ডেমোক্রিটাস ও ভারতীয় মনীষী কণাদ সর্বপ্রথম বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর অন্তিম কণাকে পরমাণু নাম দিয়েছিলেন। তবে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী জন ডালটনই দার্শনিকদের পরমাণুবাদকে সংশোধিত করে সুস্পষ্ট রূপ দান করেন। তিনি যে মতবাদটি প্রচার করেন সেই মতবাদটি বিজ্ঞানে 'পরমাণুবাদ' নামে বিখ্যাত। পরমাণুবাদ তত্ত্ব মতে, বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ কোনো পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এমন একটি

www.pathagar.com

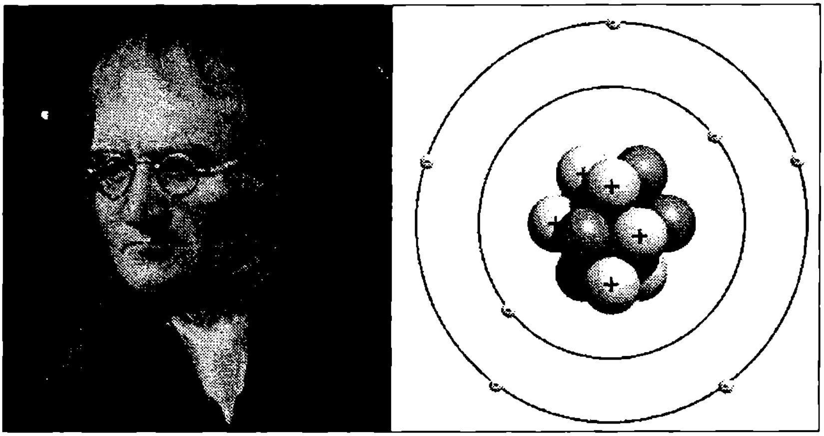

জন ডালটন ও তাঁর পরমাণু মডেল

অবস্থায় আসবে যখন আর তাকে ভাঙা যাবে না। পদার্থের সেই অন্তিম কণাকে ডালটন নাম দিয়েছিলেন পরমাণু। তিনি আরও বলেছিলেন, প্রতিটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে এক এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে বিভিন্ন। মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো বিভিন্ন অনুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে।

ডালটনের পরমাণুর এ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরমাণুবাদ পদার্থ জগতের সব তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখনই প্রবর্তিত হয় অণু বা অণুবাদ।

অ্যামদেও অ্যাভোগেড্রো

অণুবাদের যিনি স্রষ্টা, তিনি ইতালির প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী অ্যামদেও অ্যাভোগেড্রো। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম উল্লেখ করেন, মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অন্তিম কণা পরমাণু নয়—অণু। পদার্থের গুণ বা ধর্ম কেবলমাত্র অণুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। অণুকে ভাঙলেই পাওয়া যাবে পরমাণু। এই অবস্থায় মূল পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে না।

এ সময় ডালটন ও অ্যাভোগেড্রোর পরমাণুবাদ ও অণুবাদ দুটিকেই বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানীরা ক্যাথড-রশ্মি[৩] নিয়ে গবেষণাকালে অদ্ভুত সব ঘটনা লক্ষ্য করেন। তারপর বেকারেল, কুরি দম্পতি প্রভৃতির গবেষণার ফলে আত্মপ্রকাশ করে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি কতগুলো তেজস্ক্রিয় ধাতু।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, আলো অথবা অন্ধকারে সর্বাবস্থায় এদের দেহ থেকে এক ধরনের সাধারণ ধাতু সীসায় রূপান্তরিত হয়। এতদিনে বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে নিয়ে পুনরায় ভাবতে শুরু করেন এবং পুরোদমে আরম্ভ হয় গবেষণা। সেই গবেষণা থেকে রাদারফোর্ড সন্ধান পেলেন ধনাত্মক কণার। জে. জে. টমসন আবিষ্কার করলেন ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন। জেমস চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন নিষ্ক্রিয় কণা নিউট্রন। রাদারফোর্ডসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে এতদিনে প্রকাশ পেল, পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। তার মধ্যস্থলে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা এবং নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে আরও প্রকাশ পেয়েছে বহু তত্ত্ব। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা মৌলিক কণিকাও। পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা এখনও অব্যাহত আছে—আরও তথ্য জানার জন্য।

www.pathagar.com

রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

সোনা ও তামা	: খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দেরও আগে।
টিন, ব্রোঞ্জ ও রুপা	: খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের পরে।
লোহা	: খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দের দিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়।
সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার	: প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কার। হোমারের বর্ণণায় গন্ধকের উল্লেখ আছে। সেকালেও সালফারের ধোঁয়া জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ঐ ধোঁয়াটিই সালফার ডাই-অক্সাইড।
সালফিউরিক অ্যাসিড	: অ্যালকেমিস্টরা ফেরাস সালফেট নামক আকরিকটিকে পাতিত করে প্রথমে উক্ত অ্যাসিডটি তৈরি করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। যেহেতু ফেরাস সালফেটের প্রাচীন নাম গ্রীন ভিট্রিয়ল। তাই অ্যাসিডটিকে তখন বলা হতো ভিট্রিয়লের তেল। ঐ একই পদ্ধতিতে আরবের রসায়ন বিজ্ঞানী জাবির ইবন হাইয়ানও অ্যাসিডটিকে তৈরি করেছিলেন।
হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড	: মধ্যযুগে কিমিয়াবিদদের অবদান।
পারদ	: আবিষ্কর্তা মধ্যযুগের কিমিয়াবিদরা। পারদের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানী নাগার্জ্জুনের নাম জড়িত।
বোরিক এসিড	: সোনা, হীরক বা ফেরাস সালফেট ও ফিটকিরিকে একসঙ্গে পাতিত করে আরবীয় বিজ্ঞানী জাবির ইবন হাইয়ান প্রথম প্রস্তুত করেছিলেন।

www.pathagar.com

কাঁচ	: খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও আগের আবিষ্কার।
কাগজ	: ১০৫ খ্রিস্টাব্দে সাইলুন নামে এক চীনা প্রযুক্তিবিদ আবিষ্কার করেন।
বারুদ	: খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চিনারা আবিষ্কার করে।
পোরসিলিন	: ৬২০ খ্রিস্টাব্দে চীনে আবিষ্কৃত হয়।
অ্যামোনিয়া	: অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মানুষের প্রাচীনকাল থেকে পরিচয়। মধ্যযুগে উটের মল পুড়িয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হতো।
ইস্পাত	: খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে কোনো এক সময় ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল।
উপক্ষার প্রস্তুতি	: খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে ভারতের আবিষ্কার।
ঢালাই লোহা	: খ্রিস্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চীনে আবিষ্কৃত হয়।
পারদ-গন্ধক ঘটিত যৌগ	: খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে ভারতীয় বিজ্ঞানী নাগার্জুন আবিষ্কার করেন।

রসায়ন বিজ্ঞানের কতগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবিষ্কার

১৬৩০	: ভন হেলমন্ট কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড আবিষ্কৃত হয়েছে।
১৬৪৮	: জার্মান বিজ্ঞানী গ-বার প্রথম সালফিউরিক অ্যাসিড ও লবণকে একত্রে উত্তপ্ত করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করেন। অবশ্য উক্ত নামকরণটি বিজ্ঞানী ডেভির।
১৬৫০	: আয়ারল্যান্ডের বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল গ্যাসসূত্র আবিষ্কার করেন।
১৬৬৪	: রবার্ট বয়েল অ্যাসিডের ধর্ম বিশে-ষণ করেন।
১৬৬৬	: লেমারি নামে এক বিজ্ঞানী সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করেন।
১৬৬৯	: জার্মান বিজ্ঞানী ব্রান্ড ফসফরাস আবিষ্কার করেন।
১৬৮০	: রবার্ট বয়েল বৃহদায়তন পদ্ধতিতে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।
১৬৯৫	: নেথানিয়েল গ্রু ইপসামের খনিজ পানি থেকে ইপসামা সল্ট আবিষ্কার করেন।
১৭০৭	: বিজ্ঞানী স্টিফেন রসায়নাগারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করেন।

www.pathagar.com

১৭৫৪ : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জোসেফ ব-াক কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন।

১৭৬৬ : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিস দস্তা ও পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে রসায়নাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করেন।

১৭৬৯ : ইথিলিন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৭৭১ : সুইডেনের বিজ্ঞানী শীলে হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন।

১৭৭২ : (১) শীলে মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে অক্সিজেন প্রস্তুত করেন।

: (২) প্রিস্টলি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৭৭৪ : (১) ফ্রান্সের বিজ্ঞানী অ্যান্টনি লরেন্স ল্যাভোসিয়ে বস্তুর নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করেন।

: (২) শীলে ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৭৭৭ : (১) ল্যাভোয়সিয়ে সালফারের ধর্ম সম্বন্ধে আভাস দেন এবং প্রমাণ করেন বায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে অক্সিজেন একটি।

: (২) শীলে হাড় থেকে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।

১৭৮১ : ক্যাভেন্ডিস প্রমাণ করেন যে, পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ।

১৭৮৫ : ফ্রান্সের বিজ্ঞানী বার্থোলে প্রমাণ করেন যে, অ্যামোনিয়া গ্যাসটি নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ।

১৭৯২ : (১) ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী চার্লস হোপ স্ট্রনসিয়াম আবিষ্কার করেন।

: (২) জার্মান বিজ্ঞানী রিখটার মিথোনুপাত সূত্র আবিষ্কার করেন।

১৭৯৯ : ফ্রান্সের বিজ্ঞানী প্রাউস্ট স্থিরানুপাত সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮০৩ : (১) ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন ডালটন দ্বারা গুণানুপাত সূত্র আবিষ্কৃত হয়।

: (২) ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি ক্যালসিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮০৭ : ডেভি বিগলিত কস্টিক সোডাকে তড়িৎদ্বার বিশিষ্ট করে সোডিয়াম নামক ধাতুটি আবিষ্কার করেন।

১৮০৮ : (১) ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জোসেফ লুই গে-লুসাক গ্যাস আয়তনিক সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন।

হামফ্রে ডেভি

www.pathagar.com

: (২) ডেভি অবিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত করেন।

: (৩) থেনার্ড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড প্রস্তুত করেন।

১৮১০ : (১) ডেভি ক্লোরিন গ্যাসের 'ক্লোরিন' নামকরণ করেন।

: (২) হোলকার যে পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন সেই পদ্ধতির অনুকরণে লেড চেম্বার পদ্ধতি হয়েছে।

১৮১১ : ইতালির বিজ্ঞানী অ্যামদেও অ্যাভোগেড্রো অণুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮১২ : ফ্রান্সের বিজ্ঞানী কুর্তোয়াঁ আয়োডিন আবিষ্কার করেন।

১৮১৮ : ডেভি পটাসিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮২৫ : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জনি ওয়াকার দেয়াশলাই আবিষ্কার করেন।

১৮২৬ : ব্যালার্ড ব্রোমিন আবিষ্কার করেন।

১৮২৮ : জার্মান বিজ্ঞানী উইলার কর্তৃক কৃত্রিমভাবে ইউরিয়া আবিষ্কৃত হয়।

১৮২৯ : উইলার তড়িৎ বিশে-ষণ পদ্ধতিতে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ : ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ বিশে-ষণের সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

১৮৩৬ : ডেভি রসায়নাগারে অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৮৩৯ : আমেরিকান বিজ্ঞানী জি. গুডইয়ার ভলকানাইজড রবার প্রস্তুত করেন।

১৮৪৫ : ইংল্যান্ডের প্রযুক্তিবিদ অ্যাসপডিন পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রস্তুত করেন।

১৮৪৮ : আয়ারল্যান্ডের বিজ্ঞানী টমসন তাপমাত্রার পরম স্কেল প্রবর্তন করেন।

১৮৫৬ : স্যার এইচ বেসিমার (ইংল্যান্ড) বেসিমার কনভাটার আবিষ্কার করেন।

১৮৫৮ : স্ট্যানি সলাও ক্যানিজারো (ইতালি) পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৮৬৬ : আলফ্রেড বার্নাড নোবেল (সুইডিশ) ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

১৮৬৯ : ডিমিট্রি ইভানোভিচ মেন্ডালিয়ড (রাশিয়া) পর্যায়সারণীর প্রস্তাব করেন।

১৮৭০ : জোহন ডাব- হেয়াট (আমেরিকা) সেলুলয়েড আবিষ্কার করেন।

১৮৮৩ : সোয়েন (ইংল্যান্ড) রেয়ন আবিষ্কার করেন।

১৮৮৬ : (১) চার্লস মার্টিন হল (আমেরিকা) অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতির আবিষ্কার করেন।

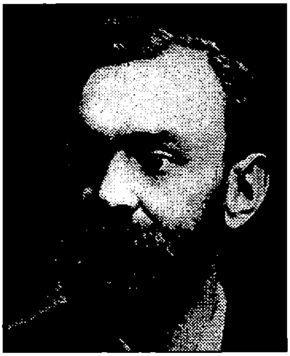

আলফ্রেড বার্নাড নোবেল

www.pathagar.com

: (২) হেনরি ময়সাঁ (ফ্রান্স) ফ্লোরিন প্রস্তুত করেন। এ জন্য ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

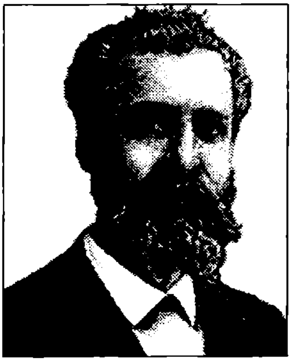

হেনরি ময়সাঁ

১৮৮৭ : আর হেনিয়াস (সুইডিশ) তড়িৎ বিয়োজনবাদ প্রকাশ করেন। এ জন্য তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৩ : হফম্যান (অস্ট্রিয়া) কোক ওভেন আবিষ্কার করেন।

১৮৯৫ : পানির তৌলিক গঠন নির্ণয় করেন মোরলে।

১৮৯৬ : অ্যান্টনি হেনরি বেকারেল (ফ্রান্স) ইউরেনিয়াম লবণের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

১৮৯৮ : (১) র‍্যামজের দ্বারা কতগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কৃত হয়।

: (২) পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরি।

১৯০১ : কেমিক্যাল ডায়নামিকসের সূত্র আবিষ্কারের জন্য জে.এইচ. ভন্টহফ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (নেদারল্যান্ড)

১৯০২ : সুগার ও পিউরিন আবিষ্কারের জন্য এমিল ফিসার নোবেল পুরস্কার পান। (জার্মানি)।

১৯০৩ : তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি বিকিরণের সময় যে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়, এই সত্যটি প্রমাণ করেন উইলিয়াম র‍্যামজে ও ফ্রেডরিক সোডি (উভয়ে ইংল্যান্ডের নাগরিক)।

১৯০৪ : র‍্যামজেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

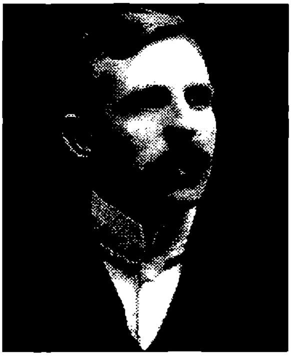

আর্নেস্ট রাদারফোর্ড

১৯০৭ : (১) সেল ফ্রি ফার্মেনটেশন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বুকনার (জার্মানি) নোবেল জয়ী হন।

: (২) এল. এইচ. ব্যাকল্যান্ড (আমেরিকা) ব্যাকেলাইট আবিষ্কার করেন।

১৯০৮ : তেজস্ক্রিয় পদার্থের গুণাবলী আবিষ্কারের জন্য আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (ইংল্যান্ড) নোবেল পুরস্কার পান।

www.pathagar.com

১৯১০ : ড. রবার্ট (জার্মানি) পানি মৃদুকরণের পারমুটিট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৯১৩ : (১) ফ্রেডরিক সোডি (ইংরেজ) 'গ্রুপ ডিসপ্লেসমেন্ট ল' নামক সূত্রটি প্রবর্তন করেন।

: (২) হেনরিখ ডেভিড নীলস বোর (ডেনমার্ক) পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করেন।

১৯১৪ : মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয় করেন মোসলে (ইংল্যান্ড)।

১৯১৫ : বোরের পারমাণবিক মডেলের উন্নত রূপ দেন সোমারফিল্ড (জার্মানি)।

১৯১৮ : অ্যামোনিয়ার বাণিজ্যিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ফ্রিট্জ হেবার (জার্মানি) নোবেল পুরস্কার পান।

১৯১৯ : সস্থানিক মৌলের সঠিক ভর নির্ণয় করেন উইলিয়াম অ্যাসটন (ইংল্যান্ড)।

১৯২২ : মাস স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রিচার্ড জিগমন্ডি (জার্মানি)।

১৯২৮ : গাইগার ম্যূলর কাউন্টার নামক কণাসন্ধানী যন্ত্র আবিষ্কার করেন হানস গাইগার ও ডব্-ম্যূলর (উভয়ে জার্মান)।

১৯৩০ : নাইলন আবিষ্কার করেন ক্যারুর্থাস (আমেরিকা)।

১৯৩১ : ভারি পানি ও ভারি হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন হ্যারল্ড কেটনউরি (আমেরিকা)।

১৯৩১ : নিউট্রন আবিষ্কার করেন জেমস চ্যাডউইক (ইংল্যান্ড)।

১৯৩৪ : ফ্রেড্ররিক জোলিও ও আইরিন জোলিও কুরি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (ফ্রান্স)।

১৯৩৫ : মেসন কণিকা আবিষ্কার করেন ইউকাউয়া (জাপান)।

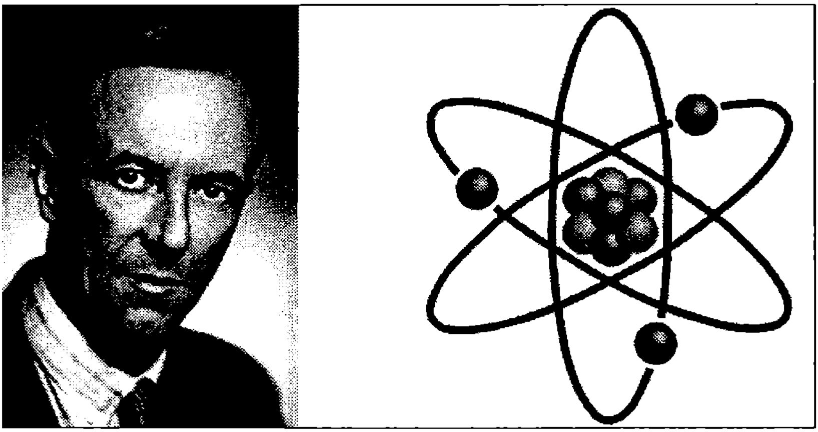

জেমস চ্যাডউইক ও তাঁর পরমাণু মডেল

www.pathagar.com

১৯৪০ : জি. টি. সিবার্গ ও ই. এম. ম্যাকমিলান (উভয়ে আমেরিকান) নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৯৪৪ : (১) 'আমেরিকান' নামক তেজস্ক্রিয় মৌল প্রস্তুত করেন সিবার্গ ও আর. এ. জেমস (আমেরিকা)।

: (২) ভারি নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য অটো হান্ (জার্মানি) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৯ : (১) ক্যালিফোর্নিয়ান ও বার্কেলিয়ান আবিষ্কৃত হয়।

: (২) কেমিক্যাল থারমোডায়নামিকসের সূত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান উইলিয়াম এফ. জায়েনকুর্থ (আমেরিকা)।

১৯৫৩ : আইনস্টাইনিয়াম নামক কৃত্রিম মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কার হয়।

১৯৫৪ : (১) ফের্মিয়াম নামক কৃত্রিম মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কার হয়।

: (২) ক্যামিক্যাল বন্ড ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তথ্যাবলী আহরণের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সি. পাউলিং (আমেরিকা)।

১৯৫৭ : ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার থেকে মেন্ডালিভিয়াম নামক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলটি আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়।

১৯৫৮ : প্রোটিন অণুর গঠন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ফ্রেডরিক স্যাংগার (ইংল্যান্ড)।

১৯৬০ : (১) তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উইলার্ড এফ. লিবি (আমেরিকা)।

: (২) নোবেলিয়াম নামক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলটির আবিষ্কার হয়।

১৯৬৫ : জটিল জৈব যৌগের সংশে-ষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবার্ট বি. উডওয়ার্ড (আমেরিকা)।

১৯৬৬ : অণুর ইলেকট্রনীয় গঠন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবার্ট এস. মুলিকেন (আমেরিকা)।

১৯৭২ : এনজাইমের পারমাণবিক গঠন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় নি তিন মার্কিন বিজ্ঞানী বি. আনফিনসেন, স্ট্যানফোর্ড মুর ও উইলিয়াম এইচ. স্টাইনকে।

১৯৭৪ : অতিকায় রাসায়নিক অণু আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পল. জে. ফ্লোরি।

১৯৮০ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব আহরণের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পল বার্গ, ফেড্রিক স্যাংগার ও ওয়ালটার গিলবার্ট।

www.pathagar.com

পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

বিজ্ঞানের যে শাখাটি আজকের দিনে আমাদের কাছে পদার্থ বিজ্ঞান নামে পরিচিত——সেটি এককালে প্রাকৃতিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকগণ জড় জগতের কোনো কোনো দিক পর্যবেক্ষণ করতেন। পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু তত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা। তারপর সেই তত্ত্বগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ গাণিতিক নিয়মে। কিন্তু তাদের কোনো প্রচেষ্টাই দর্শনের বাইরে ছিল না। তাই সেকালে দর্শনের যে অংশ জড় জগতের বস্তুরাশি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা হতো সেই অংশটিকে বলা হতো প্রাকৃতিক দর্শন। আর সেদিনের সেই প্রাকৃতিক দর্শন আজকের 'পদার্থ বিজ্ঞান' হয়ে বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্থান দখল করেছে।

পটভূমি

মানুষ যেদিন আগুন জ্বালিয়েছিল সেদিনই পদার্থবিদ্যার তথা মানবসভ্যতার সূত্রপ্রাত। তাপশক্তিকে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করেছিল প্রাচীনকালের মানুষ। পদার্থবিদ্যার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চাকা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে সুমেরীয়রা চাকা ব্যবহার করতো এমন নজিরও পাওয়া যায়। এ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালের মানুষও বুঝতে পেরেছিল যে ঘর্ষণের ফলে গতি ব্যাহত হয়। তাই ঘর্ষণকে উপেক্ষা করার জন্যই আবিষ্কার করেছিল চাকাকে।

অতিবাহিত হয়েছে হাজার হাজার বছর। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার করেছে অনেক কিছু। সেদিন তাদের আবিষ্কারের মূলে ছিল শুধু প্রয়োজন। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিজ্ঞানের সব শাখারই উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু সে শাখাগুলোর কোনো সুস্পষ্ট রূপ ছিল না। সেদিন তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরি করেছে অস্ত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণের জন্য ঘর-গৃহস্থালির নানা জিনিস, নদী পারাপারের জন্য নৌকা আরও কত কি!

www.pathagar.com

অন্যদিকে দিন-মাস-বছর ইত্যাদি হিসাব করতে তারা লক্ষ্য করতো আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোকে, নিজের সম্পদের হিসাব রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল সুষ্ঠুভাবে গণনার উপায় ঠিক করতে, রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করেছিল উদ্ভিদের ভেষজগুণ আবিষ্কার করতে।

সেদিন বিজ্ঞানের অনেক সম্ভাবনাময় শাখা একসাথে মিশে একাকার হয়েছিল। বিজ্ঞানের কোন্ শাখা কবে উৎপন্ন হয়েছে তার কাল নির্দেশ করা সম্ভব নয়। অনুমান করা যেতে পারে পদার্থ বিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছে, সেই সুদূর অতীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে। পদার্থ বিজ্ঞানের সেই অগ্রযাত্রার কথা বর্ণনা করা হলো:

পদার্থ বিজ্ঞানে গ্রিকদের অবদান

শুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা গ্রিক আমলেও শুরু হয়নি। এই শাস্ত্রটা তাদের প্রকৃতি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ওই প্রকৃত দর্শনের ভেতর দিয়েই তারা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রায় সবগুলো শাখায় পদচারণা করেছিলেন এবং সকল শাখায় কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন।

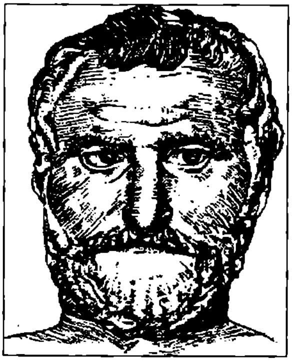
থালেস

প্রথম যে দার্শনিকের দর্শনে পদার্থবিদ্যার পরিচয় লাভ করা যায়—তিনি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত থালেস। কথিত আছে, তিনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করতে পারতেন এবং কতগুলো মূল পদার্থের কল্পনা করেছিলেন। থালেসই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ সঞ্চারিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত মহামতি পিথাগোরাস শব্দ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তিনি এবং তার শিষ্যমণ্ডলী যন্ত্রসঙ্গীতের সুর লহরীর সঙ্গে তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করেছিলেন।

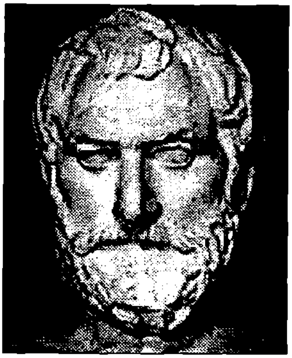
পিথাগোরাস

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টোটল প্রথম গতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তিনিই প্রথম গতিকে সরলগতি, বৃত্তাকার গতি এবং উভয়ের মিশ্রিত গতি—এই তিন ভাগে ভাগ করেন। ঐ শতাব্দীতে আলোক সম্বন্ধে গবেষণা করেন প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ ইউক্লিড। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন, আলোক সরলরেখায় চলে।

www.pathagar.com

আলোক বিজ্ঞানে তার দ্বিতীয় মতটি পরিত্যক্ত হয়েছে। সে মতটি ছিল, আলোক চক্ষু থেকে নির্গত হয়।

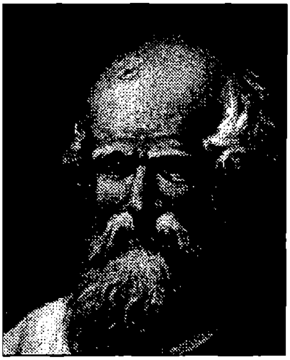

আর্কিমিডিস

পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় নিয়ে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হন আর্কিমিডিস। পদার্থ বিজ্ঞানের 'তাত্ত্বিক' ও 'ফলিত' উভয় দিকই সমৃদ্ধ হয়েছে আর্কিমিডিসের হাতে। তিনি প্রথম পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্লাবিতা আবিষ্কার করেন। ওই কারণে তাকে উদস্থিতিবিদ্যার জনক বলা হয়। সহজ উপয়ে পানিকে উপরে তোলার উপায় উদ্ভাবন, লিভারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা, ক্যাটাপুল্ট (Catapult) আবিষ্কার—পদার্থবিদ্যায় তার অক্ষয় কীর্তি।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর আর একজন গ্রিক বিজ্ঞানী স্টেসিরিয়াস প্রথম পানিঘড়ির আবিষ্কার করেছিলেন এবং বায়ুর চাপকে কাজে লাগিয়ে পাম্প ও নিক্ষেপক অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত টলেমি দীর্ঘদিন আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের ঐ শাখায় তার অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোক প্রতিসরণের একটি সূত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তারই লেখায় সমতল, উত্তল ও অবতল এই তিন ধরনের দর্পণের উল্লেখ আছে।

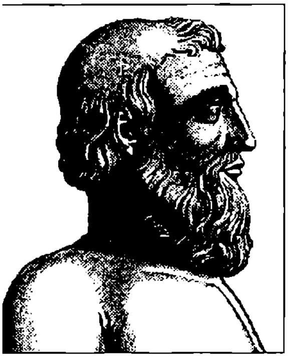

ভিট্রুভিয়াস

টলেমির পরে গ্রিসে আবির্ভূত হন হীরো নামে এক প্রযুক্তিবিদ। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনিও রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। বাষ্পীয় টারবাইনের তিনিই আবিষ্কারক। হীরো বহুকাল আলোক ও বাতাসকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন বাতাসের স্থিতিস্থাপক গুণটি।

রোমান আমলে একজন মাত্র পদার্থবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তার নাম ভিট্রুভিয়াস। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের পদার্থ বিজ্ঞান

আরবীয়দের হাতে মধ্যযুগে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। আরবের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ইবন আল হায়থাম আলোকবিদ্যার কতগুলো তথ্যের প্রথম জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। চোখ ও আমাদের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম গবেষণা করেছিলেন এবং যেসব মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলো এখনও আলোক

www.pathagar.com

বিজ্ঞান স্বীকার করে আসছে। লেন্সের বিবর্ধন এবং বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণ ক্ষমতাও হায়থামের আবিষ্কার।

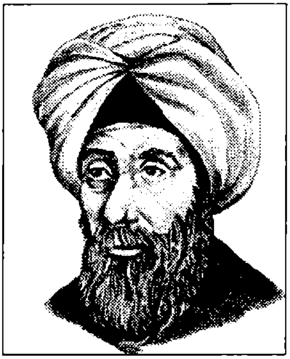

ইবন আল হায়থাম

মধ্যযুগে ইউরোপে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকনের দ্বারা। আলোক প্রতিফলন সূত্রের আবিষ্কর্তা তিনি। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, লেন্স দিয়ে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব—যার দ্বারা দূরের জিনিসকে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু দুরবিন তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি।

রোজার বেকন

রোজার বেকনের পর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি আলোক তরঙ্গবাদের সমর্থক এবং আলোক প্রতিফলনের একটি সূত্রের আবিষ্কারক। ফলিত পদার্থবিদ্যায় তার অবদানই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কতগুলো যুদ্ধাস্ত্র এবং পানিশক্তির দ্বারা চালিত কতগুলো যন্ত্রপাতি। বিমান ও হেলিকপ্টার নির্মাণের স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

ভিঞ্চির পর আসে গ্যালিলিওর কাল। আর্কিমিডিসের মতো গ্যালিলিও এক মহাবিস্ময়। বিজ্ঞানের বহু শাখায় তিনি স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করেছিলেন। তবে পদার্থ বিজ্ঞানেই তার অবদান সর্বাধিক। গ্যালিলিওই প্রথম বায়ুপূর্ণ থার্মোমিটার প্রস্তুত করেন। পেন্ডুলামের নিয়মগুলো তারই আবিষ্কার। বলবিদ্যা ও স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। তিনিই প্রথম সরণ ও ত্বরণের সংজ্ঞা প্রদান করেন। উপস্থিতিবিদ্যায় বস্তুর নিমজ্জন—এই সূত্রও গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন। আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও এবং পরবর্তীকালে আবির্ভূত বিজ্ঞানী নিউটন—এই তিনজন পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনটি বিস্ময়। এই তিন প্রতিভাকে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে বিজ্ঞান এত দ্রুত অগ্রসর হতো না।

www.pathagar.com

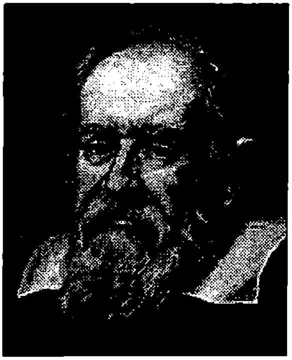

গ্যালিলিও গ্যালিলি

সে সময় আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে জানসেন, ফর্টিন, রবার্ট হুক, গিলবার্ট, বে-ইজ পাস্কাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জানসেন যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেন। ফর্টিন আবিষ্কার করেন বায়ুর চাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার। অবশ্য ফর্টিনের নামের সঙ্গে টরিসেলির নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। অন্যান্যের মধ্যে গিলবার্ট চুম্বক বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন, বাতাসের স্থিতিস্থাপক গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন হুক, পাস্কাল উপস্থিতিবিদ্যার একটি বিশেষ সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বায়ুশোষক যন্ত্র আবিষ্কার করেন অটো ভন গেরিক।

নিউটনের যুগ : পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগ

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়কে পণ্ডিতরা 'নিউটনের যুগ' রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুগটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের সব শাখাই এই সময় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তারপর বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান এগিয়ে চলে অতি দ্রুতগতিতে। তাই বিজ্ঞানের সুবর্ণযুগের শুরু নিউটনের আমল থেকে।

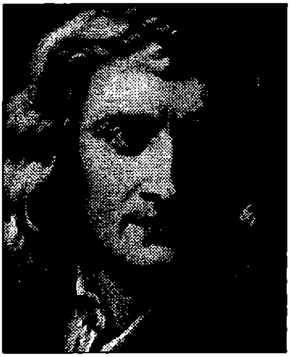

স্যার আইজ্যাক নিউটন

পণ্ডিতদের মতে, নিউটন বিজ্ঞানকে যা উপহার দিয়ে গেছেন তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা সবকিছুই সমৃদ্ধ হয়েছে নিউটনের দ্বারা। তাছাড়া পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় গণিতের প্রয়োগ করে তিনি তিনটি শাখার সমন্বয় সাধন করে সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছেন। নিউটন বিজ্ঞানে যেসব তথ্যগুলো প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলোকে অনুসরণ করেও বহু বিজ্ঞানী খ্যাতি লাভ করেছেন। এখনও নিউটন প্রদত্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার শেষ নেই। যুগসন্ধিক্ষণের বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন—এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

পদার্থ বিজ্ঞানে নিউটনের অবদান অনেক। বাতাস ও কতগুলো ঘন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ তিনি প্রথম নির্ণয় করে শব্দ-বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গতিসূত্র ও মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারক তিনিই। জড় পদার্থের গতিবিধির ক্ষেত্রে তিনি প্রথম গণিতকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার আছে অসামান্য অবদান। আলোকের বর্ণালীতত্ত্বের জন্মদাতা নিউটন। আলোর ব্যতিচার বা ইনটারফিয়ারেন্স এবং দ্বৈত প্রতিফলন বা 'ডাবল রিফ্রাকসন'-এর কথা পদার্থ বিজ্ঞান তারই গবেষণা থেকে লাভ করেছে। আলোর কণিকাতত্ত্বের প্রবর্তক নিউটন এবং প্রতিফলক দুরবিনের আবিষ্কর্তা। বিজ্ঞানের এই শাখায় তার আবিষ্কারগুলো যে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করলেই অমরত্ব লাভ করতে পারতেন। বিজ্ঞানের চিন্তারাজ্যে তিনি যে সুদূরপ্রসারী আলোড়ন এনেছিলেন পরবর্তীকালে একমাত্র আইনস্টাইন ছাড়া আর কোনো বিজ্ঞানী এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি।

নিউটনের যুগে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী হাইজেনস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। নিউটন আলোকের কণিকা তত্ত্বের প্রবর্তক। আর হাইজেনস তরঙ্গ তত্ত্বের প্রবর্তক। তবে হাইজেনস তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। তার মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর বিজ্ঞানী ফ্রেনলই আলোকের তরঙ্গ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন। হাইজেনসের অন্যান্য অবদানের মধ্যে আছে পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের সূত্র এবং ঘড়ির ব্যালেন্স-হুইল নির্মাণ। হাইজেনসের পর বিজ্ঞানী রোমারের নাম করতে হয়। আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ের কৃতিত্ব তাঁরই। তাপমাত্রার একটি স্কেলও তিনি প্রবর্তন করেছেন। ঐ স্কেলটি 'রোমার স্কেল' নামে প্রসিদ্ধ।

নিউটন-যুগের পর বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপে কিছুটা ভাটা পড়ে। সেখানে পুনরায় শুরু হয় দর্শনের যুগ। তবে এ যুগে পদার্থ বিজ্ঞান যে কিছু লাভ করেনি এমন নয়। ওই দার্শনিক যুগেই বিজ্ঞানী দ্যুফে প্রমাণ করেন, ঘর্ষণের ফলে বিপরীত আধানের সৃষ্টি হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঐ আধানদ্বয়ের নামকরণ করেন ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান।

পদার্থ বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ

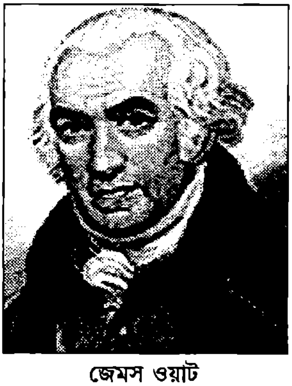
জেমস ওয়াট

নিউটনের পর ইউরোপে পুনরায় শুরু হয় দর্শনের যুগ, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনরায় বিজ্ঞানের জোয়ার ফিরে আসে। নিউটন যা সূচনা করেছিলেন সেগুলো এবার পরিণত রূপ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হতে থাকে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে। বিজ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব শুরু হয়।

রসায়ন বিজ্ঞানে যেমন বিপ্লব এনেছিলেন বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ার তেমনই পদার্থবিদ্যা ও

www.pathagar.com

কারিগরীবিদ্যায় বিপ্লবের সূচনা করেন বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট। তার তৈরি বাষ্পীয় ইঞ্জিনই এই বিপ্লবের নায়ক।

গ্যালভানি ও ভোল্টা

তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে আনেন গ্যালভানি ও ভোল্টা। আর আকাশে ওড়ার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে বেলুন আবিষ্কার করেন জোসেফ ও মগল ফিয়ের। দূরত্বকে বধ করার জন্য বাষ্পীয় শকটেরও আবির্ভাব এই সময়। তাই বিজ্ঞানীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগকে বিজ্ঞানের সুবর্ণযুগের সূচনা বলে ধরে থাকেন।

পদার্থ বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যে যে বিরাট প্লাবন এসেছিল তাকে অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। এ সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাশ্চাত্যে বহু বিজ্ঞান গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারগুলোই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে দান করে অগ্রগতি। নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে বিজ্ঞান। এই শতাব্দীই বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে। পুণরায় এক একটি শাখায় এত অধিক সংখ্যক আবিষ্কার হতে থাকে যে, শাখাগুলোর পরিধি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে চলে এবং জন্মগ্রহণ করে বহু উপশাখা। তাছাড়া শাখাগুলো তার স্বকীয়তাও বজায় রাখতে পারল না। একটি শাখায় জ্ঞান অর্জন করতে অন্য শাখা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পদার্থ বিজ্ঞানী দুরবিন আবিষ্কার করলেন। দুরবিণ ব্যবহৃত হল গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেণের কাজে। গ্রহ-উপগ্রহদের গতিবেগ, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ের কাজে দরকার হল গণিতের। অর্থাৎ, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন—মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

পদার্থ বিজ্ঞানের যে উপশাখাগুলোর সৃষ্টি হলো সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটির পরিচয় প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

বলবিদ্যা ও গতিবিদ্যা

জড় পদার্থের গুণাগুণ ও ধর্ম যথা—ভর, স্থিতিস্থাপকতা, সান্দ্রতা বা ডিসকোসিটি, আসঞ্জন বা অ্যাডেশন, সংসক্তি বা কোহেশান বলবিদ্যার অন্তর্গত। সাধারণভাবে বলবিদ্যা বলতে বোঝায়, বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের দ্বারা অথবা কোনো ক্রিয়ার ফলে বস্তুর গতির যে পরিবর্তন হয়, তারই আলোচনা। অপরদিকে বস্তুর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় আসা এবং গতিশীল অবস্থা থেকে স্থির অবস্থা প্রাপ্ত—ইত্যাদি হচ্ছে এই বিদ্যার আলোচনার বিষয়। বিজ্ঞানের এই শাখাকে গণিতের শাখারূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানও উক্ত শাখাটিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞানেও এই শাখাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষ বলবিদ্যাকে বিবিধ কর্মে প্রয়োগ করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। সেকালে বলবিদ্যা বলতে কেবলমাত্র যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যাকে বোঝাতো এবং 'বলবিদ্যা' কথাটিরও উৎপত্তি হয়েছে খুব ভারি জিনিসকে উত্তোলিত করার প্রয়াস থেকে। মিশরের পিরামিড তৈরির জন্য বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে উপরে তুলতে হতো। বলবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চয়ই তারা পুলি বা কপিকল জাতীয় কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। তা না হলে এত উঁচুতে পাথরকে উত্তোলিত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে সেই অতীতে বলবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো গবেষণা হয়েছিল কিনা সে তথ্য অজ্ঞাত।

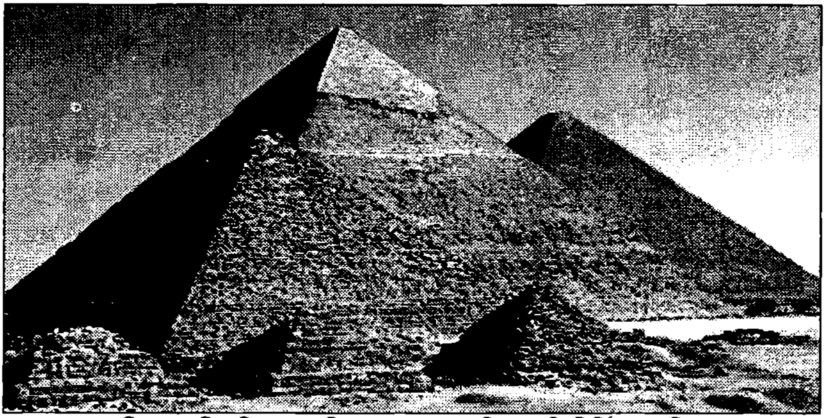

মিশরের পিরামিড : বলবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল

বলবিদ্যা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা শুরু হয় আর্কিমিডিসের সময় থেকে। বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা এবং বলবিদ্যার অন্যতম শাখা উপস্থিতিবিদ্যার জনক তিনি। আর্কিমিডিসের পর এই বিদ্যাটা কেবল যান্ত্রিক বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের অবলুপ্তির সময় বলবিদ্যারও অনুশীলন একরকম বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে নিউটনের হাতে এই বিদ্যার পুণর্জন্ম ঘটে।

www.pathagar.com

গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যা—এই দুটি বিভাগে বলবিদ্যা বিভক্ত। গতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র গতিশীল বস্তু। এই গতিবিদ্যারও আছে দুটি শাখা। শাখা দুটির নাম কাইনেমেটিক্স ও কাইনেটিক্স। কাইনেমেটিক্সে গতির ধর্ম বিবেচনা করা হয় এবং কাইনেটিক্সে গতি ও গতির কারণই আলোচনার বিষয়বস্তু। অপরপক্ষে স্থিতিবিদ্যা হচ্ছে গতিবিদ্যার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ এবং বলের প্রভাবে বস্তুর স্থিতাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

আধুনিক গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যারও জনক হচ্ছেন বিজ্ঞানী নিউটন। তার দেয়া তিনটি সূত্র এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম সূত্র অনুযায়ী, বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে গতিশীল বস্তু চিরকাল সমান গতিতে চলতে থাকবে (কারও কারও মতে এই সূত্রটির আবিষ্কর্তা গ্যালিলিও)। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে : প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। স্থিতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ল্যামির দানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিউটনের গতিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান স্বীকার করে এসেছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে দেখা গেল, নিউটনের গতিবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে সুফল আনছে না। বিশেষত পরমাণু, পরমাণুর মূল কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি এবং আলোর মতো উচ্চগতিসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়।

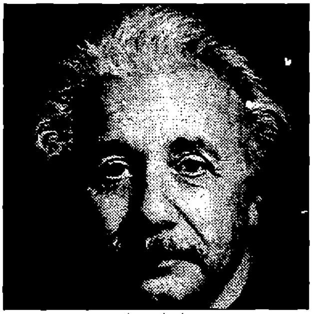
আইনস্টাইন

বিংশ শতাব্দীতে নব্যগতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে। এই বিভাগের স্রষ্টা বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তার আপেক্ষিকবাদ এবং কণা তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম থিওরি একদিকে যেমন বহু সমস্যার সমাধান করেছে, অপরদিকে তেমনই বলবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণার পথকেও উন্মুক্ত করেছে।

শব্দ বিজ্ঞান

গ্রিক আমলে সূচিত হয়েছিল শব্দবিজ্ঞান শাখাটির। পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম সুরসমৃদ্ধ শব্দ তথা মিউজিক্যাল সাউন্ড সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তারপর শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শব্দ বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন বিজ্ঞানী নিউটন। নিউটন ছাড়া অন্যান্য যারা শব্দবিজ্ঞানকে উন্নত করেছেন তাদের মধ্যে টমাস ইয়ং, ফুরিয়ে, হেলমহোলটজ-এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, শব্দ এক প্রকার

www.pathagar.com

শক্তি এবং জড় পদার্থের কম্পণেই শব্দের সৃষ্টি হয়। আবার এই শব্দ কোনো বাস্তব মাধ্যম ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। গ্যাস, তরল অথবা কঠিন যেকোনো মাধ্যমেই শব্দ গমনাগমন করতে পারে। সূর্যদেহে অহরহ যে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ চলছে, তার শব্দ পৃথিবীতে এসে না পৌঁছার কারণ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে বায়ু বা অন্য কোনো মাধ্যম নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলটা মাত্র কয়েকশো মাইল উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর সব ফাঁকা।

যে সমস্ত শব্দ আমাদের কানে আসে, তাদের কম্পাঙ্ক কমবেশি ২০ থেকে ২০০০০-এর মধ্যে থাকতে হয়। অর্থাৎ শব্দের উৎস যেন সেকেন্ডে ২০-এর কম বা ২০০০০-এর বেশি কম্পিত না হয়। তেমন হলে আমরা সে শব্দ শুনতে পারবো না। এই জাতীয় শব্দকে ইংরেজিতে বলা হয় আলট্রাসনিক্স।

শব্দের বেগ কোনো না কোনো মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়-পর্বত, গাছের সারি প্রভৃতিতে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তবে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, প্রতিফলকের দূরত্ব ৫৬ ফুটের কম হলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।

শব্দ দু-রকমের। যে শব্দ শুনতে শ্রুতিমধুর বা সুখকর অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদিকে বলা হয় সুরসমৃদ্ধ শব্দ। আর যে শব্দ আমাদের কানে অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং বিরক্তি উৎপাদন করে, তাকে বলা হয় সুরবর্জিত শব্দ। গুলিগোলার আওয়াজ, যন্ত্রের একটানা ঘর্ঘর শব্দ, সুরবর্জিত শব্দের উদাহরণ।

তাপ বিজ্ঞান

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও বুঝতে পেয়েছিল যে, তাপ একপ্রকার শক্তি। আগুনকে আয়ত্ত করার পর তারা আরও জানতে পেরেছিল আগুনের প্রচণ্ড দাহিকা শক্তির কথা। তবে সে শক্তিকে তখন তারা ব্যয় করেছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, রান্নাবানায়, ধাতু নিষ্কাশনে এবং মাটির তৈরি ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্রকে পুড়িয়ে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে। তারা জানতো না যে সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর পানি বাষ্পাকারে ধীরে ধীরে আকাশে উঠে যায় এবং সেই বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করে। প্রচণ্ড শীতের দিনে গুহামুখে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা ও শরীর ভালোভাবে সেঁকে নিতো তবু তারা জানতো না তাপ বিকিরণের কথা। এছাড়া তাপের পরিবহন, পরিচলন প্রভৃতি গুণাবলীর কথাও তারা জানতো না। শুধু জানতো, ঘর্ষণের ফলে তাদের উৎপত্তি হয়।

গ্রিক আমলেও তাপকে নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। এমনকি মধ্যযুগের মানুষও না। ইউরোপে বিজ্ঞান যখন নবজন্ম লাভ করলো তখনও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পদার্থ থেকে তাপ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার আকারে বেরিয়ে আসে এবং শীতল পদার্থকে গরম করে।

www.pathagar.com

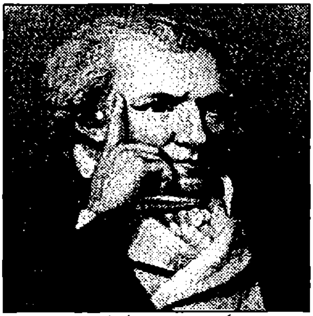

কাউন্ট রামফোর্ড

কাউন্ট রামফোর্ড প্রথম প্রমাণ করেন যে, ঘর্ষণের ফলেই তাপের সৃষ্টি হয়। রামফোর্ডের এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন বিজ্ঞানী ডেভি। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই তাপ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা শুরু। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানী জুল তাপ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে তাপ বিজ্ঞানে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে আনেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল তাপমাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন 'গ্যাসসূত্র'। ক্যালরিমিতিতে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন জোসেফ ব-াক এবং তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন গ্যালিলিও—এদেরও আগে। তবে বিশাল তাপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই গবেষণাগুলো ছিল নিতান্তই গৌন।

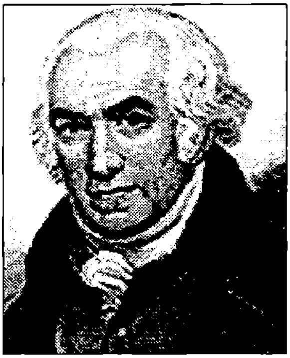

জেমস ওয়াট

তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে জেমস ওয়াট তাপ বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করেন। তার গবেষণা ও আবিষ্কৃত যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোড়ন তোলে। জেমস ওয়াটের সঙ্গে আরও একজন তাপ বিজ্ঞানীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সাদি কার্নট। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের আবিষ্কর্তা তিনি এবং ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতাও তিনি প্রথম পরিমাপ করেন। এই প্রসঙ্গে ডেমলার ও ডিজেলের অবদানও অনস্বীকার্য। ডেমলারের কৃতিত্বে আবিষ্কৃত হয় পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল আবিষ্কার করেন ডিজেল ইঞ্জিন। এদের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই মানুষ জলে-স্থলে এবং অন্তরীক্ষে পাড়ি জমাচ্ছে।

বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তাপ প্রয়োগে পদার্থের নানা পরিবর্তন ঘটে। ক্রমাগত তাপ প্রদান করতে থাকলে কঠিন পদার্থ তরল, গ্যাসীয় এমনকি প্লাজমা অবস্থাও প্রাপ্ত হতে পারে। তাপ সঞ্চালিত হয় পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ পদ্ধতিতে। উদাহরণস্বরূপ একটি ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত গরম করলে পরিবহন প্রণালীতে অন্য প্রান্তও গরম হয়। এক কেটলি পানির তলদেশে তাপ প্রয়োগ করলে পরিচলনের দ্বারা তলার পানি গরম হয়ে ধীরে ধীরে উপরে ওঠে এবং উপরের ঠাণ্ডা ও ভারি পানি তলায় নেমে এসে পুনরায় উত্তপ্ত হয়, আর জ্বলন্ত চুলা থেকে বহুদূরে দাঁড়ালেও বিকিরণের দ্বারা তাপ এসে গায়ে লাগে। তাপ বিকিরণের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপের উৎস হচ্ছে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। দহনের ফলে বস্তুর সেই শক্তি থেকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পারমাণুবিক চুল্লিতে যে তাপ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তার উৎস হচ্ছে পরমাণু। সেখানে পরমাণুর কেন্দ্রকের অন্তর্নিহিত শক্তির একাংশকে রূপান্তরিত করা হয় তাপশক্তিকে।

শীতলীকরণও তাপবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পদার্থের শীতলীকরণ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে, অতি শীতল করার ফলে বস্তুর বিভিন্ন প্রকার গুণ প্রকাশ পায়। যেমন অনেক ধাতবপাতকে অতি শীতল করলে তার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অনেকগুণে বেড়ে যায়। হিলিয়াম নামক গ্যাসটিকে ঠাণ্ডা করে তরলে পরিণত করার পর যদি তাপমাত্রাকে আরও কমাতে কমাতে—২৮০ ডিগ্রিতে আনা যায় তাহলে তার মধ্যে এক আশ্চর্য গুণ প্রকাশ পায়। সে গুণটি হলো, যে সূক্ষ্মতম ছিদ্র দিয়ে কোনো তরল পদার্থ যেতে পারে না, সেই ছিদ্র দিয়ে অতি শীতল হিলিয়াম অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে।

অতি শীতল করার পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। বড় জোর ০ (শূন্য) ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রা পর্যন্ত নামাতে পারতেন। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসগুলো এই ধরনের নিম্ন তাপমাত্রায় তরলীভূত হত না বলে বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছিলেন স্থায়ী গ্যাস বা পার্মানেন্ট গ্যাস। পরে বিজ্ঞানী জুল ও কেলভিন গ্যাসকে হঠাৎ প্রসারণের দ্বারা নিম্ন তাপমাত্রায় আনতে সক্ষম হন। এবার কোনো গ্যাসকে যন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে বারবার প্রসারিত করে ০ ডিগ্রির নিচে ১০০ ডিগ্রি বা আরও অধিক নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। ওই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে পিকটেট অক্সিজেনকে, লিন্ডে বায়ুকে, ডেওয়ার হাইড্রোজেনকে এবং কামারলিং ওনেস হিলিয়ামকে তরলীভূত করেন। তবুও শীতলীকরণ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ডিবাই আবিষ্কার করেন বিচুম্বকনের সাহায্যে অতি নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করার নতুন পদ্ধতি।

তাপ বিজ্ঞানে যে যন্ত্রটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সেই থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বায়ুপূর্ণ থার্মোমিটার প্রথম গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই থার্মোমিটার ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আধুনিক পারদপূর্ণ থার্মোমিটারের উদ্ভাবক গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট। এই থার্মোমিটার ত্রুটিহীন হলেও অতি উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না। তাই থার্মোমিটার সম্বন্ধেও দীর্ঘদিন গবেষণা চলেছিল। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সেপ আবিষ্কার করেন উচ্চ তাপমান যন্ত্র বা পইরোমিটার। এটি একটি গ্যাস থার্মোমিটার। প্রিন্সেপের পর ডেভি, রেনোঁ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পাইরোমিটারের আরও উন্নত রূপ প্রদান করেন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের আরও উন্নতি সাধিত হলে আরও উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে কারণে উদ্ভাবিত হয় বিকিরণ থার্মোমিটার ও বিদ্যুৎশক্তি থার্মোমিটার। এখন আরও অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে থার্মোকাপল ব্যবহার অন্যতম। উক্ত পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা লা-শ্যাতেলার নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। তিনি প্রথমে প্লাটিনাম এবং প্লাটিনাম-বেরিয়াম মিশ্র ধাতুর তারকে ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে তামা ও কনস্ট্যানটান অথবা মলিবডেনাম ও টাংস্টেন তার থার্মোকপাল নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। উক্ত পদ্ধতিতে -২০০ডিগ্রি থেকে -১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়। -২০০ ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রাকে পরিমাপ করতে হলে বিজ্ঞানীরা নানা অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন।

তাপবিজ্ঞানের আর একটি শাখার নাম থার্মোডাইনামিকস। এই শাখায় তাপশক্তি ও যান্ত্রিকশক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। তাপশক্তির সঙ্গে অন্য যে কোনো শক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা থার্মোডাইনামিকসের অন্তর্গত।

আলোক বিজ্ঞান

আলো আছে বলেই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর। একসময় মানুষের ধারণা ছিল আলো আমাদের চোখ থেকেই নির্গত হয়। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকে বলে চোখ থেকে আলো নিঃসরণ বেশি হয় আর রাতে কম হয়। অনেক পরে মানুষ বুঝতে পারে, সূর্যের আলোতেই পৃথিবী আলোকিত হয়।

বিজ্ঞানের এই শাখাটিতে আলোকতত্ত্ব এবং আলোর ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোর গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, ব্যতিচার বা ইন্টারফিয়ারেন্স, সমবর্তন বা পোলারিজেশন, অপবর্তন বা ডিফ্রাকশন প্রভৃতি আলোচনাই আলোক বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়।

টলেমি

প্রাচীনকাল থেকেই আলো সম্বন্ধে গবেষণা হয়ে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি আলোক প্রতিসরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকন কতগুলো লেন্স আবিষ্কার করে আলোক সম্বন্ধে গবেষণার পথকে প্রশস্ত করেন। তারপর পরিপূর্ণভাবে গবেষণা আরম্ভ হয় বিজ্ঞানী নিউটনের সময়। তিনিই প্রথম আলোকের প্রতিসরণ, ব্যতিচার, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে অবগত হন। আলোকের গতির ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি প্রচার করেন কণাবাদ। এই মতে, আলোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেগবান কণার সমষ্টি। নিউটন আলোর

www.pathagar.com

রোজার বেকন

গতিবেগ নির্ণয় করেছিলেন ৩x১০⁸ মিটার প্রতি সেকেন্ডে। তবে কণাবাদ সর্বক্ষেত্রে সুফল প্রদান করতে পারেনি। তাই নিউটনের সমসাময়িক সময়ে আবির্ভূত হল্যান্ডের বিজ্ঞানী হাইজেনস তরঙ্গবাদের কল্পনা করেন। পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী ইয়ং এবং ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেনল হাইজেনসের তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেন। তারা শূন্যে ইথার নামক একটি অদৃশ্য বস্তুর কল্পনা করেন এবং প্রচার করেন, আলোকরশ্মি ঐ ইথারের সাহায্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেউ কেউ মনে করেন, ইথারের কল্পনা ওরা কেউ করেন নি। গ্রিক বিজ্ঞানী অ্যানাক্সাগোরাস কল্পনা করেছিলেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ এক সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। তার কল্পিত ঐ পদার্থের নামকরণ করেছিলেন ইথার।

হাইজেনস, ফ্রেনল, ইয়ং প্রভৃতি বিজ্ঞানীর আলোক তরঙ্গবাদ এবং ইথার দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন। পরে একরকম এই বিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমাণ করেন, বিশ্বজগতে ইথার নামক কোনো বস্তু নেই। তিনি প্রচার করেন আলোকের 'ফোটন' মতবাদ। এই মতবাদ আলোকের কণিকা মতবাদকে সমর্থন করে।

রোমার

অধ্যাপক সি.ভি. রমন এবং ড. মেঘনাদ সাহার আবিষ্কার আলোক-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করে। সূর্যরশ্মিকে বিশে-ষণ করার কৃতিত্ব বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ড্যানিস জ্যোতির্বিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী রোমার আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করে আলোক বিজ্ঞানে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করে গেছেন।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় চুম্বক বিজ্ঞান

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্টের হাতে চুম্বক বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়। তবে গিলবার্টের আগেও চুম্বকের ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে নাবিকরা সমুদ্রে দিক ঠিক করার জন্য চুম্বক দিয়ে একরকম যন্ত্র তৈরি করতো। চীনারাই ঐ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

চুম্বকের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওকে ঝুলিয়ে রাখলে ওর একটা মেরু সবসময় উত্তর দিকে থাকে এবং লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে আকর্ষণ করতে পারে।

www.pathagar.com

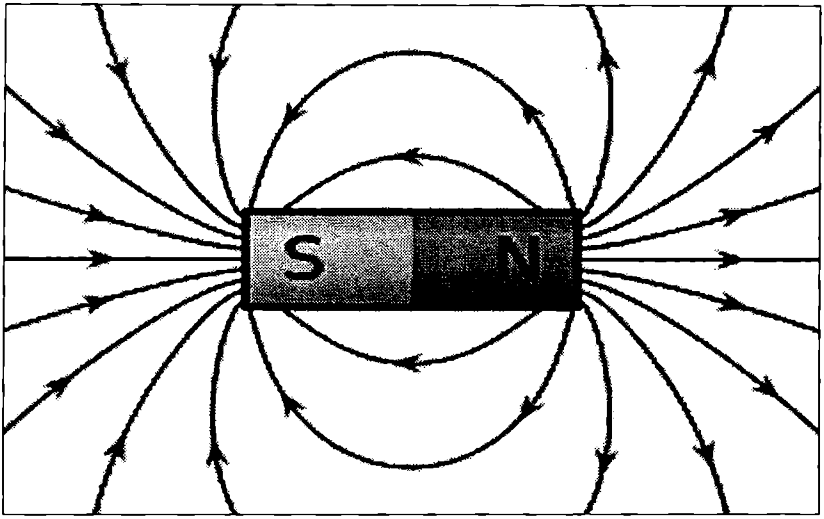

চুম্বক

চুম্বকের দুটি মেরু। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। এক মেরু বিশিষ্ট চুম্বক পাওয়া যায় না কিংবা চুম্বককে কেটে দুখণ্ড করলেও মেরু বিচ্ছিন্ন হয় না। আপনা হতেই বিচ্ছিন্ন অংশে নতুন মেরুর উদ্ভব হয়। সমমেরু বিকর্ষণ করে এবং অসমমেরু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

চুম্বক দুই প্রকার। স্বাভাবিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক। স্বাভাবিক চুম্বক খুব শক্তিশালী নয়। এশিয়া মাইনরের কোনো কোনো জায়গায় ম্যাগনেটাইট নামক ধূসর রঙের এক প্রকার লৌহপ্রস্তর পাওয়া যায়। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লোহাকে এরা আকর্ষণ করতে পারে। গবেষকরা এই পাথরের নাম রেখেছেন স্বাভাবিক চুম্বক। একটি বিশিষ্ট নিয়মে চুম্বকের দ্বারা লোহাকে ঘর্ষণ করে অথবা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা শক্তিশালী কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। কাঁচা লোহাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা চুম্বকে পরিণত করলে তার চুম্বকত্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই ধরনের চুম্বককে তড়িৎ চুম্বক বলা হয়। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্টারজান আবিষ্কার করেন উক্ত চুম্বককে। চুম্বক বিজ্ঞানে গাউস ও ওয়েবারের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তড়িৎ বিজ্ঞান

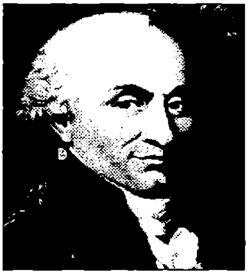
কুলম্ব

তড়িৎ বিজ্ঞান দুটি উপবিভাগে বিভক্ত। স্থির তড়িৎ বিজ্ঞান ও প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞান। প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করেছিলেন, ঘর্ষণের ফলে স্থির তড়িতের উৎপন্ন হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এর যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, সে কথা

www.pathagar.com

গ্যালভানি

অনেকদিন কারও মাথায় আসেনি। সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কুলম্ব নিউটনের বলবিদ্যা ও গাণিতিক নিয়মকানুনকে তড়িৎ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করেন। তার আগে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস স্থির তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করে ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র রচনা করেছিলেন। স্থির তড়িতে বিজ্ঞানী ওয়েবারেরও অবদান আছে।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালভানি তড়িতের সাহায্যে ব্যাঙের পায়ের পেশি সংকোচন লক্ষ্য করেন।

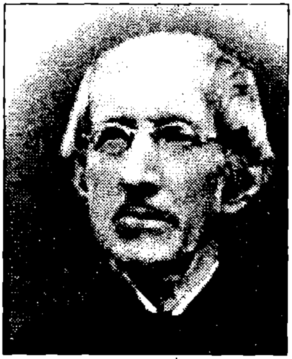

ভোল্ট

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গ্যালভানির পরীক্ষাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানী ভোল্ট আবিষ্কার করেন ভোল্টীয় স্তূপ। সেই থেকে প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানের জন্ম। ভোল্টই আবিষ্কার করেন ভোল্টীয় কোষ। তারপরই তড়িৎ বিজ্ঞানে আসে আলোড়ন। একাধিক বিজ্ঞানী নানা ধরনের কোষ আবিষ্কার করলেন। অবশেষে বিজ্ঞানী ডেভি ও বিজ্ঞানী ফ্যারাডে কতগুলো সূত্র রচনা করে সমৃদ্ধ করলেন তড়িৎ বিজ্ঞানকে। তারপর এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করে তড়িৎকে মানুসের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন।

তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞান

আঁদ্রে মারি অ্যাম্পোয়ার

ফরাসী বিজ্ঞানী আঁদ্রে মারি অ্যাম্পোয়ার তড়িৎ বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা। অ্যাম্পোয়ারের পরে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী উরস্টেড আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ প্রবাহের ফলে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উরস্টেডের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিজ্ঞানের এই শাখায় ধাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে উক্ত শাখাটি সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়।

তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-এর গবেষণার মাধ্যমে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যুতিক আধান বা চার্জকে ত্বরান্বিত করলে যে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, এই সত্যটি আবিষ্কার করেন।

www.pathagar.com

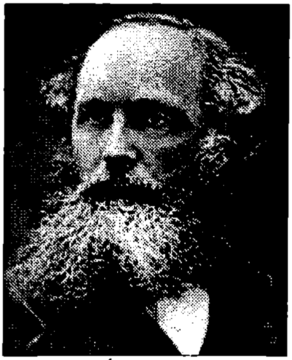

ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

তিনি আরও জানালেন, ঐ তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। ম্যাক্সওয়েল তার তত্ত্বটিকে গাণিতিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিন্তু পরীক্ষাগারে তরঙ্গের সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি।

পরবর্তীতে তেইশ বছর পর জার্মান বিজ্ঞানী হার্টস তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে গবেষণাগারে উৎপাদন করতে সক্ষম হন। সেই থেকে নানা দেশের বিজ্ঞানী আকর্ষণ অনুভব করেন ওই তরঙ্গের প্রতি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়লো, হার্টস উৎপাদিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বেতার তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। গবেষণা থেকে আরও ধরা পড়লো তাপতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, বেতারতরঙ্গ, এক্সরশ্মি প্রভৃতি। সবই তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ। বেতারতরঙ্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বেতারতরঙ্গের উপর শব্দ কিংবা ছবির ছাপ ফেলে বহুদূরে পাঠানো যেতে পারে। ওই আবিষ্কারটির জন্যই সম্ভব হয়েছে বেতারযন্ত্র ও টেলিভিশন আবিষ্কার। রেডিও আবিষ্কারে আমাদের বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে জন্ম নেয়া বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আছে বিশেষ অবদান রয়েছে।

পরমাণু বিজ্ঞান

পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি জটিল ও সঙ্কটময় সময় হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। এ সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যাথোডরশ্মি ও এক্সরশ্মি। তবে বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ ঐ রশ্মিদ্বয়ের স্বরূপ উদঘাটন করতে না পারার কতকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল, ডালটনের দেয়া পরমাণুবাদের প্রতি গভীর আস্থা। সে সময়ে প্রতিটি বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল পরমাণু নিরেট ও অবিভাজ্য কণা।

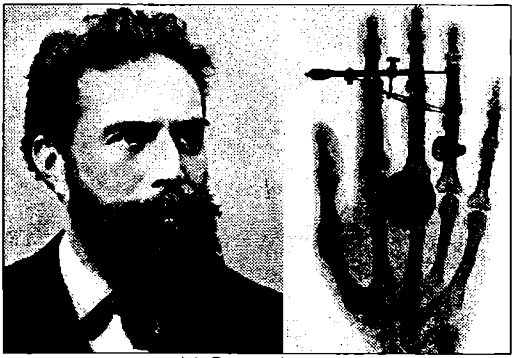

উইলিয়ম রন্টজেন

পরমাণু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় ক্যাথড রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণা থেকে। সেদিন গোল্ডস্টাইন, স্টোনি, ক্রুকস, লেনার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানী ক্যাথোড নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপকে ধাপে ধাপে কমিয়ে এবং তড়িৎ মোক্ষণ

www.pathagar.com

পাঠিয়ে অদ্ভুত সব ঘটনা লক্ষ্য করেন। শেষে চাপ কমিয়ে .০১ মি. মি. পারদস্তম্ভের সমান হতেই দেখা গেল, নলটির অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হয়ে পড়লো অথচ ক্যাথোডের বিপরীত দিকের কাচের দেয়াল হালকা সবুজ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এর কারণ তারা নির্ণয় করতে পারলেন না।

পরবর্তীতে বহু বিজ্ঞানীকে উক্ত পরীক্ষাটি উৎসাহিত করলো। অবশেষে ক্যাথোডরশ্মিকে নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে উইলিয়ম রন্টজেন আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন এক্সরে। এবার বিজ্ঞানীরা আরও দ্বিধায় পড়লেন।

জে. জে. টমসন

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত দ্বিধা নিরসন করলেন জে. জে. টমসন নেগেটিভ আধানযুক্ত ইলেকট্রন আবিষ্কার করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূচিত হল নতুন দিগন্ত। তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক—দুটি দিকই হলো সমৃদ্ধ। প্রথমত লরেঞ্জ নামে হল্যান্ডের এক বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের নিয়মকে কিছু কিছু পরিবর্তন করে নতুন ইলেকট্রন তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লরেঞ্জ সংশোধিত ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করলেন আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে। তাতেও সুবিধা হলো না। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা দেখলেন তত্ত্বগত ফল ও পরীক্ষালব্ধ ফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত।

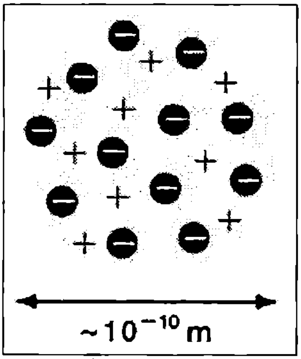

জে. জে. টমসনের পরমাণু মডেল

অবশেষে ম্যাক্সপ্লাঙ্ক অবতারণা করলেন একটি নতুন তত্ত্বের। তত্ত্বটি কোয়ান্টাম থিওরি বা কণা তত্ত্ব নামে পদার্থ বিজ্ঞানে পরিচিত। অবশ্য এই কণা তত্ত্বও সব সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তখন আলোকের সমূহ ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য কণাতত্ত্ব ও তরঙ্গতত্ত্ব উভয় তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। তারপর হাইজেনবার্গ, দ্য ব্রগলি, ডিরাক প্রভৃতি বিজ্ঞানী 'ওয়েভ এন্ড কোয়ান্টাম মেকানিকস' নামক তত্ত্বে কণা এবং তরঙ্গকে একীভূত করে সমস্যার সমাধান করলেন।

এর ফলে পরমাণু সম্বন্ধেও প্রবর্তিত হলো বৈপ্লবিক মতবাদ। জে. জে. টমসন প্রথম সিদ্ধান্ত নিলেন, পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। তার অভ্যন্তরে পজেটিভ আধান এবং নিগেটিভ আধানযুক্ত দুই রকমের কণিকা আছে। পরমাণুর গঠনের একটি মডেলও তিনি উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি দেখালেন, পরমাণুর পজেটিভ আধান

www.pathagar.com

অতি ক্ষুদ্র একটি গোলকের মতো বস্তুতে আছে আর তার গায়ে বিভিন্ন স্থানে ইলেকট্রনগুলো সজ্জিত আছে। টমসনের এই সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হয়।

পরমাণু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে বিজ্ঞানী বেকারেলের পরীক্ষা থেকে। তিনিই প্রথম ইউরানিল পটাসিয়াম সালফেট নামক একটি লবণে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান লাভ করেন। পরে এ বিষয়ে ভালোভাবে গবেষণা করেন রাদারফোর্ড, পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি।

পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরি

পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরির পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় ধাতু বা তেজস্ক্রিয় ধাতুর লবণ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত রশ্মিকে চৌম্বকক্ষেত্রে পরিচালিত করে আলফারশ্মি ও বিটারশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, পরমাণুর পজেটিভ আধান অতি ক্ষুদ্র একটি জায়গায় অবস্থান করে এবং ইলেকট্রনগুলো দূরে দূরে অবস্থান করে।

ডেনমার্কের পদার্থ বিজ্ঞানী নীলস বোর রাদারফোর্ডের তত্ত্বকেও অস্বীকার করেন। তিনি যে নতুন তত্ত্বের অবতারণ করেন সেটি হলো, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস। তার মধ্যে পিণ্ডাবদ্ধভাবে অবস্থান করে পজেটিভ আধানযুক্ত কণা প্রোটন, তড়িৎবিহীন কণা নিউট্রন এবং আরও কতগুলো কণিকা। আর ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। তিনি পরমাণুকে সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করেন। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল যেমন সূর্য তেমনই পরমাণুর কেন্দ্রস্থল নিউক্লিয়াসের। অপরপক্ষে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহরা আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে ঠিক তেমনই ইলেকট্রনরা পরিভ্রমণ করে নিউক্লিয়াসের চারদিকে।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে পরমাণু বিজ্ঞানী সোমারফিল্ড প্রমাণ করেন, ইলেকট্রনদের কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়। এরা বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ অনুসারে ইলেকট্রনদের পথের অয়নচলনও আছে।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে প্রোটন, নিউট্রন, ভি-কণা, মেসন, অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-ইলেকট্রন প্রভৃতি বহু কণিকা। নিউট্রনের আবিষ্কর্তা ইংরেজ বিজ্ঞানী চ্যাডউইক এবং মেসনের আবিষ্কর্তা জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া। মেসন কণিকা সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুও গবেষণা করেছিলেন এবং কতগুলো মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী সি. টি. আর উইলসনের আবিষ্কৃত কাউড চেম্বারে প্রোটন ও ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা হয়েছে। এছাড়া 'বোরতত্ত্ব' সম্বন্ধেও অনেক বিতর্ক হয়েছে। অবশেষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রবর্তিত হওয়ায় বোরতত্ত্বকেও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পর্যায়ে হাইজেনবার্গ, জীম্যান, পাউলিন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

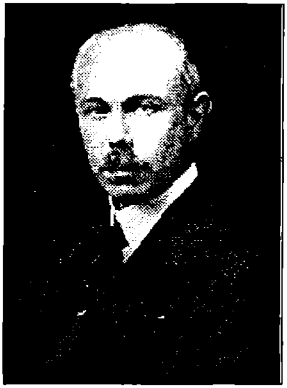
ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাসটন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাসটন আবিষ্কার করেছেন সমস্থানিক মৌল বা আইসোটোপ। তাদের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানী লরেন্স আবিষ্কার করেন সাইকোট্রন যন্ত্র, ককরফট ও ওয়ালটন আবিষ্কার করেন ত্বরণ যন্ত্র ও বিভাট্রন যন্ত্র। এসব যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুকে বিভাজন করাও সম্ভব হলো। তারই পরোক্ষ ফল আইরিন কুরি জোলিও এবং ফ্রেডরিক জোলিওর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার। অপরদিকে অটো হান ও ট্রাসমানের গবেষণা থেকে প্রকাশিত হলো পরমাণু বিভাজনের ফলে উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপশক্তির কথা।

একদিকে চললো পরমাণুর ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে গবেষণা অপরদিকেও শুরু হলো পরমাণুর শক্তিকে মানব কল্যাণে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা। আবিষ্কৃত হলো শক্তিশালী পরমাণু বোমা। বর্তমানকালের প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে এই পরমাণু বোমা। পরমাণুর কল্যাণকর দিকও উন্মোচিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে নিয়োজিত করেছে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের কাজে। ইতালির বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি উদ্ভাবন করেছেন পরমাণু শক্তি থেকে পারমাণবিক চুল্লির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা। পরমাণু শক্তির যে বিপুল সম্ভাবনার দিক খুলে গেছে তার পেছনে রয়েছে উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মেধা ও শ্রম।

www.pathagar.com

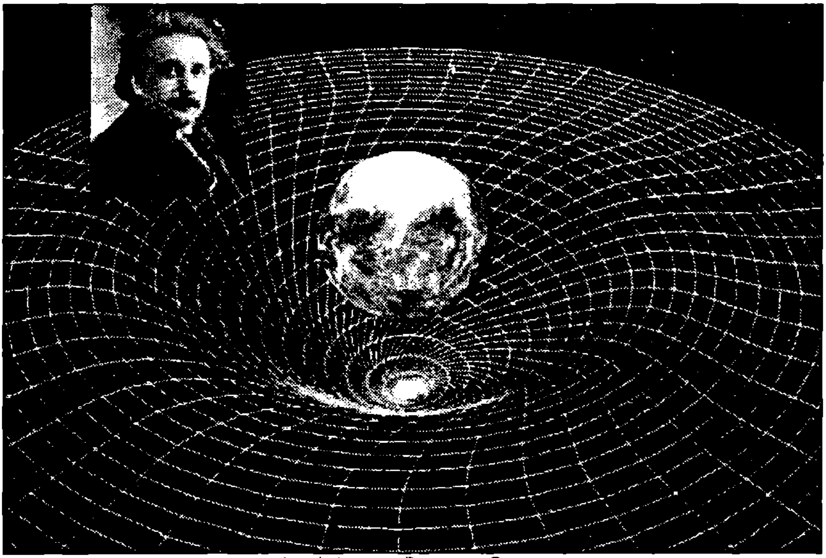

আইনস্টাইন ও তাঁর আপেক্ষিকবাদ

আপেক্ষিকবাদের জনক আইনস্টাইন। ওই তত্ত্বটির মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানজগৎকে চমকে দিয়েছিলেন। আপেক্ষিকবাদে পদার্থের ভর ও শক্তি দুটি পৃথক সত্তা নয়—একই সত্তার দুটি ভিন্নরূপ। প্রকৃতপক্ষে, আপেক্ষিকবাদই কোয়ান্টাম থিওরি ও তরঙ্গবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে—যা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি। এই আপেক্ষিকবাদ একদিকে যেমন নিউটনের মহাকর্ষসূত্র, গতিবিদ্যা প্রভৃতির সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, অপরদিকে তেমনি বহু নতুন তত্ত্বেরও জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে ওই তত্ত্বটি থেকে কোনো পদার্থ বিজ্ঞানী মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। এখানেই আইনস্টাইনের বিশিষ্ঠতা।

পরবর্তীতে পদার্থ বিজ্ঞানে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার মূলে আছে আইনস্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিকবাদ। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অটো হান ও ট্রাসমান ভারি পরমাণুকে বিভাজন করে যে প্রচণ্ড শক্তির কথা প্রকাশ করেছিলেন, সেই শক্তিকে পরিমাপ করা হয়েছিল আইনস্টাইন প্রবর্তিত জড় ও শক্তির সমতুল্যতাবাচক সূত্রটির মাধ্যমে। আপেক্ষিকবাদ থেকে যে বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যত বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

প্লাজমা

পদার্থের চতুর্থ অবস্থাকে বলা হয় 'প্লাজমা'। আমরা জানি, পদার্থ—কঠিন, তরল ও বায়বীয়, এই তিন অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের

www.pathagar.com

গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পদার্থের চতুর্থ অবস্থাও আছে। এই অবস্থাকে বলা হয় বস্তুর 'প্লাজমা' অবস্থা।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুমাত্রই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি দিয়ে গঠিত। প্রোটনরা তড়িৎ ধনাত্মক, ইলেকট্রনরা তড়িৎ ঋণাত্মক এবং নিউট্রনরা তড়িৎবিহীন কণা। নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যক তড়িৎ ধনাত্মক কণা প্রোটন থাকে, বাইরে থাকে ঠিক ততটি ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন। তাই পরমাণুকে তড়িৎ নিরপেক্ষ বলে মনে হয়। যদি উচ্চ তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়োজিত করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভক্ত করা যায় এবং গ্যাসের মধ্যে ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান সমান সমান সংখ্যায় থাকে তাহলে ওই গ্যাসকেও পরীক্ষা করলে তড়িৎ নিরপেক্ষ বলেই মনে হবে। পদার্থের এই অবস্থাকে তখন বলা হবে প্লাজমা অবস্থা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আয়ন মণ্ডলের বিরল বায়ুকণা প্লাজমা অবস্থায় আছে।

প্লাজমা অবস্থাও বস্তুর শেষ অবস্থা নয় বলে অনেকের বিশ্বাস। তারা মনে করেন, পদার্থের পঞ্চম অবস্থাই হচ্ছে শেষ অবস্থা। বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে মেনে নিয়েছেন, পদার্থ কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও প্লাজমার স্তর অতিক্রম করে এলে তখন তার পরমাণু থেকে কেবলমাত্র ইলেকট্রনরা বিচ্যুত হবে না, কেন্দ্র থেকে প্রোটন ও নিউট্রনরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। পদার্থের এই শেষ অবস্থা বিজ্ঞানীরা এখনও প্রমাণ করতে পারেন নি। তাদের মতে, গ্যাসকে শেষ অবস্থায় আনতে হলে কোটি কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রয়োজন। এ তাপ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই পদার্থের শেষ অবস্থার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এখনও এভাবেই থেকে গেছে। সত্যতা যাচাই হবে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীদের হাতে।

শক্তি

যা কাজ করার ইন্ধন দান করে—বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাই শক্তি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুর পেছনে কোনো না কোনো শক্তি কাজ করছে। অদৃশ্য মহাশক্তি বলে গতিশীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রজগৎ সবাইকে পরিক্রম করতে হচ্ছে সেই মহাশক্তি বলে।

আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকালেও শক্তির বিভিন্ন রূপ চোখে পড়ে। আকাশে বিদ্যুতের চমকানো, প্রচণ্ড ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা—সবারই মূলে আছে কোনো না কোনো শক্তি। দৈনন্দিন কাজেও আমরা ব্যবহার করছি নানা ধরনের শক্তিকে। বিজ্ঞানীরা এসব শক্তিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রধান বিভাগগুলো হলো: (১) যান্ত্রিকশক্তি, (২) তাপশক্তি, (৩) আলোকশক্তি, (৪) চৌম্বকশক্তি, (৫) বিদ্যুৎশক্তি, (৬) রাসায়নিকশক্তি, (৭) নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক শক্তি।

www.pathagar.com

যান্ত্রিক শক্তির দুটি রূপ, স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি। ছাদের কার্নিশে রাখা ইটের কোনো কার্যক্ষমতা নেই বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু যখনই ঐ ইটটা নিচে পড়ে যায়, তখন কারও মাথায় পড়লে বোঝা যায় তার শক্তি। ইটের মধ্যে যে শক্তি নিহিত ছিল সেটি স্থিতিশক্তি। আর ইটটা যখনই পড়ে গেল, তখনই স্থিতিশক্তিটা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হলো। অন্যদিকে গতিশীল কোনো বস্তুকে থামাতে হলে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমান গতির যুগে বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে গতিশক্তিকে মাপতে চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রচলন হয়েছিল হর্সপাওয়ার বা অশ্বশক্তি নামের একটি একক।

তাপশক্তির কথা আজকাল আমরা সবাই জানি। আমরা রান্না করি তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাপশক্তিকেই ব্যবহার করা হয়। সূর্যের তাপে পৃথিবীর জলভাগ থেকে পানি বাষ্পাকারে উপরে উঠে যায়, পরে সেই বাষ্প থেকে মেঘ জমে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি আবার জমা হয় খাল, বিল, নদী, সমুদ্রে। পুনরায় ঘটে বাষ্পীভবন, তারপর আবার মেঘ-বৃষ্টি। ফলে আমাদের প্রিয় পৃথিবী এমন সবুজে ঘেরা।

তাপ ও আলোক শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। পর্যাপ্ত আলো না পেলে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো। আলোর অভাবে সূর্যের দূরের গ্রহগুলো কেবল বরফের রাজ্য এবং উন্নত জীবগোষ্ঠীর বাসের অযোগ্য। উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে হলেও সূর্যের আলো প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্যালোক ছাড়া খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ সূর্যরশ্মিকে সরাসরি গ্রহণ ও সঞ্চয় করে সৌরশক্তি বা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বদ্ধ পরিকর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শতাব্দীর শেষের দিকে সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হবে।

চুম্বকশক্তির দ্বারা লোহা চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। চুম্বকশক্তিকে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করেছে বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর প্রভৃতি।

প্রবাহী তড়িৎ আবিষ্কারের পর মানুষ বিদ্যুৎশক্তির বিরাট সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। বিদ্যুৎ শক্তির বলে আজ পৃথিবীতে ট্রেন চলছে, কলকারখানা চলছে, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট আলোকিত হচ্ছে। ব্যবহারিক জীবনে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, হিটার, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি বিদ্যুতের সাহায্যে চলছে এবং আমাদের জীবনকে সহজ করেছে।

কয়লা ও পেট্রোলিয়াম হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির উৎস। সূর্যের তাপে গাছ-পালা ও জীবদেহে সৌরতাপ সঞ্চিত হয়। সেই গাছপালা ও জীবদেহ অতীতে আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাটি চাপা পড়েছিল। কোটি কোটি বছরের পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে সেগুলো রূপান্তরিত

www.pathagar.com

হয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে। অতএব এগুলোও পরোক্ষ সৌরশক্তি।

পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে মানুষের পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরমাণুর ভাঙ্গনে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়—এই সত্যটি প্রথম ধরা পড়ে। সেদিন ওই শক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল ধ্বংসাত্মক কাজে। তবে এর ভয়াবহতা এখনও দূর হয়নি, বরং বেড়েই চলেছে।

নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটারের মাধ্যমে নিউট্রন নিয়ন্ত্রক বস্তু বা মডারেটর ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভাজিত করা হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড তাপশক্তি এবং এই তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুৎশক্তিতে। অপরদিকে সূর্যের যে এত শক্তি, তার মূলে আছে পারমাণবিক শক্তি। প্রতি সেকেন্ডে টন টন হাইড্রোজেন পরমাণু প্রচণ্ড তাপেই উৎপন্ন করছে হিলিয়ামকে। অতএব পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্য।

www.pathagar.com

পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান আবিষ্কার

সাল	আবিষ্কার ও আবিষ্কারক
খ্রিঃ পূর্ব ৬০০	: ঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি, থালেস (গ্রিস)
খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতক	: লিভার ও তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব, আর্কিমিডিস (গ্রিস)।
খ্রিঃ পূর্ব ২য় শতক	: আলোক প্রতিফলনের সূত্র, টলেমি (গ্রিস)।
খ্রিঃ পূর্ব ২য় শতক	: বাষ্পীয় টারবাইন, হিরো (গ্রিস)।
খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী	: লেন্সের বিবর্ধন, ইবন আল হায়থাম (আরব)।
খ্রিঃ পঞ্চদশ শতাব্দী	: আলোর তরঙ্গবাদের কল্পনা লিউনার্দো দা ভিঞ্চি (ইতালি)।
১৪৫০	: ছাপার যন্ত্র, গুটেনবার্গ (হল্যান্ড)।
১৫৯০	: যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, জানসেন (হল্যান্ড)।
১৬০০	: চুম্বকের গুণাবলী, গিলবার্ট (ইংল্যান্ড)।
১৬০৪	: দুরবিন, লিপারশে (হল্যান্ড)।
১৬০৯	: গ্যালিলিয়ান দুরবিন, গ্যালিলিও (ইতালি)।
১৬৪৩	: ব্যারোমিটার, টরিসেলি (ইতালি)।
১৬৪৬	: উপস্থিতি বিদ্যার একটি সূত্র, বে-ইজ প্যাস্কাল (ফ্রান্স)।
১৬৫৬	: পেন্ডুলামযুক্ত ঘড়ি, হাইজেনস (নেদারল্যান্ড)।
১৬৬০	: এয়ার পাম্প, অটো ভন গেরিক (জার্মানি)।
১৬৬৫	: মহাকর্ষ সূত্র, নিউটন (ইংল্যান্ড)।
১৬৭৮	: স্থিতিস্থাপকতার সূত্র, হুক (ইংল্যান্ড)।
১৭১৪	: পারদ থার্মোমিটার, ফারেনহাইট (জার্মানি)।
১৭৪৬	: সেন্টিগ্রেড স্কেল, সেলসিয়াস (সুইডেন)।

www.pathagar.com

১৭৬১ : লীন তাপ, জোসেফ দ্রাক (ফ্রান্স)।

১৭৬৫ : বাষ্পীয় ইঞ্জিন, জেমস ওয়াট (স্কটল্যান্ড)।

১৭৬৭ : সুতা কাটার কল, জে. হারগ্রিবস (ইংল্যান্ড)।

১৭৮৬ : তড়িতের সাহায্যে ব্যাঙের পেশী সংকোচন, গ্যালভানি (ইতালি)।

১৭৮৮ : বাষ্পীয় বেলুন, মঁগলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় (ফ্রান্স)।

১৮০০ : ভোলটীয় স্তূপ, ভোল্টা (ইতালি)।

১৮০১ : স্টিম লকোমটিভ, আর ট্রেভিথিক (ইংল্যান্ড)।

১৮০৩ : স্টিম বোট, রবার্ট ফুলটন (আমেরিকা)।

১৮১৬ : সেফটিল্যাম্প, ডেভি (ইংল্যান্ড)।

১৮২০ : চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের ফল, উরস্টেড (ডেনমার্ক)।

১৮২২ : তাপীয় ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী, সাদি কার্নট (ফ্রান্স)।

১৮২৫ : তড়িৎ চুম্বক, ডাব্‌- স্টারজন (ইংল্যান্ড)

১৮২৬ : ওহম সূত্র, জর্জ সাইমস ওহম (ইংল্যান্ড)।

১৮৩১ : তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের সূত্র, ফ্যারাডে (ইংল্যন্ড)।

১৮৩২ : টেলিগ্রাফ, স্যামুয়েল মোর্স (আমেরিকা)।

১৮৩৩ : তড়িৎ বিশে-ষণের সূত্র, ফ্যারাডে (ইংল্যান্ড)।

১৮৩৫ : পিস্তল, কোল্ট (আমেরিকা)।

১৮৩৬ : ড্যানিয়েল কোষ, জন ড্যানিয়েল (ইংল্যান্ড)।

১৮৩৭ : ফটোগ্রাফি, দাগোরো (ফ্রান্স)।

১৮৪০ : হাইগ্রোমিটার, রেনোঁ (ফ্রান্স)।

১৮৪১ : তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল, জুল (ইংল্যান্ড)।

১৮৪২ : বাইসাইকেল, ম্যাকমিলান (স্কটল্যান্ড)।

১৮৪৬ : সেলাই কল, ইলিয়াস হাউই (আমেরিকা)।

১৮৫৯ : স্পেকট্রোস্কোপ, কিরসফ বুকনার (জার্মানি)।

১৮৫৯ : সঞ্চয়ক কোষ, প্ল্যান্টি (জার্মানি)।

১৮৬০ : ডায়নামো, পিকিপটটি (ইতালি)।

১৮৬১ : মেশিনগান, আর. জে. গ্যাটলিং (আমেরিকা)।

www.pathagar.com

১৮৬৫ : তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত, ম্যাক্সওয়েল (জার্মানি)।

১৮৬৫ : ল্যাকল্যান্সি কোষ, ল্যাকল্যান্সি (ইংল্যান্ড)।

১৮৬৬ : টর্পেডো, ওয়াইট হেড (ইংল্যান্ড)।

১৮৬৮ : টাইপরাইটার, সি. মোলস (আমেরিকা)।

১৮৭৬ : টেলিফোন, গ্রাহাম বেল (আমেরিকা)।

১৮৭৯ : ক্যাথড রে সংক্রান্ত গবেষণা, ক্রুক্স (ইংল্যান্ড)।

১৮৭৯ : ইলেকট্রিক বাল্ব, এডিসন (আমেরিকা)।

১৮৮৩ : বাষ্পীয় টারবাইন, ডি. লাভেল (সুইডেন)।

১৮৮৫ : ইনটারন্যাল কম্বাসন ইঞ্জিন, ডি. ডেমলার (জার্মানি)।

১৮৮৫ : লাইনো টাইপ, ও. মার্গেনথেলার (আমেরিকা)।

১৮৮৭ : গ্রামোফোন, এডিসন (আমেরিকা)।

১৮৮৮ : বেতার তরঙ্গ, হার্টস (জার্মানি)।

১৮৮৮ : ফিল্ম, জর্জ ইস্টম্যান (আমেরিকা)।

১৮৮৮ : বায়ুভরা টায়ার, ডানলপ (আয়ারল্যান্ড)।

১৮৯১ : সাবমেরিন, জোহন, পি. হল্যান্ড (আমেরিকা)।

১৮৯২ : ইলেকট্রিক মোটর, ফ্যারাডে সিকোলা তেসলা (আমেরিকা)।

১৮৯৫ : ডিজেল ইঞ্জিন, রুডলফ ডিজেল (জার্মানি)।

১৮৯৫ : রেডিও, মার্কনি (ইতালি)।

১৮৯৫ : ক্যাথড-রের স্বরূপ, জিন, পেরিন (ফ্রান্স)।

১৮৯৫ : এক্সরে, রন্টজেন (জার্মানি)।

১৮৯৫ : সেফটি রেজার, জিলেট (আমেরিকা)।

১৮৯৭ : আলফারশ্মি ও বিটারশ্মি, রাদারফোর্ড (ইংল্যান্ড)।

১৯০০ : গামারশ্মি, ডিলার্ড (ইংল্যান্ড)।

১৯০০ : ট্রাকটার, বি. হোল্ড (আমেরিকা)।

১৯০০ : কোয়ান্টাম থিওরি, ম্যাক্স প্লাঙ্ক (জার্মানি)।

১৯০৩ : উড়োজাহাজ, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা)।

১৯০৬ : তেজস্ক্রিয়তা, হেনরি বেকারেল (ফ্রান্স)।

www.pathagar.com

১৯০৬ : পরমাণুর মডেল, রাদারফোর্ড (ইংল্যান্ড)।

১৯০৭ : বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, মাইকেল সন (আমেরিকা)।

১৯০৮ : রঙিন ফটোগ্রাফির জন্য নোবেল পুরস্কার, লিপম্যান (ফ্রান্স)।

১৯১০ : ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণের জন্য নোবেল পুরস্কার, ডি. ভ্যান্ডারওয়াল (ইংল্যান্ড)।

১৯১০ : মহাজাগতিক রশ্মি, হেস ও কোহ্লস্টার (অস্ট্রিয়া)।

১৯১১ : গ্যাসীয় অনু পরমাণুর ভর নির্ণয়, জে. জে. টমসন (ইংল্যান্ড)।

১৯১১ : মেঘ প্রকোষ্ঠ, সি. টি. আর উইলসন (ইংল্যান্ড)।

১৯১১ : শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ, ডাব্লু, এইচ. ক্যারিয়ান (আমেরিকা)।

১৯১৩ : পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তথ্য, নীল্স বোর (ডেনমার্ক)।

১৯১৩ : হিলিয়ামের তরলীকরণের জন্য নোবেল পুরস্কার, ক্যামার লিও ওননেস (হল্যান্ড)।

১৯১৪ : মৌলের অ্যাটমিক নাম্বার নির্ণয়, মোসলে (ইংল্যান্ড)।

১৯১৪ : ট্যাঙ্ক, ই. সুইনটন (ইংল্যান্ড)।

১৯১৫ : বোরের পরমাণু মডেল সংশোধন, সামারফিল্ড (জার্মানি)।

১৯১৫ : আপেক্ষিকতাবাদ, আইনস্টাইন (জার্মানি)।

১৯১৯ : আইসোটোপ, অ্যাস্টন (ইংল্যান্ড)।

১৯১৯ : কৃত্রিম উপায়ে মৌলান্তর, রাদারফোর্ড (ইংল্যান্ড)।

১৯২১ : ফটো ইলেকট্রিক সূত্রের জন্য নোবেল পুরস্কার, আইনস্টাইন (জার্মানি)।

১৯২২ : রাডার, টেলর ও ইয়ং (আমেরিকা)।

১৯২৪ : লাউড স্পিকার, পিনকেলয় (আমেরিকা)।

১৯২৬ : টেলিভিশন, জন লজি বেয়ার্ড (ইংল্যান্ড)।

১৯২৬ : ব্রাউনীয় গতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, জিন পেরিন (ফ্রান্স)।

১৯২৯ : তরল জ্বালানিপূর্ণ রকেট, এইচ গর্ডাড (আমেরিকা)।

www.pathagar.com

১৯৩০ : রমন এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার, সি. ভি. রমন (ভারত)।

১৯৩১ : সিনেমাস্কোপ, হেনরি ক্রেটিয়াস (ফ্রান্স)।

১৯৩২ : সাইকোট্রন যন্ত্র, লরেন্স ও লিভিংস্টোন (ইংল্যান্ড)।

১৯৩২ : পজিট্রন, ডিরাক (ইংল্যান্ড)।

১৯৩৩ : পারমাণবিক তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার, ডিরাক (ইংল্যান্ড) ও শ্রোডিঙ্গার (অস্ট্রিয়া)।

১৯৩৮ : নিউট্রনের সাহায্যে নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, এনরিকো ফার্মি (আমেরিকা)।

১৯৩৯ : হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সংযোজন, বেথে (আমেরিকা)।

১৯৪২ : ইউরেনিয়াম বিভাজনে উৎপন্ন তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর, এনরিকো ফার্মি (ইতালি)।

১৯৪৩ : প্রোটনের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, অটো স্টার্ন (জার্মানি)।

১৯৪৪ : নিউক্লিয়াসের চৌম্বক ধর্ম আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, আইজাক রাবি (আমেরিকা)।

১৯৪৫ : এক্সক্লুশন সূত্রের জন্য নোবেল পুরস্কার, পাউলি (আমেরিকা)।

১৯৫১ : ফেজ কনডাক্ট মাইক্রোস্কোপ, এফ. জার্নিক (নেদারল্যান্ড)।

১৯৫১ : কৃত্রিমভাবে পরমাণুর নিউক্লিয়াস উৎপাদনের জন্য নোবেল পুরস্কার, কক্ ক্রফট (ইংল্যান্ড) ও ওয়ালটন (আয়ারল্যান্ড)।

১৯৫৪ : কোয়ান্টাম মেকানিকসের উপর তথ্যের জন্য নোবেল পুরস্কার, জর্জ বোথ (জার্মানি)।

১৯৫৬ : ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, সকলে, বারডিন ও ব্রাটেন।

১৯৫৭ : চেরেনকভ এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার, সুঙ তাও লেক ও চেননি ইয়াং (চিন)।

১৯৫৯ : অ্যান্টিপ্রোটন, এমিলিও সেনরে ও ওয়েন চেম্বারলেন (আমেরিকা)।

www.pathagar.com

১৯৬১ : মোসবাউয়ার এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার, আর. এল. মোসবাই (জার্মানি)।

১৯৬৯ : পারমাণবিক কণিকার শ্রেণীবিভাগ, এম. গেল. মান (আমেরিকা)।

১৯৭১ : হলোগ্রাফিক পদ্ধতি, ডেনিস গ্যাবর (ইংল্যান্ড)।

১৯৭২ : অতি পরিবাহিতা তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার, বার্ডিন, কুপার ও স্রিফার (আমেরিকা)।

১৯৭৩ : সেমিকনডাকটার সম্বন্ধে তথ্য, এসকি, গিয়াভার ও জোসেফসন।

১৯৭৪ : বেতার তরঙ্গের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ, রাইন ও হিউইস (ইংল্যান্ড)।

১৯৭৭ : সৌরকোষ ও যন্ত্রগণক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার, খ্যানভে-ক, নেভিলসট ও এন্ডারসন।

১৯৭৯ : পরমাণু কেন্দ্রের উইকফোর্সে চরিত্র উদঘাটনের জন্য নোবেল পুরস্কার, আব্দুস সালাম (পাকিস্তান), স্টিভেন উইনবার্গ ও গ-ল্যাশো (ইংল্যান্ড)।

১৯৮০ : ল অব্ সিমেট্রি, ভ্যলফিচ ও জেমস ক্রনিনের নোবেল পুরস্কার (আমেরিকা)।

১৯৮১ : লেসার বর্ণালীবীণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য নোবেল পুরস্কার, বারগেন ও সাউলো (আমেরিকা)।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখাটি অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরে এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, অপদেবতা ভর করলেই মানুষের শরীরে অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। সেকালে মিশরের রাজা জোসেফের অন্যতম সহযোগী ইমহোতোপ ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। মিশরের 'প্যাপিরাসে' প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। সে সময়ের মিশরীয় চিকিৎসকগণ মনে করতেন, মানুষের হৃৎপিণ্ডই রক্ত সঞ্চালনের অঙ্গ। তারা আফিম, তামা, পেঁয়াজ, মধু, খেজুর, খুরমা প্রভৃতি থেকে ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করতেন। শল্য চিকিৎসারও উদ্ভব হয়েছিল সে সময়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করলেও পরিপূর্ণ নয়।

অগ্রযাত্রার পটভূমি

ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি ক্ষোদিত আইন থেকে জানা যায়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং ব্যাবিলনে চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সুমেরীয়দের চিকিৎসাবিদ্যা ছিল জাদুবিদ্যা নির্ভর। মিশরীয়দের মতো তারা বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। হাম্মুরাবির আইনে শল্য চিকিৎসারও উল্লেখ পাওয়া গেছে। তবে মিশরে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলোতে চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। পরবর্তীকালে মিশরে আসিরীয়রা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। আসিরীয় যুগের একজন চিকিৎসকেরও নামও পাওয়া যায়। তার নাম আরাদ নিনাই। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি জীবিত ছিলেন বলে গবেষকরা ধারণা করেন।

সম্রাট হাম্মুরাবির মূর্তি

www.pathagar.com

গ্রিকরা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সূচনা গ্রিকদেরই হাতে। প্রাচীন গ্রিসের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। দার্শনিক পিথাগোরাসই এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনিই প্রথম রোগীর মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে রোগ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

হিপোক্রিটাস

হিপোক্রিটাস রোগের কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশে-ষণের চেষ্টা করেন। তিনি চিকিৎসকদের অনুসরণীয় দশটি নীতির প্রবর্তন করেন। সেই নীতিগুলোর অধিকাংশ আজও চিকিৎসকগণ মেনে চলেন। এসব কারণে হিপোক্রিটাসকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিসেবে ধরা হয়।

আরেক গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটলও চিকিৎসা শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। গবেষকদের মতে তুলনামূলক শারীয় সংস্থান বা কমপারেটিভ অ্যানাটমি নামের চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি।

অ্যারিস্টোটলের পর রোমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি কয়েকটি 'নার্ভ' আবিষ্কার এবং চেষ্টীয় ও সংবেদী (মোটর ও সেনসরি) নার্ভের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ। শারীয় সংস্থান সম্বন্ধে তিনি আরও কতগুলো তথ্য প্রচার করেছিলেন। সেগুলো 'গ্যালেনের তথ্য' নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরিচিত। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসকগণ গ্যালেনের তথ্যগুলোকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে এসেছিলেন। পরে আধুনিক উন্নত শারীরবিদ্যা তার তথ্যের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করে।

ক্লডিয়াস গ্যালেন

ভারতবর্ষও ছিল সে-সময়ে চিকিৎসাবিদ্যায় সমৃদ্ধ। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ঋগবেদ ও অথর্ববেদে নানাপ্রকার রোগের উল্লেখ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সেকালে ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্র আটটি শাখায় বিভক্ত ছিল। শাখাগুলো হল কায়চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, শলাকাচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণ। আট শাখায় বিভক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রকে বলা হতো অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। আরও আশ্চর্যের কথা, সে যুগে ভারতের কেবলমাত্র মানুষের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, পশু-পাখি এমনকি গাছপালারও চিকিৎসা করা হতো।

www.pathagar.com

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে 'চরক সংহিতা' ও 'সুশ্রুত সংহিতা'য়। চরক সংহিতা প্রধানত কায়চিকিৎসা প্রধান এবং আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ রচিত 'অগ্নিবেশ সংহিতা'র রূপান্তর। আর সুশ্রুত সংহিতা শল্যচিকিৎসার পুস্তক এবং কাশীরাজ বিদোবদাস ধন্বন্তরি শিষ্য সুশ্রুত কর্তৃক সংকলিত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন পুস্তকটি পুনরায় লেখেন।

প্রাচীন ভারতের আরও কয়েকজন চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে জীবক ও নাগার্জুন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। জীবক ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের পায়ের বিষাক্ত ক্ষত তিনিই নিরাময় করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার এবং তৎপুত্র অজাতশত্রুর আমলে তিনি ছিলেন রাজ চিকিৎসক। বহু দূরবর্তী স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ আসতো তার কাছে চিকিৎসা পাওয়ার জন্য।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন নাগার্জুন প্রাচীন ভারতের এক বিরাট বিস্ময়। তিনিই প্রথম লৌহ, পারদ প্রভৃতি ধাতুকে ওষুধরূপে প্রয়োগ করেছিলেন। ধাতুঘটিত বহু ওষুধের তিনি আবিষ্কর্তা। চিকিৎসকদের সুবিধার্তে একাধিক শাস্ত্রও তিনি রচনা করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার তার অন্যতম কীর্তি।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারাটি বহুদিন অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময় আবির্ভূত কয়েকজন প্রতিভাধর চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে গবেষণাও অব্যাহত রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে আচার্য বাগভট, মাধবকর ও চক্রপানিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই মৌলিক গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম পণ্ডিত ভাবমিশ্র। ইনিই শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সঠিক তথ্য আহরণ করেছিলেন। বিদেশি বণিকদের আগমনের ফলে এ দেশে এক নতুন রোগ দেখা দেয়। ভাবমিশ্র সেই রোগের নাম দিয়েছিলেন ফিরিঙ্গ রোগ (সিফিলিস)। রোগটির সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

ইবনে সিনা

আরবের অভ্যুত্থানের যুগে তারাও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেছিল। খলিফা হারুন-আল-রসিদের আমলে কতগুলো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রিক ও ভারতীয় চিকিৎসা পুস্তকগুলো আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেকালে আরবের কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নামও পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে 'ইবনে সিনা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম 'চিকিৎসা বিদ্যা কোষ' সংকলন করেছিলেন।

www.pathagar.com

গ্রিক বিজ্ঞানের অবনতির পর চিকিৎসা শাস্ত্রটা ইউরোপের ধর্মযাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের চিকিৎসা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক ক্ষেত্রে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ধর্মযাজকরা চিকিৎসা করতেন না। কখনও বা ওষুধের পরিবর্তে ঈশ্বরের নাম গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হতো। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ত ধর্মযাজকদের চিকিৎসা বন্ধ করতে নির্দেশ দান করায় চিকিৎসাশাস্ত্র ধর্মযাজকদের কবলমুক্ত হয়।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রথমে চলে আসে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির নাম। চিকিৎসকদের তিনি পরামর্শ দান করেছিলেন যাতে তারা মানবদেহ-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শরীরসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। ওই সময় থেকেই ইউরোপে মানবদেহ-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অবশ্য ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা খ্রিস্টজন্মের আগে প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আমলে। সে সময় আবার গ্রিক পণ্ডিতদের লেখা পুস্তকগুলো অনুশীলনের কাজ শুরু হলে ইউরোপ ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং গবেষণার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার ঘটে এবং শিক্ষার্থীদের মানবদেহ-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে বেলজিয়ামে আবির্ভূত হন বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ আন্দ্রে ভেসালিয়াস। মানবদেহের গঠন সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশ করেন তার 'দে হিউমানি কর্পোরিস ফাব্রিকা' নামক গ্রন্থে। ভেসালিয়াস ছিলেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার অধ্যাপক। তারই আগ্রহে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে উন্নতমানের গবেষণা শুরু হয়। তার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন রিয়ালডাস কোলাম্বাস এবং হিরোনিয়াস ফেব্রিকাস। প্রকৃতপক্ষে এদেরই গবেষণায় চিকিৎসা বিজ্ঞান নতুন রূপ গ্রহণ করে।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শল্যচিকিৎসায় নাপিতদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। ওই শতাব্দীতেই ফরাসী নাপিতরা শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাদের মধ্যে আব্রোয়াজ পিয়েরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন মাতার জননালীতে আবদ্ধ শিশুর প্রসব পদ্ধতি। এই সময় সুইজারল্যান্ডে প্যারাসেলসাস নামে এক চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথম ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করেন অ্যান্টিমনিকে।

১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভেসালিয়াস গ্যালেনের রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কীয় তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছিলেন কিন্তু কোনো নতুন মতবাদ তিনি রাখেননি।

www.pathagar.com

মাইকেল সারভেটাস নামে একজন শরীরতত্ত্ববিদ মনুষ্যদেহে রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করলেন 'রক্ত হৃৎপিণ্ডে ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাম প্রকোষ্ঠে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে'। তার এই মতবাদে অসন্তুষ্ট হন ধর্মযাজকরা। বিশেষ করে সারভেটাস যখন বললেন, 'আত্মা রক্তের মধ্যেই নিহিত থাকে' তখন প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন বলে তাকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে। সারভেটাসের লেখা বইটিকেও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পরে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক এবং ভেসালিয়াসের সহযোগী রিয়ালডাস কোলাম্বাস রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে পুনরায় তুলে ধরেন সারভেটাসের মতবাদকে। পুনরায় শুরু হয় বিতর্ক। 'সিজালপিনো', 'জিয়োর্ডানো ব্রুনো' প্রমুখ শরীরতত্ত্ববিদও সারভেটাসের মতকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু তাদের কেউই উক্ত মতবাদকে সাহস করে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেননি।

উইলয়াম হার্ভে

অবশেষে ইংরেজ শরীরতত্ত্ববিদ স্যার উইলয়াম হার্ভে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক তথ্য আবিষ্কার করে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদের অবসান ঘটান। প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়।

হার্ভের আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে গবেষণা বিজ্ঞানীরা অব্যাহত রেখেছিলেন। সেসব গবেষণা একদিকে যেমন হার্ভের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, অপরদিকে তেমনই কিছু কিছু নতুন তথ্যও চিকিৎসা বিজ্ঞানে সংযোজিত হয়েছিল। হার্ভের পরীক্ষা করতে গিয়েই রবার্ট বয়েল আবিষ্কার করেন ধমণী ও শিরার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সূক্ষ্ম ছিদ্র। লিউয়েন হুক নামক এক চশমা বিক্রেতা অনুবীণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ব্যাপারটা আরও সহজ হলো। লিউয়েন হুক নিজেই ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ব্যাঙের পায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। প্রাণীদেহ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইতালির প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মালপিগি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেন এবং তিনিও ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যাঙের ফুসফুসের মধ্যকার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আবিষ্কার করলেন। অপরদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংরেজ চিকিৎসাবিজ্ঞানী সিডেনহাম এবং ইতালীয় বিজ্ঞানী

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

www.pathagar.com

মোরগাগ্নি বিজ্ঞানসম্মত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন ও মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের উপর গুরুত্বারোপ করলেন।

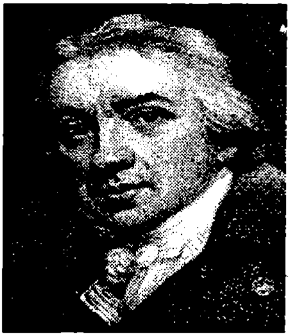

এডওয়ার্ড জেনার

সপ্তদশ শতাব্দীর কতগুলো আবিষ্কারও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা করে। সেই আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তারপর চিকিৎসাবিদ 'লেনেক' আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ ও শল্যচিকিৎসক চেম্বারলেন আবিষ্কৃত প্রসব-সহজীকরণ যন্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনারের হাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব সূচিত হয়। তাঁর বসন্তের টিকা আবিষ্কার একদিকে রোধ করল মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি বসন্তকে। অপরদিকে প্রথম জানা গেল, কোনো রোগজীবাণুকে সীমিতভাবে সুস্থদেহে প্রবেশ করালে শরীর রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। এই প্রথম মানুষ একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে বিতাড়িত করার উপায় উদ্ভাবন করলো। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর জেনারের আবিষ্কারের কোনো তুলনা হয় না। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বসন্তের টিকা।

লুই পাস্তুর

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান লাভ করে অমিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এবং বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী লুই পাস্তুরকে। অথচ পাস্তুর চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী। কিন্তু সারাটি জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে। তিনিই পৃথিবী থেকে নিবারণ করেছেন ভয়ঙ্কর জলাতঙ্ক রোগের ভীতি আর আবিষ্কার করেছেন গবাদি পশুর এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা। কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কারও তার জীবনের অন্যতম কীর্তি। পাস্তুর তাই সারা পৃথিবীর চিকিৎসকদের কাছে এবং আর্ত-পীড়িত মানুষের কাছে আজও স্মরণীয়।

স্যার রোনাল্ড রস

পাস্তুরের গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট সাড়া এনে দেয়। পৃথিবীর দুরারোগ্য

www.pathagar.com

ব্যাধিগুলোকে বিতাড়িত করার জন্য এবার সচেষ্ট হলেন বিজ্ঞানীরা। তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি পাস্তুরের সমসাময়িক জার্মান জীবাণু তত্ত্ববিদ রবার্ট কোখের অ্যানথ্রাক্স ও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার।

ইংরেজ চিকিৎসাবিদ স্যার রোনাল্ড রসের ম্যালেরিয়ার পরজীবী ও তার জীবাণু আবিষ্কার এবং স্কটিশ জীবাণু তত্ত্ববিদ লিশম্যানের কালাজ্বরের পরজীবী আবিষ্কার। এদেরই গবেষণাকে কেন্দ্র করে আবিষ্কৃত হলো কলেরার টিকা এবং মশা ধ্বংসের দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ। কালাজ্বরের প্রতিষেধক ইউরিয়া ষ্টিবামাইন আবিষ্কার করলেন প্রখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান বিজ্ঞানী ফিরখভ ভিত্তি স্থাপন করলেন প্যাথলজি বা নিদান তত্ত্বের। চিকিৎসায় রাসায়নিকঘটিত ওষুধ প্রয়োগের সূচনা করলেন আর এক জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী এহর লিখ। অন্যদিকে শল্য চিকিৎসার সময় জীবাণু সংক্রমণ রোধের জন্য রাসায়নিক বীজবারক পদার্থের ব্যবহার শুরু করলেন ইংরেজ শল্য চিকিৎসক লিস্টার।

শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ক্লোরোফর্মের মাধ্যমে চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সিম্পসন। ক্লোরোফর্মের মাধ্যমে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করিয়ে অস্ত্রোপচার করার পদ্ধতি তারই অবদান। সিম্পসনই প্রকৃতপক্ষে দূর করেছেন রোগীর মন থেকে অস্ত্রোপচারের ভয়াবহতা।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে পেনিসিলিন আবিষ্কার। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এক ধরনের ছত্রাকের মধ্যে রোগ নিরাময় ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু ওষুধ হিসেবে পেনি-সিলিনকে তিনি নিষ্কাশন করতে পারেন নি। ওষুধ হিসেবে মানুষ পেনিসিলিনকে লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এফ. জি. বান্টিং আবিষ্কৃত ডায়াবেটিকসের ওষুধ ইনসুলিন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জি. ডোমাগ কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রন্টোসিল নামক ওষুধ। উক্ত আবিষ্কারের মাধ্যমে ডোমাগই প্রকৃতপক্ষে সালফারজাতীয় ওষুধের ব্যবহার শুরু করেছিলেন।

ডা. ফ্লোরি এবং বিশিষ্ট জার্মান রসায়নবিদ চেইনের প্রচেষ্টায় পেনিসিলিন সুলভ হওয়ার পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত্র হয়। পেনিসিলিনের অদ্ভুত রোগ নিরাময় ক্ষমতা মুগ্ধ করে বিশ্ববাসীকে। কিন্তু কিছুদিন পর পেনিসিলিনের ব্যর্থতাও প্রকাশ পায়। ব্যর্থতা ঢাকতে পুনরায় শুরু হয় গবেষণা। এই পর্যায়ে আমেরিকা

www.pathagar.com

ডা. ওয়াক্সম্যান

প্রবাসী ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. ইয়েল্লপ্রাভদা সুব্বারাওয়ের অবদান চিরকাল বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। অরিও মাইসিন, সুবা-মাইসিন প্রভৃতি বহু অ্যান্টিবায়োটিকের তিনি আবিষ্কারক। তাছাড়াও তিনি স্প্রু এবং পেলেগ্রা নামক দুটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন।

যন্ত্রপাতি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নতুন রূপ খুঁজে পায়। একদিকে যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার শুরু হয় অপরদিকে তেমনি নানাবিধ যন্ত্রপাতি শল্যচিকিৎসা ও দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

ডা. ওয়াক্সম্যানের যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক এবং জোনাস সালকের পোলিওর টিকা আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দুটি বড় অবদান।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই শাখাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের গঠন, বিন্যাস ও সংস্থান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অ্যানাটমি বা শরীর সংস্থান বিদ্যা।

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ফিজিওলজি বা শরীরবিদ্যা।

৩. ওষুধের শ্রেণিবিভাগ ও ক্রিয়া সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ফার্মোকোলজি বা ভেষজবিদ্যা।

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগজনিত বিদ্যা প্যাথলজি বা নিদানতত্ত্ব।

৫. রোগ জীবাণু ও তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও জীবাণু বিজ্ঞান বা ব্যাকটিরিওলজি।

৬. অস্ত্রোপচার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিরোপন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র শল্যশাস্ত্র বা সার্জারি।

৭. দেহের রাসায়নিক উপাদান ও তাদের বিপাক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান প্রাণরসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রি।

৮. বিভিন্ন রোগে প্রযোজ্য ওষুধ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র মেডিসিন বা চিকিৎসা শাস্ত্র।

৯. স্ত্রীজননতন্ত্রের রোগ ও সন্তান জন্ম বিষয়ক বিদ্যা গাইনোকোলজি এন্ড অবস্টেট্রিকস বা স্ত্রীরোগবিদ্যা।

১০. মহামারী প্রতিরোধ, পৌরশাস্ত্র সম্বন্ধীয় শাস্ত্র হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্য। নিচে কয়েকটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

শরীরবিদ্যা ও শরীর সংস্থান

জীবিত প্রাণীর অঙ্গ, দেহকলা বা টিসু, কোষ, কঙ্কাল, শরীরের নানাবিধ যন্ত্রপাতি, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া, শিরা, ধমনী প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এই দুই শাখার প্রধান বিষয়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চরক সংহিতায় এই দুই শাখা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা রয়েছে। মানবদেহ ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করেছিলেন বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রথম খণ্ডে মানবদেহের হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পরিচয়, গঠনপ্রণালী ও কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া রক্ত সংবহন তন্ত্র, পরিপাকক্রিয়া, মলমূত্রাদির বিবরণ, গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ প্রভৃতি মস্তিষ্কে কেমন অনুভূতি জাগায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আজকের উন্নত শরীরবিদ্যা ও শরীর সংস্থানের মধ্যেও এগুলো অন্তর্ভুক্ত।

এই দুই শাখা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন গ্রিসের হিপোক্রিটাস, অ্যারিস্টোটল ও গেলেন। মধ্যযুগে ইউরোপের রেনাসাঁসের আমলে এই শাখাগুলোকে সুদৃঢ় করেন উইলিয়াম হার্ভে। বর্তমানে উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মানবদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, পেশিতন্ত্র, কঙ্কালতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র-সহ নানা তন্ত্রের সুসংহত ক্রিয়ার দ্বারাই প্রাণিদেহের স্বাভাবিক কাজ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০৬টি হাড় দিয়ে গঠিত অস্থির কাঠামো, উর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের হাড় ও পেশিগুলোর সাহায্যেই সম্ভব হয় চলাফেরা, ওঠা-বসা, কাজ-কর্ম সবকিছু। এগুলোর পরিপূর্ণ বিবরণই শরীর বিদ্যা ও শরীর সংস্থানের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জীবাণুবিদ্যা

পৃথিবীর প্রাচীন কোনো চিকিৎসা গ্রন্থে জীবাণুর উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে, 'রোগের মূলে আছে এক প্রকার অদৃশ্য জীবের ক্রিয়া'। বিজ্ঞানের এই শাখাটির জন্ম প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী জীবাণু তত্ত্ববিদ লুই পাস্তুরের হাতে। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে জীবদেহে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

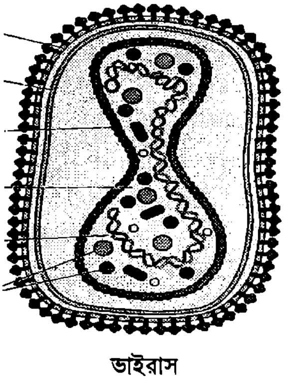

ভাইরাস

বর্তমানে গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, জীবজন্তুর নানা ব্যাধির সঙ্গে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ভাইরাসরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জীব। ওদের খালি চোখে দেখা যায় না, অনেক সময় সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও

www.pathagar.com

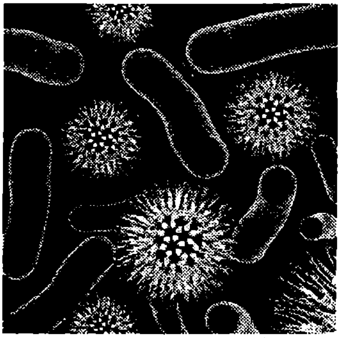
ব্যাকটেরিয়া

দেখা যায় না। বর্তমানে অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, নানা ধরনের ভাইরাস জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ এমনকি জীবাণুর দেহেও আশ্রয় গ্রহণ করে। হাম, বসন্ত, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, মস্তিষ্কের এবং যকৃতের প্রদাহজনিত নানাপ্রকার রোগের পেছনে রয়েছে ভাইরাসের আক্রমণ।

ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের মতো এত ক্ষুদ্র নয়। এর মধ্যে অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদের লক্ষণই প্রকট। নানা প্রকার জৈব পদার্থে, খাদ্য বস্তুতে, মৃত অথবা জীবিত প্রাণি কিংবা উদ্ভিদ-দেহে পরজীবীরূপে বাস করে এবং যেখানে বাস করে সেখান থেকেই খাদ্য আহরণ করে।

ব্যাকটেরিয়ারা নানা জাতের। কোনো কোনো জাতের ব্যাকটেরিয়া জীবদেহে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে আবার এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা উপকারও করে। উদ্ভিদভোজী প্রাণীর পৌষ্টিকনালিতে এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। ওরা খাদ্যের দুষ্প্রাচ্য সেলুলোজকে পরিপাক করতে যথেষ্ট সাহায্য করে প্রাণীদের যথেষ্ট উপকার করে থাকে। রোমন্থক প্রাণির পাকস্থলিতে যে জাতীয় ব্যাকটেরিয়ারা বাস করে তারা ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থেকে প্রোটিনের সংশে-ষণ ঘটায়। আরও কয়েক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নানাদিক থেকে জীবের উপকার সাধন করে। অন্যদিকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও অনেক।

ব্যাকটেরিয়ারা ক্ষুদ্র হলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এরা উদ্ভিদ জগতের অন্তর্ভুক্ত এককোষী অথবা বহুকোষী জীব। এদের আকৃতি মোটামুটি তিন প্রকারের। গোলাকৃতি, দণ্ডাকৃতি ও কুণ্ডলাকৃতি। গোলাকৃতিগুলোকে বলা হয় কক্কাস, দণ্ডাকৃতিদের বলা হয় ব্যাসিলাস এবং কুণ্ডলাকৃতিদের বলা হয় স্পাইর‍্যাল।

কক্কাস আবার নানা প্রকারের। তাদের মধ্যে স্টেপটোকক্কাসরা কণ্ঠের প্রদাহজনিত ব্যাধি এবং নিউমোনিয়া রোগের সৃষ্টি করে। স্ট্যাফাইলোকক্কাসরা তেমন ক্ষতিকারক নয়! নাইসেরিয়া জাতীয় কক্কাস থেকে মস্তিষ্কে ঝিল্লির প্রদাহজনিত রোগ ও গনোরিয়া রোগ হয়।

যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, টাইফয়েড, রক্ত আমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিরা দণ্ডাকৃতি বা ব্যাসিলাস জাতীয় কক্কাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। কলেরার জীবাণু দেখতে কমার (,) মতো সামান্য বাঁকা। ওই জীবাণুকে 'কমা ব্যাসিলাস' বলা হলেও ওরা কুণ্ডালাকৃতি বা স্পাইর‍্যাল ব্যাকটেরিয়ার পর্যায়ে পড়ে। সিফিলিস রোগের কারণ 'ত্রেপোনেমা পাল্লিদা' নামক ব্যাকটেরিয়ারাই যথার্থ স্পাইর‍্যাল ব্যাকটেরিয়া।

www.pathagar.com

যেসব বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে জীবাণু বিদ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ফ্রাকাসতোরোর নাম উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন, রোগের মূলে আছে অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা। তবে ওই কণাগুলোর প্রকৃত পরিচয় তিনি প্রদান করতে পারেন নি। ডাচ চশমা বিক্রেতা লিউয়েন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্বহস্তে নির্মাণ করে প্রথমে জীবাণুদের দেখতে পান। পচা পানিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলেন, অজস্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সেই পানির মধ্যে কিলবিল করছে। তিনি এই দৃশ্য নিজে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি, বহু জনকে দেখিয়েছিলেন। সেদিনই মানুষ বিশ্বাস করেছিল, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বহু জীব বাস করে। লিউয়েন হুক সারাজীবন ধরে কেবল জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের দাঁতের গোড়ায়, পাকস্থলিতে নানাজাতীয় জীবাণু বাস করে। তাই বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মাঝে খুব গরম কফি মুখে ঢেলে দিয়ে অদৃশ্য জীবাণুদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করতেন। লিউয়েন হুকই প্রথম ব্যাকটেরিয়ার আকৃতিগত বর্ণনা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ল্যাজারো স্পালানজেনির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। স্পালানজেনিও একরকম সারাজীবন ধরে জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে জীবাণুবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনিই। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জীবাণুদের কৃত্রিমভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হন।

পরবর্তীতে জেনারের বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার জীবাণুবিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

জেনারের পর আবির্ভূত হন লুই পাস্তুর। বিজ্ঞানভিত্তিক বীজাণুবিদ্যার চর্চা তারই হাতে শুরু হয়। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, মদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পেছনে, দুধকে দইতে পরিণত করায়, গুটিপোকার মড়কের ক্ষেত্রে, অ্যানথাক্স ও জলাতঙ্ক রোগের মূলে, সর্বত্রই সেই অদৃশ্য জীবাণুর হাত। লুই পাস্তুরের জীবাণুবিদ্যায় এমন অবদান আছে যে, তাকে 'জীবাণুবিদ্যার জনক' বলা হয়। বিভিন্ন রোগে টিকার ব্যবহারও তারই আবিষ্কার।

অন্যান্য যারা জীবাণুবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন রবার্ট কোখ, কেবস, লোফলার, বেহরিং, কিটাসাটো ইয়েরমিন ও ফেবার।

শল্য চিকিৎসা

ভারতবর্ষে শল্য চিকিৎসার উদ্ভব হয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 'সুশ্রুত সংহিতা' মূলত শল্যচিকিৎসার পুস্তক। প্রাচীনকালে যোদ্ধাদের দেহ থেকে শল্য বা তীর উৎপাটনের প্রক্রিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 'শল্যতন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল। শল্যতন্ত্র থেকেই 'শল্যচিকিৎসা' কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

সুশ্রুত শল্যতন্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। সেই বিভাগগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ছেদন, ভেদন, লেখন, এয্যন, আহরণ, বিস্রবণ ও সীবন। তাছাড়া পুনর্গঠনিক শল্যচিকিৎসা বা প্লাস্টিক সার্জারির কথাও সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের আমলেও মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হতো এবং শরীরের কোনো স্থান থেকে চামড়াকে স্থানান্তর অথবা এক স্থানের চামড়াকে অন্যস্থানে সংযোজিত করা হতো। বর্তমানে এই প্রণালিকে পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা বা প্লাস্টিক সার্জারি বলা হয়।

জন হান্টার ও উইলিয়াম হান্টার

ভারতের উন্নত শল্যচিকিৎসা প্রণালিকে প্রাচীনকালে সুমের, ব্যাবিলন, মিশর এবং আরবরা সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মাধ্যমে এই বিদ্যা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কর্তিত নাসার পুনর্গঠন পদ্ধতিকে আজও পাশ্চাত্যে বলা হয় 'ইন্ডিয়ান রাইনো প্লাসটি'।

আধুনিক শল্যচিকিৎসার গোড়াপত্তন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন হান্টার ও উইলিয়াম হান্টার নামে দুই ব্রিটিশ চিকিৎসকের হাতে। এরা ছিলেন দুই ভাই। অস্ত্রোপচারের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য তারা সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। সে সময় জীবাণুরোধক কোনো ওষুধ আবিষ্কৃত না হওয়ায় তারা তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি।

পরবর্তীতে লিউয়েন হুক, স্প্যালানজেনি এবং লুই পাস্তুরের গবেষণা থেকে মানুষ জীবাণুর প্রকৃত পরিচয় লাভ করে। সেই সঙ্গে উদ্ভূত হলো কিছু কিছু বীজবারক ওষুধ। তারপর সিম্পসনের চেতনানাশক দ্রব্যের ব্যবহার শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্তও শল্যচিকিৎসা তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ, জীবাণু নিধনের কোনো উপায় শল্যচিকিৎসকদের

www.pathagar.com

জানা ছিল না। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান-বিজ্ঞানী ডোমাগ 'প্রনটোসিল' আবিষ্কার করার পর কিছুটা উন্নত হয়েছিল। অবশেষে সালফারজাতীয় ওষুধ ও পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর শল্যচিকিৎসার উন্নতি দ্রুততর হয়।

শল্যচিকিৎসা আজ উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছে। চিকিৎসকগণ এখন অবলীলাক্রমে চোখ, হৃৎপিণ্ড, কিডনি প্রভৃতি অধিরোপন করতে পারছেন, পুনর্গঠন করছেন শরীরের যে কোনো অঙ্গকে। অধুনা শল্যচিকিৎসা আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলোর মধ্যে প্রধান হলো সাধারণ শল্যচিকিৎসা বা জেনারেল সার্জারি, হৃৎপিণ্ড ও শিরা-ধমনীর শল্যচিকিৎসা বা কার্ডিও ভ্যাসকিউলার সার্জারি, পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা বা প্লাস্টিক সার্জারি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শল্যচিকিৎসা বা গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারি, চোখ শল্যচিকিৎসা বা অফথ্যালমোলজিক্যাল সার্জারি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের শল্যচিকিৎসা বা নিউরো সার্জারি অন্যতম।

ভেষজবিদ্যা

ভেষজবিদ্যা শব্দটির বাংলা রূপান্তর 'ফার্মাকোলজি'। Pharmakon এবং logos নামক দুটি গ্রিক শব্দের সমষ্টি হচ্ছে Pharmacology। Pharmakon শব্দের অর্থ ড্রাগ বা ওষুধ এবং logos শব্দের অর্থ কোনো বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান। অপরদিকে 'ড্রাগ' শব্দটি এসেছে ফরাসি Drouge শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে লতাপাতা। তাই ফার্মাকোলজি কথাটির মধ্যেই 'বনৌষধি' কথাটি নিহিত আছে। অতএব ফার্মাকোলজিকে ভেষজবিদ্যা নামে অভিহিত করা যায়।

ভেষজবিদ্যাও ভারতের প্রাচীন বিদ্যা। অথর্ববেদে এই বিদ্যাকে প্রধান বিদ্যারূপে গণ্য করা হয়েছে। তবে এই বিদ্যা পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাপ্ত হয় 'চরক সংহিতা' রচনার সময়। ওই গ্রন্থে কয়েকশো উদ্ভিদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যত উদ্ভিজ ওষুধ প্রচলিত ছিল সবগুলোকে সংগ্রহ করে 'মেটেরিয়া মেডিকা' জাতীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছিলেন।

জন্ম থেকেই মানুষকে ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। যেদিন মানুষ রোগ-ব্যাধির কারণসমূহ আদৌ অবগত হয়নি সেদিনও ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাদের নানা উপায় চিন্তা করতে হয়েছিল। তখন তারা ছিল উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই বোধ হয় অসুখের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্যও শরণাপন্ন হয়েছিল উদ্ভিদের। বনে-বাঁদাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো, লতাগুল্মের ফল-পাতা চিবিয়ে খেতো, শেকড়-বাকড়ও পরীক্ষা করে দেখতো। বিষাক্ত ফল খেয়ে অনেক মানুষকে সে সময় প্রাণ হারাতেও হয়েছিল।

সভ্যতা বিকাশের পূর্বে গাছগাছড়াকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিল মানুষ। হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করেছিল কতগুলো উদ্ভিদের গুণ। পরবর্তীকালে সুস্থ

www.pathagar.com

ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই রচিত হয়েছিল ধর্মশাস্ত্র। সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে যেমন নীতিজ্ঞানের কথা আছে তেমনই রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য ভেষজের গুণাগুণও বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের অথর্ববেদে, মিশরের প্যাপিরাসে আসিরীয়দের লেখমালায়, চিনাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে, খ্রিস্টানদের বাইবেলে, সর্বত্রই উল্লেখ আছে ভেষজের কথা। এমনকি প্রাচীন আমেরিকার অধিবাসীরা সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা সত্ত্বেও কতগুলো উদ্ভিদের ভেষজগুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিল।

প্যারাসেলসাস

বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে শাখাটি ভেষজবিদ্যা নামে পরিচিত, সেটি ইউরোপেরই অবদান। একশো বছর আগেও ভেষজবিদ্যা নামে কোনো শাখার উদ্ভব হয়নি। যদি এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগে প্যারাসেলসাস আগ্রহী হয়ে ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তারই প্রচেষ্টায় একদল গবেষকের উদ্ভব হয়। আবিষ্কৃতও হয়েছিল বহু তথ্য। অবশেষে প্যারাসেলসাসেরই প্রচেষ্টায় রসায়নবিদরাও এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দেখতে দেখতে চিকিৎসাবিজ্ঞান লাভ করে প্রচুর ওষুধ। তাই আধুনিক ভেষজবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন প্যারাসেলসাসই।

প্যারাসেলসাসের পরও ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহত থাকে। শত শত বছরের ব্যবধানে হাজার হাজার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। সে সময় ওষুধ প্রস্তুতকারক ওষুধ তৈরি করতেন আর অন্ধের মতো ব্যবহার করতেন চিকিৎসকরা। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ফার্মাকোলজি নামক শাস্ত্রটির উদ্ভব।

ওষুধের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, তার দোষগুণ, প্রস্তুতির উপায়, শরীরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শরীরে প্রবেশ করার পর কোথায় কোথায় এবং কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া শরীরে দেখা দেয় কিনা, কি মাত্রায় ওষুধ গ্রহণ করলে ফলপ্রসু হয় ইত্যাদি সব বিষয়ই এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে দ্রব্যগুণ, ভেষজপ্রস্তুতকরণ বিধি, ওষুধ পরিচিতি, বিষপ্রকরণ, মাত্রা বিজ্ঞান, ওষুধ প্রয়োগবিধি এবং রসায়ন চিকিৎসা উক্ত শাস্ত্রটির মূল বিষয়।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কতগুলো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

সাল	আবিষ্কার ও আবিষ্কারক
খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী	: ইউনানি চিকিৎসা, পিথাগোরাস (গ্রিস)।
খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী	: বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ বিশে-ষণ, হিপোক্রিটাস (গ্রিস)।
খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী	: কম্পারেটিভ অ্যানাটমি, অ্যারিস্টোটল (গ্রিস)।
খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দী	: শরীর সংস্থান, গ্যালেন (গ্রিস)।
পঞ্চদশ শতাব্দী	: শরীর সংস্থান বিষয়ে জ্ঞানের প্রসার, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (ইতালি)।
ষোড়শ শতাব্দী	: নরদেহের গঠন, ভেসেলিয়াস (বেলজিয়াম)।
ষোড়শ শতাব্দী	: ভেষজবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা, প্যারাসেলসাস, (সুইজারল্যান্ড)।
সপ্তদশ শতাব্দী	: রক্ত সঞ্চালন তথ্য, হার্ভে (ইল্যান্ড)।
ষোড়শ শতাব্দী	: ভেষজবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা, প্যারাসেলসাস (সুইজারল্যান্ড)।
সপ্তদশ শতাব্দী	: বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, সিডেনহাম (ইংল্যান্ড)।
অষ্টাদশ শতাব্দী	: শরীরে রোগকেন্দ্র নির্ণয়, মোরগাঞ্চি (ইতালি)।
১৭৯৬	: বসন্তের টিকা, এডওয়ার্ড জেনার (ইংল্যান্ড)।
১৮১৯	: স্টেথোস্কোপ, লেনেক (ফ্রান্স)।
ঊনবিংশ শতাব্দী	: প্রসব সাঁড়াশি, চেম্বারলেন (ইংল্যান্ড)।
ঊনবিংশ শতাব্দী	: কোষভিত্তিক নিদানতত্ত্ব, ফিরখভ (জার্মানি)।
ঊনবিংশ শতাব্দী	: জীবাণু সংক্রমণ রোধের উপায়, লিস্টার (ইংল্যান্ড)।
ঊনবিংশ শতাব্দী	: চেতনা নাশক দ্রব্যের ব্যবহার, সিম্পসন (স্কটল্যান্ড)।
১৮৭৭	: ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রমণের কারণ, প্যাট্রিস ম্যানসন (ইংল্যান্ড)।

www.pathagar.com

১৮৮১	:	মানব রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু, চার্লস লাভেরণ (ফ্রান্স)।
১৮৮১	:	অ্যানথ্রাক্স রোগ প্রতিষেধক, পাস্তুর (ফ্রান্স)।
	:	জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক, পাস্তুর (ফ্রান্স)
১৮৮২	:	যক্ষ্মা রোগের জীবাণু, রবার্ট কোখ (জার্মানি)।
১৮৮৩	:	কলেরা রোগের জীবাণু, রবার্ট কোখ (জার্মানি)।
১৮৮৪	:	ডিপথেরিয়ার জীবাণু, ক্লেবস, লোফলার।
১৮৮৮	:	প্লেগের জীবাণু, বেহ্‌রিং, কিটাসাটো।
১৮৮৯	:	ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু, বেহ্‌রিং, কিটাসাটো।
১৮৯৪	:	ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ, প্যাট্রিক (ইংল্যান্ড)।
১৮৯৮	:	অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার বাহক, রোনাল্ড রস (ইংল্যান্ড)।
১৯০৭	:	রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার, এহ্‌রলিচ (জার্মানি)।
১৯২৩	:	কালাজ্বরের ওষুধ, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (ভারত)।
১৯২৩	:	ডায়াবেটিকসের ওষুধ, বান্টিং (কানাডা)।
১৯২৮	:	পেনিসিলিন, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (ইংল্যান্ড)।
১৯৩২	:	প্রন্টোসিল, ডোমাগ (জার্মানি)।
১৯৪২	:	ওষুধরূপে পেনিসিলিন, হাওয়ার্ড ফ্লোরি (ইংল্যান্ড) ও আর্নেস্ট বোরিস চেইন (জার্মানি)।
১৯৫২	:	যক্ষ্মার প্রতিষেধক, ওয়াক্সম্যান (আমেরিকা)।
–	:	পোলিওর টিকা, জোনাস সাল্‌ক (রাশিয়া)।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

মাথার উপর অনন্ত অসীম নীল আকাশ মানুষের কাছে কৌতূহলের বিষয় সৃষ্টির শুরু থেকেই। দিনের বেলায় আকাশে থাকে সূর্য আর রাতে চাঁদের আলো এবং নক্ষত্রপুঞ্জের আলো সবই মানুষের কৌতূহলের বিষয়। কতকাল যে মানুষ আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছে তার কোনো হিসাব নেই। অবশেষে একদিন আবিষ্কৃত হয়সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধি। শুরু হয় দিন, মাস ও বছর গণনা। আবিষ্কার হয় ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি।

অগ্রযাত্রার পটভূমি

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রাচীনকালের মানুষ অনেকগুলো গ্রহকে আবিষ্কার করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর যেমন পড়ছে তেমনই পড়ছে মানুষের উপর। তারা সে সময় আকাশের রাশিচক্র ও সাতাশটি নক্ষত্রের গতিবিধি আবিষ্কার করেছিল। এগুলোর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দেশগত ভাগ্যের সম্পর্ক আছে—এমন ধারণাও গড়ে উঠেছিল। তাই উদ্ভব হয়েছিল ফলিত জ্যোতিষের! তবে গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না প্রাচীনকালে। অন্যদিকে ভাগ্যলিপি গণনার জন্যই সে-সময় জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করা হতো। পরবর্তীত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের মতো অত্যাশ্চার্য ঘটনাগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমে মিশর, সুমেরু, ব্যাবিলন প্রভৃতি সভ্যদেশগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতো। এই বিদ্যায় ভারতবর্ষও ছিল সমৃদ্ধ। আর্যরা এ উপমহাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো।

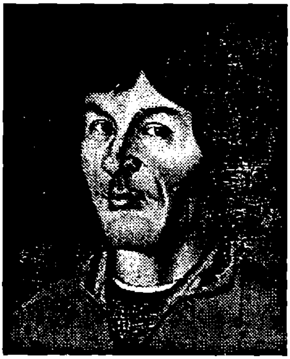

নিকোলাস কোপারনিকাস

ভারতবর্ষেও কয়েকজন অসামান্য জ্যোতির্বিদদের জন্ম হয়েছিল। তাদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভাস্করাচার্য আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি।

ষোড়শ শতাব্দীতে নিকোলাস কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ থেকেই নব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

যুগ শুরু হয়। তবে বিজ্ঞানের এই শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন জোহানেস কেপলার। তিনিই প্রথম গ্রহদের কক্ষপথ সম্বন্ধে আভাস প্রদান করেন।

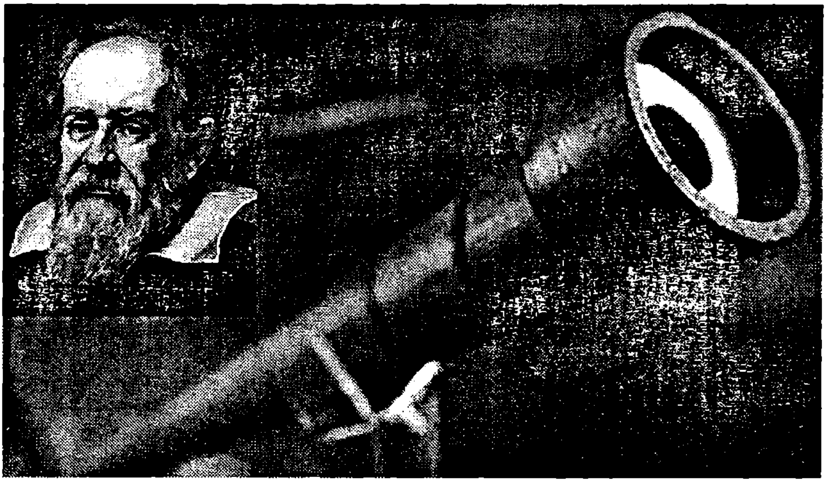

গ্যালিলিও ও তাঁর দুরবিন

দুরবিন আবিষ্কার এই শাখার উন্নতির মূলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও উচ্চশক্তি সম্পন্ন দুরবিন প্রস্তুত করে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। বৃহস্পতি ও শনির কয়েকটি উপগ্রহও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

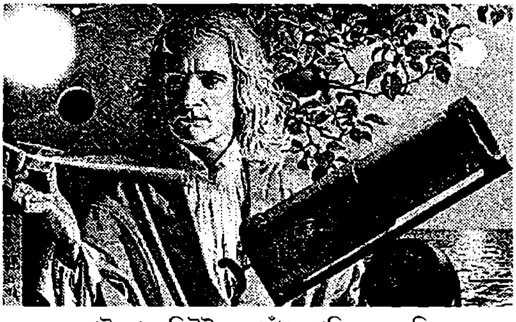

আইজ্যাক নিউটন ও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবিন

পরবর্তীতে আইজ্যাক নিউটন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে স্থাপন করেন দৃঢ়ভিত্তির উপর। তার অভিকর্ষ আবিষ্কার এবং বলবিদ্যার সাহায্যে গণনা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর সময় আবির্ভূত এডমন্ড হ্যালি ধূমকেতু সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রদান করে আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন।

বর্তমান শতাব্দীতে বর্ণালী বিশে-ষণ পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা আকাশের অজানা রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন। তারা অনুমান করেছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এবং নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের সৃষ্টি রহস্য। জ্যোতিষ্কদের উপাদান, তাপমাত্রা, বয়স,

www.pathagar.com

গতিপথ, পৃথিবীর এবং সূর্য থেকে দূরত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করতে পেরেছেন। আবিষ্কার করেছেন, কয়েকটি নক্ষত্রজগৎ, কোয়াসার, পালসার। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপও উদঘাটন করেছেন বিজ্ঞানীরা।

এডমন্ড হ্যালি ও হ্যালির ধূমকেতু

পূর্বের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞান এখন আর স্বনির্ভর নয়। অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞান এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একটির অনুপস্থিতি অপরটির কাছে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন। তদুপরি রসায়ন বিজ্ঞানকেও জ্যোতির্বিজ্ঞান সরিয়ে দূরে রাখতে পারেনি। গ্রহ-নত্রের উপাদান, নক্ষত্রপৃষ্ঠে তাপের উৎস, এমনকি বয়স গণণার ক্ষেত্রেও রসায়নবিজ্ঞান অপরিহার্য।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

পৃথিবীর আহ্নিকগতি

খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সে আমলে তার কথা কেউ বিশ্বাস করেন নি। আর্যভট্টের প্রায় হাজার বছর পর কোপারনিকাস যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তার লেখা বইতে উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও পুনরায় ঐ একই তথ্যকে প্রকাশ করেন। তবু সেদিনও উক্ত তথ্য স্বীকৃত হয় নি। পরিশেষে সমূহ বিরোধের মীমাংসা করেন বিজ্ঞানী নিউটন।

রহস্যময়ী চাঁদ

চাঁদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। চাঁদের ব্যাস, তার উপাদান, চাঁদের কলঙ্ক প্রভৃতি প্রায় সবই গ্যালিলিওর আবিষ্কার। তিনি ভেবেছিলেন, চাঁদে পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি, এমনকি সমুদ্রও আছে। গ্যালিলিও আরও মনে করেছিলেন, চাঁদে জীব থাকার সম্ভাবনাও আছে।

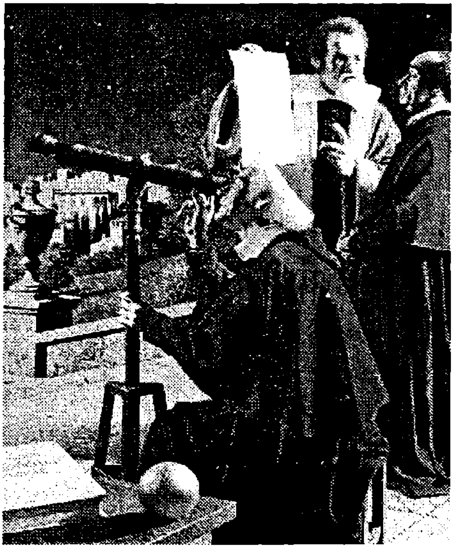

গ্যালিলিও ও তাঁর চাঁদ পর্যবেক্ষণ

বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, চাঁদে আবহমণ্ডল নেই, পানি নেই এবং জীবও নেই। পাহাড়-পর্বত, মৃত আগ্নেয়গিরি এবং গহ্বরে পরিপূর্ণ।

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ

বিজ্ঞানী নিউটন এই অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কর্তা। নিউটনই প্রথম ব্যাখ্যা করেন, পৃথিবী তার উপরের প্রতিটি বস্তুকণাকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। এ কারণে কোনো বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছে না।

www.pathagar.com

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি হলো, বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ কণা অপর কোনো কণাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণবল কণা দুটোর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এই মহাকর্ষ নিয়ম অনুযায়ী সূর্যের চারিদিকে গ্রহরা এবং গ্রহের চারদিকে উপগ্রহরা পরিক্রমণ করছে। দূরত্ব বেশি হওয়ার জন্য একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, সূর্যকেও এই নিয়মে পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলির চারদিকে এবং নক্ষত্রজগৎও স্থির নয়।

নবতারা

টাইকোব্রাহে

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহে মহাকাশের নবতারা আবিষ্কার করেন। তাঁর গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, নক্ষত্রেরও মৃত্যু আছে। মৃত্যুকালে নক্ষত্রের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে এবং পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন নক্ষত্রটিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় নবতারা বা 'নোভা'। প্রতি বছর আকাশে নবতারা দেখা যায়।

গ্রহদের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র

গ্রহদের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি ৭৭০ খ্রিস্টাব্দে গণিতজ্ঞ 'বোড' এবং তার সহকর্মী টিসিয়াস আবিষ্কার করেন। সূত্রটিকে মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া হয়েছে, যে কোনো দুটি গ্রহের মধ্যে দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের পরবর্তী গ্রহের অবস্থান। সূর্যের নিকটতম গ্রহগুলোর ক্ষেত্রে সূত্রটি কিছুটা প্রযোজ্য হলেও সুদূরতম গ্রহগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ইউরেনাস

ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনাসকে আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, একদা মিথুন রাশি পর্যবেক্ষণের সময় একটি আলোর চাকতি দেখতে পান হার্শেল। প্রথমে তার ধূমকেতু বলে মনে হয়েছিল। পরে বোড ও টিসিয়াসের সূত্র প্রয়োগ করে বুঝতে পারেন, ঠিক এমনই জায়গায় কোনো নতুন গ্রহ থাকলেও থাকতে পারে। অবশেষে অনুসন্ধানের পর হার্শেল আবিষ্কার করেন ইউরেনাসকে।

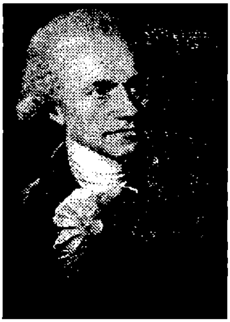

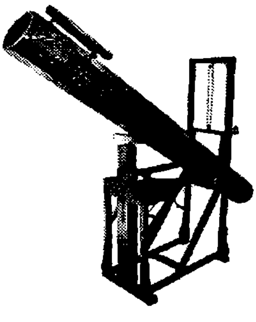

উইলিয়াম হার্শেল ও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবিন

www.pathagar.com

সিরিস নামক গ্রহাণু

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইতালির সিসিলির জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজি আবিষ্কার করেন। গ্রহদের ক্ষেত্রে বোড টিসিয়াসের সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তখনই তার সন্দেহ হয়েছিল, এই দুই গ্রহের মধ্যে অবশ্যই একটি গ্রহ থাকতে পারে। উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে আবিষ্কার করেন গ্রহাণুপুঞ্জের সবচেয়ে বড় গ্রহাণু সিরিসকে। তারপর আরও অনেক গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গেছে, হাজার হাজার ছোটবড় বস্তুপিণ্ড এই অঞ্চলে আছে। গ্রহদের মতো এরাও সূর্য পরিক্রমণ করছে অথচ আকারে এরা খুবই ক্ষুদ্র। আর আকারে ক্ষুদ্র বলেই এদেরকে বলা হয় গ্রহাণু। তবে গ্রহদের চেয়ে ওদের পথ অনেক বেশি উপবৃত্তাকার। গ্রহাণুদের মধ্যে একমাত্র সিরিসই আকারে বড়। তথাপি ওর ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমান দেবতার নামানুসারে পিয়াজি গ্রহাণুটির নামকরণ করেছিলেন সিরিজ।

নেপচুন

নেপচুন গ্রহ

আডামস এবং লেবেরিয়ার নামক দুজন অঙ্কবিজ্ঞানী ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। ইউরেনাস আবিষ্কৃত হলে বৃহস্পতি, শনি ও অন্যান্য গ্রহদের মহাকর্ষীয় টান হিসাব করে ইউরেনাসের গতিবিধি ঠিক করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করেন। তখনই তাদের ধারণা হয়, ইউরেনাসের পরও গ্রহ আছে। ইংরেজ বিজ্ঞানী আডামসই প্রথম গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। আবিষ্কার করেছেন ফরাসী বিজ্ঞানী লেবেরিয়ার। অন্ধকার মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে উক্ত গ্রহটির নাম রোমান সমুদ্র দেবতার নামানুসারেই রাখা হয়েছিল। সূর্য থেকে ২৭৯ কোটি মাইল দূরে ওর অবস্থান এবং সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ১৬৪.৫ বছর।

শনি গ্রহের বলয়

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী রচি শনি গ্রহের বলয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, গ্রহের চারদিকে পরিক্রমণরত উপগ্রহ যদি সেই গ্রহের ব্যাসার্ধের ২.৪৫ গুণের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি গ্রহপৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে। শনির আগে যে সমস্ত উপগ্রহ ছিল, তাদের একটি কালক্রমে 'রচির সীমানার' মধ্যে এসে পড়ায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই টুকরোগুলো

www.pathagar.com

শনির চারদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই টুকরোগুলো তিনটি স্তরে শনির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্তর তিনটি দুরবিনের চোখে তিনটি মনোহর বলয় বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ এবং শনির আরও একটি উপগ্রহের ধ্বংসের সময় খুব নিকটে। গ্রহের চারদিকে গ্রহের ব্যাসার্ধের ২.৪৫ গুণ দূরত্বকে বলা হয় 'রচির সীমানা'।

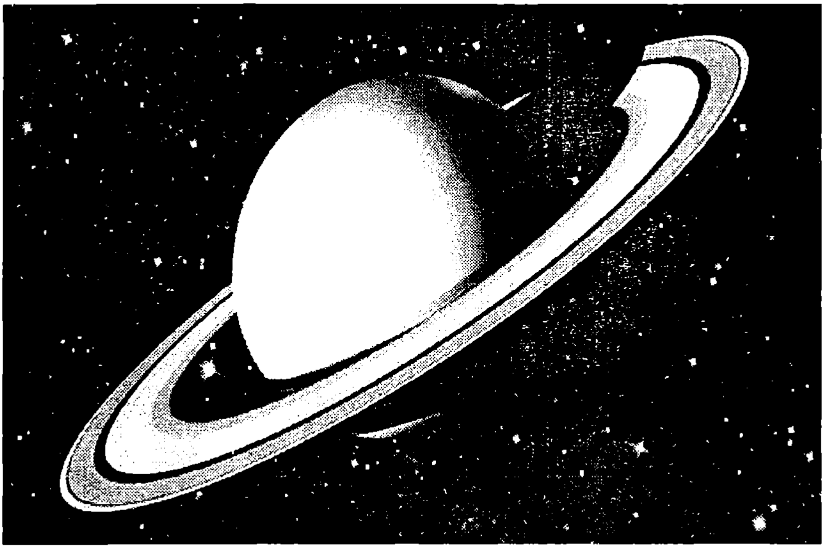

শনি গ্রহের বলয়

সেফাইড নক্ষত্র

দুরবিনের সাহায্যে আকাশে এমন অনেক নক্ষত্রকে দেখা যায় যাদের একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায় আবার পরক্ষণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ার মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় স্পন্দনকাল। সেফাইডদের স্পনন্দনকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ। আকাশে আরও এক ধরনের তারার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হলো যুগল নক্ষত্র। দূর থেকে ওদের একক নক্ষত্র বলে মনে হয়। ওরাও একে অপরের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পরিক্রমণ করতে করতে কখনো এরা পাশাপাশি হয়, আবার কখনো একটি অপরটির আড়ালে চলে যায়। যখন পাশাপাশি হয় তখন উজ্জ্বল দেখায় আর আড়াল হলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তবে সেফাইড তারারা একক নক্ষত্র। ওদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার কারণ, ওদের দেহটা নিজে থেকেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সঙ্কুচিত হলে উজ্জ্বল হয় আর প্রসারিত হলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। আমেরিকার হার্ভার্ড মানমন্দিরের বিখ্যাত মহিলা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরিয়েটা লিয়াভিট ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে

www.pathagar.com

সেফাইড তারা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেন। তার এই মূল্যবান আবিষ্কার থেকে সেফাইড তারা সমন্বিত সুদূর নীহারিকালোকের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

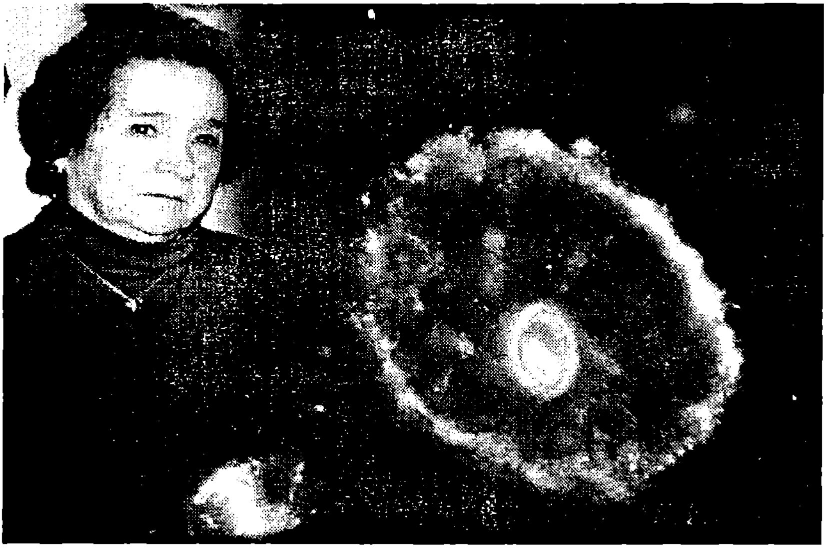

হেনরিয়েটা লিয়াভিট ও সেফাইড নক্ষত্র

নক্ষত্রের আবর্তন

আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রকে আমরা সাধারণত একক অবস্থায় আছে বলে মনে করি। কিন্তু ওরা সবাই একক নয়। একক নক্ষত্র কিছু আছে, তবে বেশিরভাগই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। গ্রহদের মতো ওরাও আবর্তন করে এবং আপন আপন কক্ষপথ অবলম্বনে পরিভ্রমণও করে, অর্থাৎ নক্ষত্ররাও স্থির নয়। এই সত্যটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সি. টি. এলভি এবং অটো স্টুভ ইয়েরর্কস মানমন্দিরে গবেষণাকালে উদঘান করেন।

প্লুটো

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ তরুণ গবেষক টমবাউ প্লুটো গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। তবে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পার্সিভ্যাল লাওয়েল নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গবেষণা করে ঠিক করেছিলেন, নেপচুনের পরে আরও গ্রহ আছে। তখন তিনি নতুন গ্রহটি অনুসন্ধানে মনোযোগী হন। কিন্তু দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর যখন তিনি কৃতকার্য হতে যাচ্ছেন—ঠিক সেই সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরই গবেষণাগারে গবেষণা করে টমবাউ তার আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করেন। 'পুটো'-এই নামের পেছনেও আছে এই দুই বিজ্ঞানীর নাম। পারসিভ্যাল লাওয়েলের দুটি অর পি এবং এল আর টমবাউর টি। অন্যদিকে গ্রিক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতালপুরীর দেবতার নামও প্লুটো। সৌরজগতের শেষ সীমায় অবস্থিত প্লুটোর অঞ্চল তমসাবৃত অঞ্চল ছাড়া

www.pathagar.com

আর কি! সূর্য থেকে ৩৬৭ কোটি মাইল দূরে থেকে ২৪৮ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সেখান থেকে সূর্যকে দেখা যায় আকাশের যে কোনো একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মতো।

ডপলার তত্ত্ব

পদার্থ বিজ্ঞানে ডপলার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দূরাগত ট্রেনের বাঁশির শব্দকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। কোনো ট্রেন যদি বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে চলে যায় তাহলে ট্রেনের আসার সময় বাঁশির শব্দ অত্যন্ত চড়া মনে হয়। স্টেশনে দাঁড়ালে স্বাভাবিক এবং স্টেশন ছেড়ে চলে গেলে বাঁশির শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ট্রেনের বাঁশি অবশ্য স্থির ও চলন্ত উভয় অবস্থাতেই প্রতি সেকেন্ডে একক সংখ্যক তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। আর আমরা জানি, শব্দ মাত্রই বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। তাই ট্রেন যখন আমাদের দিকে ছুটে আসে তখন আমাদের কানে প্রতি সেকেন্ডে বাঁশি কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গ অপেক্ষা আরও বেশি তরঙ্গ আঘাত করে। তাই শব্দকে জোরালো মনে হয়। কিন্তু দূরে চলে গেলে কম সংখ্যক তরঙ্গ কানে আসে বলে তীব্রতা হ্রাস পায়। উক্ত তত্ত্বটির আবিষ্কারক ডপলার। তাই তার তত্ত্বকে বলা হয় ডপলার তত্ত্ব।

ডপলার তত্ত্বকে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অসাধ্যকে সাধন করেছেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, কোনো নক্ষত্র আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার বর্ণালি বেগুনি আলোর দিকে সরে আসে এবং দূরে চলে গেলে লাল আলোর দিকে সরে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, কোন নক্ষত্র কত বেগে কোনদিকে এগিয়ে চলেছে। উক্ত আবিষ্কারটির মাধ্যমে পরবর্তীকালে পৃথিবীর গতিশীল রূপটি বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। তাছাড়া এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সির দূরত্বও নির্ণয় করা হয়েছে বর্ণালিতে লাল আলোর অবসরণ বেগ হিসেব করে। পরবর্তীতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী 'হাবল' এ বিষয়ে গবেষণা করে সফল হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাকাশের বহু তথ্য হস্তগত হয়েছে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে ডপলার তত্ত্বকে প্রয়োগ করে।

নক্ষত্রপৃষ্ঠে তাপের উৎস

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানী বেথে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজনের ফলে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়—এই সত্যটি আবিষ্কার করেন।

নক্ষত্ররাজি জন্মের সময় লাভ করে বিশাল হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার। কারণ, যে ঘন মেঘের স্তূপ থেকে নক্ষত্রের জন্ম হয় সেই মেঘের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন অণু ও পরমাণু। নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করার পর প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে উৎপন্ন করে হিলিয়াম। যতদিন তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডার শেষ না হচ্ছে ততদিন একই হারে তাপ বিলিয়ে যাচ্ছে। সে ভাণ্ডার এত বিশাল যে, কয়েকশ

www.pathagar.com

কোটি বছর ধরে চলে এই বিক্রিয়া। তারপর ভাণ্ডার শেষ হলেই চিরতরে নিভে যায় নক্ষত্র। অর্থাৎ তখনই নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে। বেথের আবিষ্কারের ফলে সূর্যের এত অফুরন্ত তাপ শক্তির কথা পৃথিবীর মানুষের কাছে ধরা পড়েছে।

ফ্রাউনহোফার রেখা

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। ভেতরের দিকে এই তাপমাত্রা আরও অনেক বেশি। তাই সেখানকার কোনো বস্তুই কঠিন বা তরল অবস্থায় নেই। সবকিছু গ্যাসীয় অবস্থায় অবস্থান করছে।

সূর্যের আবহমণ্ডল তিনটি অংশে বিভক্ত। আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। আলোকমণ্ডলের বহিরাবরণকে বলা হয় বিশোষণ মণ্ডল। এখানকার তাপমাত্রা আলোকমণ্ডল থেকে অনেক কম। যখন সূর্যরশ্মি আলোকমণ্ডল থেকে বিশোষণমণ্ডল ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন সেখানকার গ্যাসরাশি নিজ নিজ বর্ণালির আলোক সূর্যরশ্মি থেকে শোষণ করে নেয়! ঐ কারণে সূর্যরশ্মিকে বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশে-ষণ করলে যে সাত রঙের বর্ণালি পাওয়া যায় তাতে অসংখ্য কালো কালো রেখা দেখা যায়। ঐ রেখা প্রথম বিজ্ঞানী ফ্রাউনহোফার আবিষ্কার করেছিলেন বলে রেখাগুলোকে 'ফ্রাউনহোফার রেখা' বলা হয়। রেখাগুলোর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তার পরীক্ষা থেকে সূর্যের গঠন উপাদান এবং তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

সূর্য

নক্ষত্রের বর্ণালি

নক্ষত্রপৃষ্ঠে পদার্থ মাত্রই গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে এবং নক্ষত্রের সকল আলোকরশ্মি গ্যাস থেকে উৎসারিত হয়। তাই বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের রশ্মিকে বিশে-ষণ করলে নক্ষত্রের গঠন উপাদান নির্ণয় করা যায়। এই পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম সূর্যরশ্মিকে বিশে-ষণ করে তার মধ্যে পার্থিব বস্তুকণার সন্ধান লাভ করেন। সেই থেকে প্রমাণিত হয়, সূর্য থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে। কেবল সূর্য নয়, নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ রশ্মির বর্ণালি তারই পদ্ধতির সাহায্যে বিশে-ষণ করে জানা যায়, ঐ নক্ষত্র কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত। তিনি আরও প্রমাণ করেন, সব নক্ষত্রের বর্ণালি একই ধরনের নয়। সূর্যরশ্মিকে বিশে-ষণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, সোনা, রূপা, লোহা, নিকেল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম সবকিছুই আছে।

www.pathagar.com

ফ্রাউন হোফার লাইনের কথা একটু বিশে-ষণ করলে মেঘনাদ সাহার আবিষ্কারের গুরুত্ব আরও প্রকাশ পাবে। নক্ষত্রপৃষ্ঠের হাজার হাজার মাইল উপর পর্যন্ত তার আবহমণ্ডল বিস্তৃত। নক্ষত্রপৃষ্ঠের যে তাপমাত্রা, তার আবহমণ্ডলে সে তাপমাত্রা থাকে না। উপরের দিকে ক্রমশ শীতল। নক্ষত্রপৃষ্ঠে উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীয় আলো যখন উপরের দিকে সেই গ্যাসের অপেক্ষাকৃত শীতল স্তর ভেদ করে আসে তখন শীতল স্তর তাকে শোষণ করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সোডিয়ামের আলোকরশ্মি যখন শীতল সোডিয়াম গ্যাসের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন শোষিত হয়ে যায়। তাই বর্ণালিতে সোডিয়ামের হলদে জায়গার বদলে দেখা যায় কালো রেখা। তাই বোঝা যায়, তার আবহমণ্ডলেও সোডিয়াম আছে। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বর্ণালিতে কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়তার পার্থক্য থেকে ড. মেঘনাদ সাহা যে কোনো নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আদিম কণিকা মতবাদ

বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটার আদিন কণিকা মতবাদের প্রবক্তা। তার মতে, আদিতে মহাবিশ্ব আজকের মতো এত বিশাল ছিল না এবং নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ কিছু ছিল না। একেবারেই ছিল শূন্য। কোটি কোটি বছর পরে মহাশূন্যের এক কোণে একরকম আদিম কণিকার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে সেই আদিম কণিকা থেকে প্রটোন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতির সৃষ্টি। তারপর শত শত কোটি বছরের ব্যবধানে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদি থেকে গ্যাসীয় পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই আদিম কণিকার নামকরণ করা হয়েছিল 'ইলেম'। লেমেটার উক্ত মতবাদটি প্রকাশ করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। তার এই মতবাদকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির 'কণিকা মতবাদ' নামে আখ্যা প্রদান করা হয়। জর্জ গ্যামো নামে এক ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেমেটারের মতবাদকে সমর্থন করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদ প্রবর্তন করেন। গ্যামোর মতবাদ অনুসারে আদিম কণিকা একসময় জমাট বাঁধা একটি বিশাল পিণ্ডের রূপ নেয়। তারপর সেই পিণ্ডের ঘনত্ব বাড়তে থাকে প্রচণ্ডভাবে। তার ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড তাপ। অবশেষে সেই প্রচণ্ড ঘনত্ব ও তাপে আদিম জমটাবাঁধা পিণ্ডটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পেরে অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলেই আদিম কণিকা ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ ও নক্ষত্রলোক

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. ই. পি. হাবল মাউন্ট উউলসন মানমন্দিরে গবেষণাকালে '২০০ ইঞ্চি' দুরবিনের সাহায্যে প্রমাণ করেন, কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি নিয়ে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে। আমাদের পৃথিবীর চারপাশে যে অজস্র ছোটবড় নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ দেখতে পাই তারা পৃথিবী

www.pathagar.com

যে নক্ষত্রজগতে অবস্থান করছে—তারই বাসিন্দা। এক একটি নক্ষত্রজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কয়েকশো আলোকবর্ষ। তারপর আবার কয়েকশো আলোকবর্ষ ফাঁকা—তারপর আর একটি নক্ষত্রজগৎ। এভাবে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ নিয়ে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত।

জ্যোতির্বিদ হাবল ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত উইলসন মানমন্দির

জ্যোতির্বিদ হাবলই এই তত্ত্বের প্রচারক। তার মতে, আদিতে সমস্ত নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সিগুলো পাশাপাশি অবস্থান করতো। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে বলেই আজকে গ্যালাক্সিগুলো ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এক গ্যালাক্সি থেকে অপর গ্যালাক্সির দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তার মতে, ব্রহ্মাণ্ডের কোনো প্রান্তসীমা নেই।

হাবল এবং তার সহকারী হুমাসন একটি বিশেষ সূত্রও প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মতে, এক গ্যালাক্সি থেকে আর এক গ্যালাক্সির দূরত্ব এবং উভয়ের অপসরণ বেগ সমানুপাতিক। বর্ণালিতে লালের অপসরণ হিসাব করে উক্ত সূত্রটিকে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূত্রটিকে তাই বলা হয় 'লাল অপসরণ' সূত্র। এই সূত্র আরও প্রমাণ করে, আমাদের পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্যালাক্সির সন্ধান মানুষ কোনোকালেই লাভ করতে পারবে না। কারণ, সূত্রানুযায়ী দেখা যায়, অতিদূরের গ্যালাক্সিগুলোর অপসারণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেশি। ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত গ্যালাক্সির অপসরণ বেগ আলোকের গতিবেগের সমান। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনোকিছুর গতিবেগ আলোকের গতিবেগের চেয়ে বেশি হতে পারে না। হাবল মনে করেন, ব্রহ্মাণ্ড অসীম। ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবশ্যই গ্যালাক্সি আছে। গাণিতিক তত্ত্ব অনুযায়ী গ্যালাক্সির খবর বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে পারবে না বলে ধারণা ছিল একসময়। বর্তমানে মানুষের পর্যবেক্ষণে আরও বহু গ্যালাক্সির খবর জানা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

গ্রহ সৃষ্টির উল্কা মতবাদ

এই মতবাদটি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইতসেকার প্রচার করেন। কথিত আছে একই সময়ে ওই একই মতবাদ রুশ বিজ্ঞানী অটোস্মিথও রেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় তার মতবাদটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি।

এই মতবাদ অনুযায়ী, আদিতে অর্থাৎ জন্মলগ্নে সূর্য ধূলিমিশ্রিত গ্যাস সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী বাইরের ধূলিকণাগুলো আপন আপন বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করছিল সূর্যকে। ধূলিকণার সংখ্যা আবার ছিল অগণিত এবং তাদের সূর্য পরিক্রমার পথও ছিল অসংখ্য। বিভিন্ন সমতলে ভ্রাম্যমাণ ধূলিকণার মধ্যে অনিবার্যভাবে বেধে চলে সংঘাত। ফলে কণাগুলোর আকৃতি একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অবশেষে যখন আরও বড় হলো, তখন নিজেরাই লাভ করলো আকর্ষণ শক্তি। বড়গুলো ক্রমশ ছোট ছোট বস্তুপিণ্ডকে আত্মসাত করে বিরাট আকার ধারণ করলো। এভাবে সৃষ্টি হলো গ্রহ। আর যেসব বড় পিণ্ড দূরত্বের কারণে গ্রহে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না তারা গ্রহের আকর্ষণের আওতায় থেকে গ্রহকেই অবলম্বন করে ঘুরতে লাগল। এরা হলো উপগ্রহ। উইতসেকারের এই মতকে কুইপারসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সমর্থন করেন।

গ্রহ সৃষ্টির বলয় মতবাদ

ফ্রেড হয়েল এই মতবাদের প্রবর্তক। তার মতে, সূর্য জন্ম নিয়েছিল বিশাল আয়তনের গ্যাসীয় স্তূপ থেকে। স্তূপটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব ছিল প্রায় দশ লক্ষ কোটি মাইলের মতো। তার মধ্যে অস্থিরভাবে অবস্থান করছিল বিরল গ্যাসকণিকা। পরে গ্যাসীয় স্তূপটি আবর্তন ও সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে। সঙ্কোচনের মাত্রা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকলে তার আবর্তনবেগ এবং তাপমাত্রা দুইই বেড়ে চলে। পরিশেষে দপ করে জ্বলে উঠে রূপ নিল সূর্যের।

আদিম সূর্যের আবর্তন বেগ ছিল প্রচণ্ড। ফলে সূর্যদেহ সঙ্কুচিত হয়ে বর্তুলাকার হয়। আরও আবর্তন বেগ বাড়লে মেরু দুটি ভেতরের দিকে একটু একটু করে ঢুকে যায় এবং বিষুববৃত্ত স্ফীত হয়ে ওঠে। তারপর সেই স্ফীত অংশ সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূপ নেয় বলয়ের। বলয় সৃষ্টি হওয়ার পর সেই বলয়টি একদিকে যেমন সূর্যকে প্রচণ্ডভাবে আবর্তন করতে বাঁধা দিল, অপরদিকে তেমনি একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগলো। সূর্যের আকর্ষণ বল অবশ্য তার উপরেও কাজ করছিল। তবুও বিরাট বলয়কে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে অসুবিধা হয়নি।

বলয়টি দূরে গেলে শীতল হতে আরম্ভ করে এবং গ্যাসের ভেতর থেকে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের পদার্থ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তারপর আরও যখন দূরে সরে যায় তখন ধীরে ধীরে নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের পদার্থও বিচ্ছিন্ন হয়। পরে উল্কা মতবাদের মতোই ছোট ছোট কণা থেকে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড তথা গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

গণিতের অগ্রযাত্রা

গণিত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যা গণনা বা হিসেব করে পাওয়া যায়। আবার গণিতের ইংরেজি শব্দ 'ম্যাথমেটিকস' এসেছে গ্রিকভাষা থেকে। 'ম্যাথমেটিকস' কথাটির প্রকৃত অর্থ 'শিক্ষা'। প্রথমে এই অর্থেই ম্যাথমেটিকস ব্যবহার করা হতো। পরে শব্দটি ব্যাপক অর্থে—অর্থাৎ আমরা 'গণিত' কথাটির দ্বারা যা বুঝি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। বাংলা 'গণিত' শব্দটি এসেছে গণ ধাতুতে ত প্রত্যয় যোগ করে। গণ শব্দের অর্থ দুটি বা বহু। এক অর্থে গণনা বা হিসাব এবং অপর অর্থে সমষ্টি। গণশক্তি, গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দ দ্বিতীয় বা বহু অর্থ বহন করে।

অগ্রযাত্রার পটভূমি

পণ্ডিতেরা গণিতের ইতিহাসকে প্রধান চারটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগ—প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এই যুগের সীমারেখা নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য। তবুও ধরা যেতে পারে, এর স্থায়িত্বকাল প্রস্তরযুগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, গণিতের জন্ম প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। তবে তখন গণিত কেবল হিসাব-নিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে কিছুটা জ্যামিতি চর্চা হয়েছিল। সে জ্যামিতি আবার ছিল পরিমিতির নামান্তর। কেউ কেউ মনে করেন, এই যুগের শেষের দিকে ভগ্নাংশ ও দশমিকের প্রচলন হয়েছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরবর্তী যুগকে বলা হয় প্রাচীন যুগ। এই যুগে গণিতের অনেকগুলো শাখার উদ্ভব হয়েছিল গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা। বিশেষ করে পাটীগণিত ও জ্যামিতি চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করেছিল এবং জন্ম হয়েছিল বীজগণিতের।

প্রাচীন যুগে গণিতের যে শাখাটি সবার আগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি জ্যামিতি। মিশর, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে উদ্ভুত জ্যামিতিকে সংগ্রহ করে গ্রিকরাই প্রথম প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির সূত্রপাত করেন। এ বিষয়ে যার দানকে সবার আগে স্বীকার করতে হয়, তিনি হচ্ছেন ইউক্লিড। থালেস, পিথাগোরাস প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রধান প্রধান জ্যামিতিক তথ্যগুলো হলো, বৃত্তকে সমদ্বিখণ্ডিতকরণ এবং বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের সম্পর্ক নির্ণয়, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য, সদৃশ্যচিত্র বা 'সিমিলার ফিগারস'-এর কয়েকটি সূত্র।

www.pathagar.com

ইউক্লিড

বীজগণিতের দ্বিঘাত সমীকরণের উদ্ভব সেই প্রাচীন যুগে। এ যুগের আর একটি মূল্যবান অবদান, বীজগণিতের সাধারণ নিয়মের সাহায্যে জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ভারতবর্ষের আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত। অন্যদিকে পাটীগণিতের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। নয়টি সংখ্যা এবং ০ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি ভারতবর্ষের গণিতবিদদের আবিষ্কার। রোমান আমল পর্যন্ত কতগুলো চিহ্ন বা সঙ্কেতের দ্বারা বড় বড় সংখ্যাগুলো প্রকাশ করা হতো। তবে সে সংখ্যা হাজার দুই হাজারের বেশি নয়। তাদের সংখ্যা গণনা শিখতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। যখন ভারত ০ ব্যবহার করে কোটি কোটি সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলো তখনই সারা বিশ্ব সেই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ল।

সম্ভুর সমুত্থান, সুদকষা, বিন্যাস, ত্রৈরাশিক, গুণোত্তর ও সমান্তর শ্রেণীর উদ্ভব প্রাচীন যুগে। গণিতের অন্যান্য শাখাগুলোর মধ্যে গতিবিদ্যার জন্ম হয় বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের হাতে এবং কৌনিক সেকসান ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করেন অ্যাপোলোনিয়াস নামে অপর এক গ্রিক গণিতজ্ঞ। মোটকথা গণিতের প্রধান প্রধান শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন যুগেই।

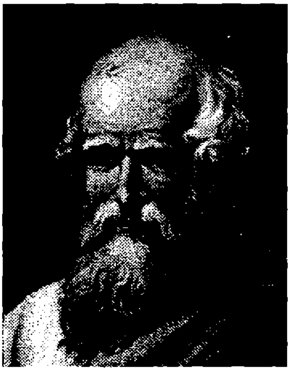

আর্কিমিডিস

গণিতের তৃতীয় যুগ বা মধ্যযুগ শুরু হয় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে এবং এর ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আরবে নবজাগরণ শুরু হলে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো গণিতের অনুশীলনেও তারা যত্নবান হয়। গণিতের অন্যান্য শাখায় তাদের বিশেষ মৌলিক অবদান না থাকলেও প্রণালীবদ্ধ বীজগণিতের আলোচনা করেছিল আরবরাই। ভারতের মহাবীরাচার্য, শ্রধরাচার্য ও ভাস্করাচার্যই মধ্যযুগের গণিতের আকাশে তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এদের মধ্যে ভারস্করাচার্যের রচনায় আবার ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার উল্লেখ আছে। গণিতের চতুর্থ যুগ তথা আধুনিক যুগের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে মহাগণিতজ্ঞ ও দার্শনিক রেনে ডেকার্ত এবং পিয়ের দ্য ফেরমার কাছে। অনেকে এই দুই মনীষীকে যুগসন্ধিক্ষণের গণিতজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। এদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান হলো, এরা বীজগণিত ও জ্যামিতি—গণিতের এই দুটি ধারার সমন্বয় করে বৈশে-ষিক জ্যামিতি নামে এক নতুন শাখার প্রবর্তন করেন। সে সময় আরও একজন দার্শনিক ও গণিতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল। নাম তার ব্রেইজ পাস্কাল।

www.pathagar.com

ডেকার্ত, ফেরমা ও পাস্কালের পর গণিত লাভ করে মহামতি নিউটনকে। নিউটন আবিষ্কৃত বলবিদ্যা গণিতকে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। অবশ্য একই সময়ে লাইবনিটস নামে অপর এক গণিতজ্ঞও কলনবিদ্যা আবিষ্কার করেছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানীরা কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ফলে গণিতের বিভিন্ন শাখার পরিধি দ্রুততার সাথে বেড়ে চলে। নিউটনের দ্বারা গতিবিদ্যা নামক গণিতের শাখাটিও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

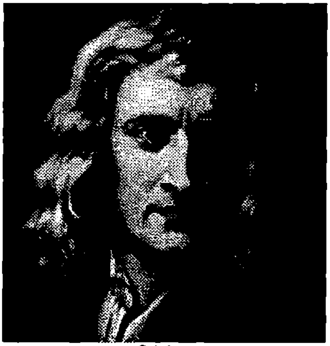
নিউটন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গণিতের শাখাগুলোর কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই গণিত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই শতাব্দীতেই জন্মলাভ করে বিশে-ষণবিদ্যা বা অ্যানালিসিস, সেট তত্ত্ব বা থিওরি অব সেটস, নিত্যবাদ বা থিওরি অব ইনভেরিয়েন্স, ভেদে কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাস অব ভেরিয়েশনস, বিমূর্ত বীজগণিত, টপলজি এবং বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতি।

বিংশ শতাব্দীতে বিমূর্ত গণিতের উন্নতি ও প্রসার ঘটে। আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা গণিতের ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাছাড়া জ্যামিতির পরিধিও বেড়েছে আশ্চর্যজনকভাবে।

গণিত গবেষকরা বর্তমান যুগের গণিতকে বিশুদ্ধ ও ফলিত—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করতে চান। সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি, বিমূর্ত বীজগণিত ও তার বিভিন্ন শাখা, বিশে-ষণবিদ্যা-সহ যেগুলো আলোচনার ক্ষেত্রে গাণিতিকরূপ প্রাধান্য পায় সেগুলোকে তারা নির্দেশ করেন বিশুদ্ধ গণিত আর বলবিদ্যা, পরিসংখ্যান প্রভৃতিকে গণিতের উপরোক্ত শাখাসমূহে প্রয়োগ করা হয় বলে নির্দেশ করেন ফলিত গণিত। তবে বহু গণিতজ্ঞের এভাবে শ্রেণীবিভাগ মনঃপূত নয়। তারা মনে করেন, এই দুভাগের কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক কোনো কোনো পণ্ডিত গণিতকে মাত্রিক ও বৈশেষিক অপর দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, বলবিদ্যা ও ফলিত গণিতকে মাত্রিক এবং বিমূর্ত বীজগণিত, সেটতত্ত্ব, টপলজি প্রভৃতিকে বৈশেষিক শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় গণিতকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানের একটি শাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। চিত্রকলা, সমাজ বিদ্যা, এমনকি ভাষাতত্ত্বেও গণিতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই গণিতকে এখন কলা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

গণিতের কয়েকটি শাখা

জ্যামিতি

ব্যবহারিক প্রয়োজনে অর্থাৎ জমিকে মাপতে গিয়ে একদিন জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। 'জ্যামিতি' শব্দটিও সেই অর্থ নির্দেশ করে। 'জ্যা' অর্থ ভূমি এবং 'মিতি' অর্থ পরিমাপকে বুঝায়।

পিথাগোরাস

জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরের অবদান সর্বাধিক। তাছাড়া ব্যাবিলন এবং ভারত ও আরবের কাছেও জ্যামিতি ঋণী। অন্যদিকে প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির সূত্রপাত করেন গ্রিকরাই। গ্রিসে জ্যামিতি চর্চা অন্যতম শ্রেষ্ঠবিদ্যা বলে পরিচিত ছিল। মহামতি পিথাগোরাস তার ঘরের দরজায় লিখে রেখেছিলেন, 'যে ব্যক্তির জ্যামিতি জানা নেই তার প্রবেশের অধিকার নেই'।

ইউক্লিডের কথাও পূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে জ্যামিতির গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছিলেন সেটি হচ্ছে 'এলেমেন্টস'। ২৩টি সংজ্ঞা, ৫টি প্রতিজ্ঞা, ৫টি সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর মহাগ্রন্থকে। মধ্যযুগে একমাত্র ভারতবর্ষই জ্যামিতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। আরব সে যুগে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো জ্যামিতির চর্চা করে এবং এই শাখায় অবদান রাখে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম জ্যামিতি চর্চার সূত্রপাত করেন কেপলার। তারপর প্রায় একশো বছর ধরে ইউক্লিডের জ্যামিতি নিয়েই গবেষণা হয়। আধুনিক বৈশে-ষিক জ্যামিতির সৃষ্টি করেন ডেকার্ত ও ফেরমা। এই জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো জ্যামিতিক সমস্যাকে অনুরূপ কোনো বীজগণিতের সমস্যায় রূপান্তরিত করা। ওদের দু'জনের প্রচেষ্টায় জ্যামিতি ও বীজগণিতের সমন্বয় সাধন হয়।

www.pathagar.com

নিউটন ও লাইবনিটসের ক্যালকুলাস আবিষ্কারের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যামিতির ক্ষেত্রেও অন্তরকলন ও সমাকলন ব্যবহার হতে থাকে। ফলে জ্যামিতির যে শাখাটি উৎপন্ন হয় তার নাম অন্তরকলন জ্যামিতি। জ্যামিতির এই শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন 'মঁজ', 'জোসেফ আলফ্রেড সেরে' নামক দু'জন গণিতজ্ঞ। পরে 'রি মান' নামক আর একজন গণিতজ্ঞ ও জ্যামিতিবিদ উক্ত শাখাটির উন্নতি সাধন করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী গণিতজ্ঞ 'দেজার্গ' একটি বিশেষ উপপাদ্য প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেজার্গের সেই উপপাদ্য থেকে জ্যামিতির একটি নতুন শাখার জন্ম হয়। সেই শাখাটির নাম হয় প্রপেক জ্যামিতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন পণ্ডিতরা। বিশেষ করে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটিকে প্রমাণ করার নানা অসফল প্রচেষ্টা হয়েছিল। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটির বক্তব্য বিষয় ছিল, কোনো সরলরেখার বহিস্থ কোনো বিন্দু দিয়ে উক্ত সরলরেখার সমান্তরাল মাত্র একটি রেখাই অঙ্কন করা সম্ভব। হাঙ্গেরীর 'বোয়াই' এবং রাশিয়ার লোবাচেভস্কিও দীর্ঘদিন যাবত উক্ত প্রতিজ্ঞাটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। পরে ইউক্লিডের অন্যান্য প্রতিজ্ঞাকে অপরিবর্তিত রেখে পঞ্চম প্রতিজ্ঞার একটি বিপরীত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে জ্যামিতি রচনা করেন। এভাবে সৃষ্টি হয় জ্যামিতির একটি নতুন শাখা—যার নামকরণ করা হয় 'নন ইউক্লিডীয় জ্যামিতি'। বোয়াই এবং লোবাচেভস্কি উক্ত শাখার উদ্ভাবক। পরে এই শাখাটি হাইপার বোলিক জ্যামিতি নামে খ্যাত হয়। আরও পরে জ্যামিতিবিদ রিমানের দ্বারা সৃষ্টি হয় ইলিপটিক জ্যামিতি নামে আরও এক ধরনের জ্যামিতি এবং এই শাখাটিও নন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও এক ধরনের জ্যামিতির প্রবর্তন হয়। ফ্রান্সের মঁজ এবং পঁসলে নামক দু'জন জ্যামিতিবিদ এর প্রবর্তক। উক্ত শাখাটি 'আধুনিক সাংশে-ষিক জ্যামিতি' নামে খ্যাত। পরে শাখাটির চূড়ান্তরূপ দান করেছেন ফ্রান্সের শাল, জার্মানির ফনস্টাউট ও ইতালির ক্রেমোনা। ওদেরই সমসাময়িক সময়ে 'প্লুকার' কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় বৈশে-ষিক জ্যামিতি। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী জ্যামিতিবিদ মঁজের দ্বারা ডেসক্রিপটিভ ডিজিওমেট্রি বা চিত্র জ্যামিতি নামে জ্যামিতির আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখার জন্ম হয়। উক্ত শাখাটিকে ব্যবহার করা হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচনা করেছেন এরলাংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'কাইন'। তিনি উল্লেখ করেন, জ্যামিতির যে কোনো শাখা থেকে নতুন নতুন শাখার জন্মলাভ সম্ভব। সে সম্বন্ধে তিনি কতগুলো তত্ত্বও প্রচার করেন। সেই তত্ত্বগুলোকে অবলম্বন করে পরের দিকে বহু জ্যামিতিবিদ সৃষ্টি করেছেন জ্যামিতির বহু শাখা। তাদের গবেষণা কেবলমাত্র কাইনের মতবাদকে

www.pathagar.com

সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, এখনও যে জ্যামিতির বহু শাখার জন্মদান করা সম্ভব—এই সত্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গবেষকদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আছেন জার্মানির হিলবার্ট, ফ্রান্সের আঁরি পোঁয়া কারে, আমেরিকার অসওয়াল্ড ভেবলিন, পেয়ানো এবং তার ছাত্র পিয়েরি।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো জ্যামিতির পরিধিও দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এই শতাব্দীতে 'মোল্টন' 'নন দেজার্গীয় জ্যামিতি' রচনা করে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে জ্যামিতি রচনা করেছেন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে নন আর্কিমিডীয়, নন পাসকালীয় প্রভৃতি নানা ধরনের জ্যামিতির সৃষ্টি করা সম্ভব।

পাটিগণিত

মানবসভ্যতার শুরুতেই সংখ্যার ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞান তথা পাটীগণিতের জন্ম। মিশর, চীন, ব্যাবিলন, আরব, ভারতসহ নানা দেশের জ্ঞানীগুণীরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পাটীগণিতের নানা তথ্য উদঘাটন করেছিলেন। তবে, প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষই পাটীগণিতকে তার যথার্থ রূপটি প্রদান করে। 'শূন্য'-কে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা গঠন ভারতের অবদান। ত্রৈরাশিক, সুদকষা, বিন্যাস, সমবায়, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর উদ্ভব ভারতবর্ষেই। আর্যভট্ট, শ্রীধরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, এরা সবাই পাটীগণিতের উন্নতি সাধন করে গেছেন। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী পাটীগণিতের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই আমাদের পাটীগণিতকে ব্যবহার করতে হয়।

পরিসংখ্যান

স্ট্যাটিসটিক্সের বাংলা প্রতিশব্দ পরিসংখ্যান। পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার একেবারে আধুনিককালের। বিদেশের প্রাচীন কোনো গ্রন্থে পরিসংখ্যানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের কতগুলো প্রাচীন গ্রন্থে পরিসংখ্যান তত্ত্বের উল্লেখ আছে। অন্যতম গ্রন্থ চাণক্যের লেখা 'অর্থশাস্ত্র'।

পাশ্চাত্যে পরিসংখ্যানের মূল সূত্র দৃষ্টিগোচর হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত গাউস ও লাপলাসের লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোতে। উক্ত শাখাটির বিকাশ লাভ হয় ইংল্যান্ডের কার্ল গিয়ার্সনের দ্বারা। পরবর্তীতে পরিসংখ্যানের চরম উন্নতি হয়েছে ডব্-. এস. গসেট, আর এ. ফিসার, জে. নেম্যান, ই. এস. পিয়ার্সন, এ. ওয়াল্ড প্রভৃতির দ্বারা।

অর্থনীতিতে প্রতীকসংখ্যা নির্ধারণ, চাহিদা ও সরবরাহ বিশে-ষণ, জনস্বাস্থ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, মনোবিদ্যা, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এমনকি রসায়নেও পরিসংখ্যানের ব্যবহার ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তাছাড়া বিশে-ষণ পরিসংখ্যান নামেও পরিসংখ্যানের আর একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

বীজগণিত

প্রাচীন মিশরে পাওয়া গেছে বীজগণিত সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম নিদর্শন। তবে উক্ত শাস্ত্রের প্রকৃত স্রষ্টা প্রাচীন ভারতবর্ষ সহ আরবরা। যে সমস্ত ভারতীয় গণিতজ্ঞদের দ্বারা বীজগণিতের উন্নতি সাধিত হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রথম আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীরাচার্য, শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট্ট, প্রথম ভাস্করাচার্য ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে আজও শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতি রূপে উল্লেখ করা হয়। পাটীগণিতের আলোচনা থেকেই একদিন বীজগণিতের উদ্ভব হয়েছিল। পাটীগণিতের আলোচনা কেবলমাত্র ধনাত্মক সংখ্যার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তাই ঋণাত্মকসংখ্যা ও জটিলসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই উদ্ভব হয়েছিল বীজগণিতের। প্রাচীন গ্রিসও বীজগণিতের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল।

আরবের অভ্যুত্থানের যুগে তারা গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে নতুনভাবে আলোচনার সূত্রপাত করে। এই উদ্দেশ্যে মুহম্মদ বিন মুসা আলখাওয়ারিজমী আরবি ভাষায় রচনা করেন 'আলজেবরওয়াল মোকাবালা' নামক একটি বীজগণিতের গ্রন্থ। বইটির নাম বাংলায় রূপান্তর করলে অর্থ হয় 'সমীকরণের পান্তরকরণ ও পদ অপসারণ'। কালক্রমে 'অ্যালজেব্রা' নামটির উদ্ভব হয়েছে তারই লেখা গ্রন্থটি থেকে। যেহেতু পাটীগণিতের তথ্যসমূহের সামান্যীকরণ ও প্রসারণই বীজগণিতের মূলসূত্র—তাই স্যার আইজ্যাক নিউটন গণিতের উক্ত শাখাটিকে 'ইউনিভারসাল এরিথমেটিক' আখ্যায়িত করেছিলেন।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের ও গণিতের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাটিকে নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়। ফলে জন্মগ্রহণ করে বিমূর্ত বীজগণিত। প্রাচীনকালে উদ্ভুত বীজগণিতের তত্ত্বসমূহের সামান্যীকরণ এবং ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগই এই শাখার বিশেষত্ব।

বিমূর্ত বীজগণিত সম্বন্ধে গবেষণার ফলে সেট, রিং, ফিল্ড, ইনটিগ্রালাডোমেন প্রভৃতি গাণিতিক পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। হ্যামিলটন, বুল, মোরিয়াস প্রভৃতি গণিতজ্ঞের গবেষণা থেকে আবার বিমূর্ত বীজগণিতের কয়েকটি শাখারও উদ্ভব হয়েছে। বুলের 'নন নিউম্যারিক্যাল অ্যালজেব্রা' বা অসংখ্য বীজগণিত, মোরিয়াসের 'ব্যারিসেন্টিক ক্যালকুলাস', হ্যামিলটনের 'কোয়ার্টার নিয়নস', ভেক্টর বীজগণিত প্রভৃতি পুস্তক বিমূর্ত বীজগণিতের এক-একটি শাখা।

বীজগণিতের একটি বড় অবদান সেটতত্ত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায়, অর্থনীতি পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সেটতত্ত্বের প্রয়োগ করায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। উক্ত সেটতত্ত্বের আবিষ্কর্তা জর্জ ক্যান্টর। পরে উক্ত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন ইয়ং, বোরেল, আসকোলি প্রমুখ গণিতজ্ঞ। বুলিয়ান অ্যালজেব্রা বীজগণিতের শাখাটি সেটতত্ত্বেরই সামান্যকৃত রূপ।

www.pathagar.com

বীজগণিতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন সমষ্টিতত্ত্ব নামক আর একটি গাণিতিক নিয়ম। উক্ত তত্ত্বের জন্মদাতা রুফিনি, গালোয়া এভারিস্ত, লাগ্রাঁজ, কার্ল ফ্রেডরিস গাউস, অয়লার প্রমুখ গণিতজ্ঞ। অনেকে অবশ্য বীজগণিতীয় সমষ্টি তত্ত্বের স্রষ্টা হিসেবে রুফিনির নাম করে থাকেন। তবে 'সমষ্টি' এই শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন গালোয়া এভারিস্ত। বিমূর্ত সমষ্টিতত্ত্বের উদ্ভাবক 'কেলি' নামে একজন গণিতজ্ঞ। পরে সিলভেস্টার, ক্রনেকার, ফ্রবেনিয়াস প্রমুখ গণিতজ্ঞ উক্ত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ কাইনও এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যা

পৃথিবীতে সৃষ্টির পর থেকেই মানবজাতি বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু করেছেন তাই কারিগরিবিদ্যার অন্তর্গত। ছোট শিশুর মধ্যে এর বিকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পণ্ডিতদের মতে, মানুষের ক্রমবিবর্তনটা শিশুর ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই বলা যায়—সেই ঊষালগ্নেই মানুষ মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করেছিল তার কারিগরি জ্ঞানের ভেতর দিয়ে। সত্যি বলতে কি, মানুষ যেদিন বুদ্ধিবলে গাছের ডালকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরেছিল এবং পাথর ছুঁড়তে শিখেছিল সেদিনই প্রকাশ পেয়েছিল তার কারিগরি জ্ঞান।

কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রযাত্রার পটভূমি

বয়সের ভারে ন্যুজ প্রায় পৃথিবী। পৃথিবী পেরিয়ে এসেছে শত সহস্র বছর। মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি সাধন করেছে, পশুর চামড়াকে সেলাই করে পরিধান করেছে, মৃৎপাত্র নির্মাণ করেছে, গৃহনির্মাণ করেছে, কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে, বস্ত্র তৈরি করেছে, ধাতুকে কাজে লাগিয়েছে, ইত্যাদি নানা কাজের ভেতর দিয়ে অগ্রগতি বজায় রেখেছে তার সভ্যতার। প্রকৃতপক্ষে সে জীবনের সমূহ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেয়েছে কারিগরি বিদ্যাকে আয়ত্ত করার ফলে। মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস কারিগরিবিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের ইতিহাস। আরও সত্য যে, মানুষের বিজ্ঞান চেতনার উৎসও খুঁজে পেয়েছে কারিগরি জ্ঞান লাভের মাধ্যমে।

হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে হাজার হাজার কারিগরের কারিগরি জ্ঞানকে অবলম্বন করে আজ কারিগরিবিদ্যা তথা প্রযুক্তিবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং এমন এক অবস্থায় এসেছে—যার সবকিছুকে আয়ত্ত করা একক মানুষের স্বল্প জীবনকালে একরকম অসম্ভব ব্যাপার। সুবিধার জন্য তাই প্রযুক্তিবিদ্যাকে আজ নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল বিভাগ হিসেবে পাঁচটি এবং পাঁচটির উপর নির্ভরশীল আরও কয়েকটি বিভাগ আজ প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কারিগরিবিদ্যার পাঁচটি মূল বিভাগ যথাক্রমে—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল এবং কেমিক্যাল। এই পাঁচটি বিভাগের উপর নির্ভরশীল যেসব প্রযুক্তিবিদ্যার বিভাগ

www.pathagar.com

আজকে বিকশিত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো জনস্বাস্থ্য, পানিনিষ্কাশন, ময়লা অপসারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং। এটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আওতায় পড়ে। কৃষির উন্নতির জন্য এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর নির্ভর করে। জাহাজ শিল্পের জন্য মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উড়োজাহাজ শিল্পের জন্য এ্যারোনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর করছে সেই সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর। মোটরগাড়ি শিল্পের জন্য অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শাখা। সংবাদ প্রেরণ সংক্রান্ত টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে উদ্ভূত। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয় থেকে আর যেসব শাখার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরও একাধিক শাখা উৎপন্ন হয়েছে। বর্তমানের আণবিকশক্তি গবেষণা সংক্রান্ত হিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে জড়িত কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে উদ্ভূত আজকের বিস্ময় রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং। আর এদের সবার সঙ্গে গণিত শাস্ত্রটা জড়িত।

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর পরিচয় লক্ষ্য করলে বিভাগগুলো কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে, সে সম্পর্কে জানা যাবে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীতে বাঁধ দেয়া, পানিসেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, অট্টালিকা, সেতু, নগর, বন্দর যে কোনো কারখানা ইত্যাদির পরিকল্পনা ও নির্মাণ, গ্রাম ও শহর উন্নয়ন ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

সাধারণত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ, যন্ত্রচালনা, যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল প্রভৃতিকে বোঝায়। বলা বাহুল্য, উক্ত শাখাটির উদ্ভব হয়েছে যন্ত্র-যুগ সূচনার পর।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই কারিগরিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং এর উদ্ভব আরও পরে—অর্থাৎ ইঞ্জিনের পরে বিদ্যুৎতকে কাজে লাগানোর সময়। এর পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো, পাম্প, পাখা, হিটার, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি চালানো থেকে রাস্তার ট্রেন লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিগ্রাফ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক্সরে-লেসার, অসিলোগ্রাফ, এমনকি বিস্ময়কর বেতার যন্ত্র পর্যন্ত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আওতায় পড়ে।

www.pathagar.com

মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

এ দুটি কারিগরিবিদ্যা পৃথক বিভাগ হলেও একটির জ্ঞান ছাড়া অন্যটি চলে না। যদিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো শাখায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি শাখায় ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অপরাপর শাখায়ও কিছুটা জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়। তবে মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল দুটোর মধ্যে সম্পর্ক অন্যান্য শাখা থেকে ঘনিষ্ঠ। খনি থেকে খনিজ সংগ্রহ, খনিজকে বিশুদ্ধিকরণ এবং তা থেকে ধাতু নিষ্কাশন, সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয় তো আছেই, এছাড়াও ভূগর্ভ থেকে খনিজ উদ্ধারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন। খনির অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, স্থানে স্থানে সঞ্চিত বিষাক্ত অথবা দাহ্য গ্যাস ও পানি, ধ্বসনামা ইত্যাদি থেকে খনিশ্রমিকদের রক্ষা করাও ওই শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ভূগর্ভ থেকে খনিজকে উদ্ধার করে উপরে নির্দিষ্ট কারখানায় প্রেরণ করা, খনিগর্ভে লাইন পাতা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিশ্রামাগার নির্মাণ, পানি ও বিষাক্ত গ্যাসকে অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয় ঘটানো এর অন্তর্গত।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রযুক্তিবিদ্যার এ শাখাটি বর্তমান শতাব্দীর অবদান। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে এই শাখাটির পরিধি বিস্ময়করভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ কতগুলো রং, এসিড, ক্ষার, প্রসাধন ইত্যাদি প্রস্তুত করে আসছে এবং কাপড় রঙিন করতে কাজ করে আসছে, তবুও এর প্রকৃত প্রসার হয়েছে আজকের দিনে। এর আওতায় পড়ে নানাবিধ এসিড, ক্ষার, লবণ, কাচ, সিমেন্ট, কাগজ, রং, বিস্ফোরক, নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য, কৃত্রিম সুতা, নাইলন, পলিথিন, প্লাস্টিক, রাবার, আঠা প্রভৃতি প্রস্তুত এবং এদের উপর নির্ভরশীল নানা রকমের শিল্প-কারখানা। চামড়ার কাজ, নানারকম দাহ্য গ্যাসের ব্যবহার, খনিজ তেল এবং কয়লা থেকে নানা রকমের পদার্থ নিষ্কাশনও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনবিদ্যাগুলোর অন্যতম হচ্ছে কৃষিবিদ্যা। বর্তমানে উন্নত বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির যেমন উদ্ভব হয়েছে তেমনই কৃত্রিমভাবে জমির উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং সম্ভব হয়েছে রোগ ও পোকা দমন করা। ফলে আগে যেখানে একজন কৃষক মাত্র চারজনের খাদ্য উৎপাদন করতে হিম-শিম খেতেন, আজ সেখানে তারা চল্লিশজনের খাদ্য উৎপাদন করতে পারছেন।

মহাকাশ বিজ্ঞান বা Space Scince

মহাকাশ গবেষণাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের যে শাখাটি গড়ে উঠেছে সেটি বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে অবলম্বন করে একটি জটিল কর্মকাণ্ড। মহাকাশের

www.pathagar.com

খবর সংগ্রহ থেকে উন্নত রকেটবিদ্যা, রকেটের জ্বালানি ও রকেট উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা, মহাকাশচারীর পোশাক ও খাদ্য, দুর্ভেদ্য মহাকাশযান নির্মাণ, মহাকাশে মানব শরীরে প্রতিক্রিয়া, নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশযানকে কোনো গ্রহে কিংবা উপগ্রহে অবতরণ করানোর ব্যবস্থা ও পুনরায় তাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা—এ সবই মহাকাশ বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড। মানুষের আহরিত বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার চূড়ান্ত প্রয়োগ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপেও গণ্য। আর মহাকাশ বিজ্ঞান আজ সারা পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল ও রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহার

কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার উপরোক্ত শাখাগুলোর দিকে তাকালে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা চিন্তা করলে প্রথমে পাওয়া যায় সেই আদিকাল থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ যন্ত্রযুগ সূচনার আগ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটির শুরু মানুষ যেদিন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে শত শত মানুষের কাজকে একাই সম্পন্ন করলো। প্রকৃতপক্ষে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গোড়াপত্তন ওখানে। এরপর বিদ্যুত ও পরমাণুর যুগ। প্রযুক্তিবিদ্যাও বিভক্ত হয়েছে নানা শাখা ও উপ-শাখায়।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মানুষের যা কিছু আবিষ্কার তার প্রায় অধিকাংশই আজকে ওই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আওতায় পড়ে। মানুষের চিন্তা-ভাবনার বেশিরভাগ নিয়োজিত হয়েছিল স্থাপত্যবিদ্যা, পানিসেচ ও নদী-পরিকল্পনা, সেতু, নগর ও বন্দর নির্মাণ, যুদ্ধাস্ত্রের উন্নত রূপদান ও জলযান প্রস্তুতির ক্ষেত্রে।

স্থাপত্যবিদ্যা

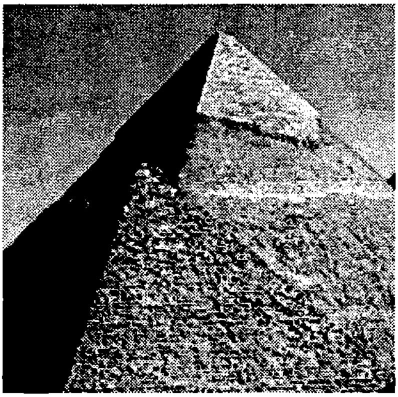
পিরামিড

মিশরের পিরামিড, মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা ও তার বিরাট স্নানাগার, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান ও চীনের প্রাচীর—এ সবই স্থাপত্যবিদ্যার প্রাচীন নিদর্শন।

মিশরের নীলনদের তীরে ৭৩টি পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বড়টি প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গফুট এলাকার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ৪৯০ ফুটের মতো উঁচু, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম খুফুর পিরামিড। জানা যায়, ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

www.pathagar.com

এক লক্ষ লোক ২০ বছর ধরে পরিশ্রম করে পিরামিডটি নির্মাণ করেছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বিরাট বিরাট চৌকো পাথর পানিপথে আনা হতো এখানে।

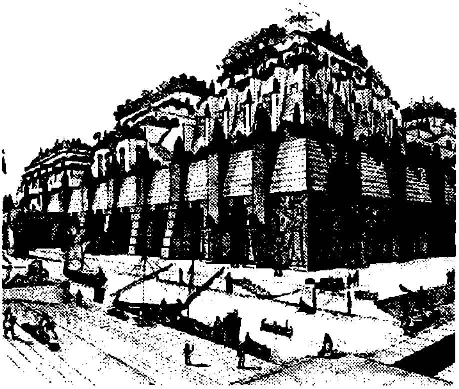

ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান

ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান এবং চীনের প্রাচীর কিন্তু এত পুরনো নয়। ঝুলন্ত উদ্যান নির্মিত হয়েছিল ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এবং ১৪০০ মাইল লম্বা ২০ ফুট চওড়া এবং ২২ ফুট উঁচু চীনের প্রাচীরের কাজ শুরু হয়েছিল ২১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

অট্টালিকা ও মন্দির নির্মাণে সে-সময় কাঁচা ও পাকা উভয় ধরনের ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। কড়ি, বরগা ও থাম ছাড়া খিলানের দ্বারা ইটকে আটকে রাখার পদ্ধতি প্রথম সুমেরীয়রা আবিষ্কার করেছিল। তাদের তৈরি জিগুরাত মানমন্দির, যেখান থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হতো, তা স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

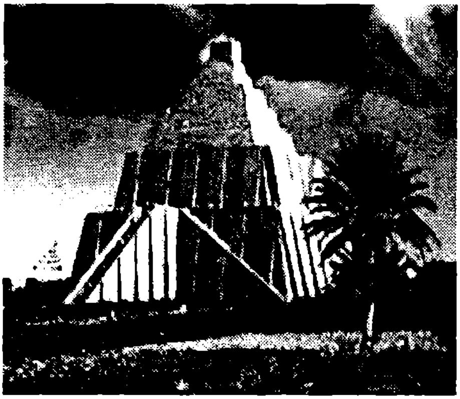

জিগুরাত

পরবর্তীকালে গ্রিক ও রোমান আমলে নগর ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। গ্রিকদের নির্মিত মন্দির, সভাগৃহ ও নাট্যশালার নিদর্শনগুলো আজকের দিনেও বিস্ময়কর। সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করেছিল রোমান আমলে। শোনা যায়, রোমানরা প্রথম সিমেন্ট জাতীয় জিনিস আবিষ্কার করেছিল। ফলে পাথর কিংবা ইটকে জোড়া লাগাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তারা বিরাট বিরাট স্নানাগার, হলঘর ইত্যাদি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তৈরি করেছিল। তাছাড়া ছাদের পরিবর্তে ছাদকে গম্বুজাকার করার পরিকল্পনাও রোমানদের। পরবর্তীকালে মন্দির, গির্জা এবং আরও পরে ইসলামি জগতে মসজিদের ছাদে মিনার ও গম্বুজের রূপ প্রদান করা হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যা তথা স্থাপত্যবিদ্যার দ্বিতীয় নিদর্শন নদীর উপর সেতু নির্মাণ। প্রথমে মানুষ ছোট ছোট নদীর উপর ভেলা বা সাঁকো তৈরি করতে শিখেছিল। তারা কাঠের খিলান দিয়ে বড় বড় নদীর দুই তীরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সুমেরী-

www.pathagar.com

য়রা প্রথম সেতু আবিষ্কার করেছিল।হ্রদের উপর যেমন খুঁটি পুঁতে ঘর তৈরি করত তেমনি সেতুকে খাড়া রাখতো খুঁটির সাহায্যে। চওড়া সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে খুঁটি বা পাইল এবং কড়ি বা ট্রাসের আবিষ্কার হয়েছিল সে-সময়েই। পাইল ও ট্রাস প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

সেকালে সামরিক প্রয়োজনে অনেক সময় অস্থায়ী সেতু নির্মিত হতো। এগুলো প্রায়ই নদীর উপর সারি সারি নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর চওড়া কাঠ ফেলে দেয়া হতো। গ্রিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় জার্কসিস ঠিক এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

সিমেন্ট আবিষ্কারের পর সেতু নির্মাণের কৌশল আরও সহজ হয়। কাঠের পরিবর্তে পাথরকে কেটে এবং পরস্পর পরস্পরকে লোহার আংটার দ্বারা দৃঢ়ভাবে আটকানোর রীতি প্রচলন হলো। সিমেন্টের তৈরি থাম ব্যবহার করে এবং সেতুর ছাদকে গোলাকার খিলানের মাধ্যমে খাড়া রাখার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূত্রপাত হয়।

গ্রিক ও রোমান আমলের আগে সেতু নির্মাণে একজন মাত্র ইঞ্জিনিয়ারের নাম পাওয়া যায়। নাম তার স্যামসের মান্দ্রোকিস। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বসফরাস প্রণালির উপর ৩০০ ফুট দীর্ঘ একটি কাঠের সেতু তারই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল।

পানিসেচ ও নদী-পরিকল্পনা

আধুনিক সেচব্যবস্থার মাধ্যমে মিশরীয়রা প্রথম ফসল উৎপাদন করে

প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলো তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখেছে পানিসেচ ও নদী-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে প্রাচীন সভ্যতাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে একদিকে যেমন কৃষি যন্ত্রপাতির উদ্ভব হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি নদী-পরিকল্পনা ও খাল খননও হয়েছিল। অনেকে মনে করে থাকেন, কৃষিক্ষেত্রে পানিসেচের জন্য খাল কাটার পরিকল্পনা প্রথম সুমেরীয়দের

www.pathagar.com

মাথায় এসেছিল। সে আমলে অন্যান্য সভ্য দেশও জমির উপরিভাগের উঁচু-নিচু স্থান সমতল করে এবং খালের মাধ্যমে পানি যেন সমস্ত জমিকে প্লাবিত করতে পারে তারও ব্যবস্থা করেছিল। পাকা নালার মাধ্যমে পানি প্রবেশ ও পানি নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা ছিল।

যুদ্ধবিদ্যা

যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে প্রাচীনকালের মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি বেশি ব্যয় হতো। প্রথম দিকে তাদের পাথরের হাতিয়ার ছিল ভোঁতা। পরের দিকে ঘষে বেশ মসৃণ করেছিল। উক্ত কারণে পরবর্তী প্রস্তরযুগকে মসৃণ প্রস্তরযুগও বলা হয়। নব্য প্রস্তরযুগে তারা করাত, কুরুনি, বাটালি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিল। এ সময় তারা আরও আবিষ্কার করেছিল তীর-ধনুক। সে সময় ছুরির ফলার সঙ্গে হাড়ের বাঁটও সংযুক্ত করতো। ধাতুকে কাজে লাগানোর পর তাদের অস্ত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরে লোহাকে কাজে লাগিয়ে একরকম অজেয় হয়ে উঠেছিল প্রাচীনকালের মানুষ।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের একরকম আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল মূলত গ্রিক ও রোমান আমলে। তীর-ধনুক, লোহার উন্নত বর্শা ও তরবারি, বাঁটালি ইত্যাদির ব্যবহার যথেষ্ট ছিল। গ্রিকবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বড় বড় আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত ও প্রতিফলনের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের বিশাল-বিশাল নৌবহরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সৌরশক্তির ব্যবহার সম্ভবত এটায় প্রথম।

যুদ্ধে হাতির গাড়ি ব্যবহারও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অপরদিকে শত্রুর দুর্গের মধ্যে আগুন নিক্ষেপ এবং গলিত জীবজন্তুর দেহ নিক্ষেপের কথাও জানা যায়।

বারুদ আবিষ্কার যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত। প্রথমে চীনারা বারুদ আবিষ্কার করেছিল এবং হাউইয়ের মাধ্যমে শত্রুপকে সন্ত্রস্ত করতো। ভারতেও এককালে অগ্নিবানের প্রচলন ছিল। গ্রিসে আবিষ্কৃত হয়েছিল কাঠের পারাবত। পারাবতটির ভেতরে বারুদ জাতীয় জিনিসকে পুরে দেয়া হতো এবং তার একমাত্র ক্ষুদ্র ফুটো পথে আগুন সংযুক্ত করলে পারাবতটি ছুটে যেতে পারতো। আধুনিক রকেট এবং বর্তমানের ক্ষেপণাস্ত্রের আদি নির্দশন হিসেবে একে গ্রহণ করা যায়। নৌযুদ্ধে বিরাট বিরাট নৌকাকে উল্টে দেয়ার জন্য ক্রেনও আবিষ্কার করেছিলেন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস।

যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ঝোঁক মানুষের চিরন্তন। প্রাচীনকালের তীর-ধনুকের আমল থেকে আজকের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্র তারই নিদর্শন।

এছাড়াও প্রাচীন সভ্যদেশগুলোর প্রতিভা সর্বাধিক ব্যয় হয়েছিল সেটি জলযান নির্মাণে। কাঠের গুঁড়ি থেকে ভেলা ও নৌকায় উন্নীত হতে কয়েক হাজার বছর

www.pathagar.com

লেগেছিল। এই নৌকা ব্যবহারের নজির প্রথমে মিশরেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে ওরা প্যাপিরাসের গাছগুলোকে একত্রিত করে ভেলা হিসেবে ব্যবহার করতো। পরে পালতোলা নৌকাও তারা আবিষ্কার করে। পালতোলা নৌকাকে যেমন খুশি চালানোর ব্যাপারে প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করে ফিনিশীয়রা। খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর আগেও তারা পালতোলা নৌকায় আরোহণ করে বহু দূরদেশে পাড়ি জমাতো।

গ্রিকরাই সর্বপ্রথম নৌকাকে জাহাজে রূপান্তরিত করে। সে সময় জাহাজও শুধু কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হতো। জাহাজগুলো এত বড় ছিল যে, তাতে চার কিংবা পাঁচশো লোকের জায়গা হতো। গ্রিকরা বহু জাহাজ নির্মাণ করেছিল এবং পানিপথে প্রতিটি সভ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। শোনা যায়, মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার আমলেও জাহাজ শিল্পের উন্নতি হয়েছিল।

জাহাজকে আরও উন্নত রূপ প্রদান করেছিল ভাইকিংরা। ওরাও ছিল ফিনিশীয়দের মতো দুর্ধর্ষ জলদস্যু। উত্তর মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে ভাইকিংরা অনায়াসে জয় করেছিল।

যন্ত্রযুগ আরম্ভ হওয়ার পরে প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় আলোড়ন। পুরাতন ধারাগুলোকে সহজ করে তুললো যন্ত্র। পরিশ্রম লাঘব হলো মানুষের। অপরদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে শিল্পজগতেও সূচিত হলো বিরাট আলোড়ন। উদ্ভাবিত হলো নানাপ্রকার যন্ত্র এবং স্থাপিত হলো প্রচুর কলকারখানা। সেই থেকে প্রযুক্তিবিদ্যাও নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে বিদ্যুতকে মানুষ আয়ত্তে আনার পর নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি ধীরে ধীরে বেড়েছে এবং মানুষের জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জীবনে কতখানি যে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

www.pathagar.com

কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যান্য আবিষ্কার

সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ হেঁটেই যাতায়াত করতো। তারপর বাহন হিসেবে গ্রহণ করে পশুকে। কুকুর, গরু, উট, হাতি ও পরে ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে মানুষ হাঁটার পরিবর্তে পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

চাকা আবিষ্কার

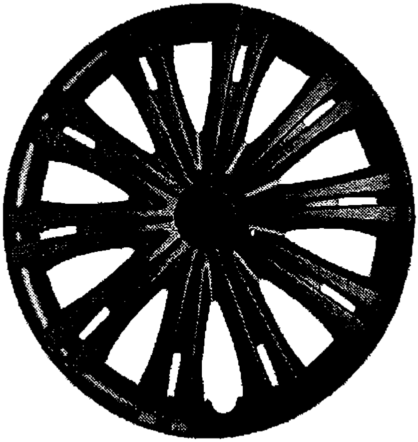

চাকা আবিষ্কারের মাধ্যমে যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন সূচিত হয়। সেদিনের চাকা ছিল শক্ত গোলাকার কাঠ দিয়ে তৈরি। একদিন মাঝখানটা ছিদ্র করে মানুষ অক্ষদণ্ড যুক্ত করেছিল। স্পোকযুক্ত চাকা আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে। স্পোকওয়ালা চাকার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় হোমারের 'ইলিয়াড ও অডিসি' গ্রন্থে। ট্রয় যুদ্ধের সময় সেনাপতিরা অনুরূপ চাকাযুক্ত বাহনে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিল।

চাকা আবিষ্কারের পর পরিবহনের কাজ অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া চাকার মাধ্যমে রথ বা পশুচালিত গাড়ি প্রস্তুত করে এবং তা পশুর দ্বারা টানিয়ে হাঁটার পরিশ্রমও লাঘব হয় মানুষের। রথ বা পশুচালিত গাড়ি যুদ্ধের সময় রাজা ও সেনাপতিরা এবং অভিজাতরা ব্যবহার করতেন। বর্তমানের ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, উটের গাড়ি এখনও আদিম সভ্যতার নিদর্শনকে বহন করে চলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে যানবাহনের কাজে সহায়ক ছিল একমাত্র পশুরাই। কাঠের চাকার উপর লোহার বেড় পরানোর রীতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। চাকায় টায়ার ও টিউব পরানো হয়েছে অনেক পরে এবং দ্রুতগামী যান আবিষ্কার হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে।

www.pathagar.com

বাইসাইকেল আবিষ্কার

বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগানোর পূর্বে মানুষ দ্বারা চালিত প্রথম গাড়ি হচ্ছে বাইসাইকেল বা দুই চাকার গাড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক ফরাসী ভদ্রলোকের মাথায় অনুরূপ এক পরিকল্পনা এসেছিল। স্যাভারব্রন নামে আর এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রকৃত সাইকেলের রূপকার। তবে সে সাইকেলের ব্রেক, প্যাডেল, সিট কিছুই ছিল না। এমনকি চাকার তলায় টায়ার ও টিউব পরানো হতো না। সামনের চাকা পেছনের চাকা অপেক্ষা বড় করা হতো এবং মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে চালাতে হতো। পরের দিকে জার্মানিতে সাইকেল তৈরির কাজ শুরু হয় এবং ডানলপ সাহেব সাইকেলের চাকায় টিউব ও টায়ার পরিয়ে আধুনিক রূপ দান করেন। বিশ্বব্যাপী আজ ডানলপের নির্মিত চাকা খ্যাতি অর্জন করেছে।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন

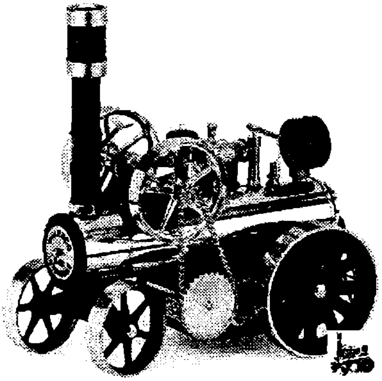

বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রথম যে যান সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি স্টিফেনসনের তৈরি রেল ইঞ্জিন। আবিষ্কৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। এটি সম্ভব হয়েছে জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের পর। বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গাড়ির পরিকল্পনা জেমস ওয়াটেরই। এর পর নিকোলাস কুনো, উইলিয়াম মার্ডক প্রভৃতি প্রযুক্তিবিদের চেষ্টায় বাষ্পচালিত যান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর চূড়ান্ত রূপই প্রদান করেছিলেন জর্জ স্টিফেনসন।

রেলপথ ও রেলগাড়ি

রেলগাড়িকেও এখন বিদ্যুৎ দ্বারা চালানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও ডিজেল ও কয়লা চালিত ইঞ্জিন কম নেই। জ্বালানির ঘাটতির জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জনবহুল শহরগুলোতে ভিড় এড়াতে এবং যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে মাটির তলায় রেলপথ নির্মাণ করে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে

www.pathagar.com

বা পাতাল রেলের ব্যবস্থা হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বেশ কতগুলো শহরে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। এর পরিকল্পনা প্রথম করেছিলেন স্যার মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনেল নামে জনৈক ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ। টেমস নদীর তলা দিয়ে তার পরিকল্পনায় প্রথম সুড়ঙ্গ রেলপথ চালু করা হয়েছিল।

মোটর গাড়ি

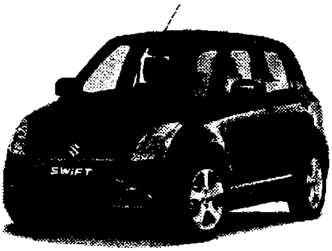

মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে আরও পরে। আজ থেকে মাত্র একশো বছর আগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দুই জন জার্মান প্রযুক্তিবিদ গটলিয়েব ডেমলার এবং কার্ল বেনজ মোটর গাড়ির চূড়ান্ত রূপ দেন। অবশেষে মোটর গাড়ি আধুনিক রূপটি লাভ করে হেনরি ফোর্ডের হাতে। ডানলপ সাহেবের প্রচেষ্টায় গাড়ির চাকায় যেহেতু টায়ার ও টিউব পরানোর রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাই স্থলযান হিসেবে মোটর গাড়ির জয়-জয়কার সূচিত হয়। যাত্রীবহন ও মালবহনের জন্য পৃথক পৃথক গাড়ির ব্যবস্থা হলো! এরপর মোটর সাইকেল, জীপ, মোটর বাস, লরি, টেম্পো, নানা ধরনের গাড়িতে ভরে গেল সারা পৃথিবী।

মোটর গাড়ির জন্য প্রথমে কয়লা, পরে পেট্রোলিয়াম ও বর্তমানে ডিজেল ও গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পেট্রোলিয়ামের মাধ্যমে চালিত গাড়ির সংখ্যাও বর্তমানে কম নেই। আজকাল কলকারখানা ও যানবাহনের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। সে কারণে কোথাও কোথাও মোটর গাড়ি চালানোর কাজে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তির ব্যবহার ব্যাপক হবে। আর তখনই প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও উন্মোচিত হবে নতুন পথ।

জলযান

পানিপথের যানবহানের ক্রমবিকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভেলা থেকে নৌকা, তারপর নৌকা জাহাজে রূপান্তরিত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু

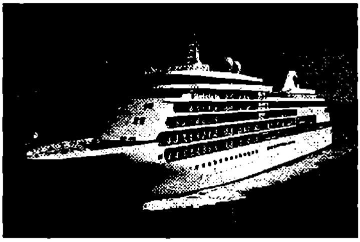

সেদিনের জাহাজ বলতে ছিল পালতোলা জাহাজ। চলতো সমুদ্রের স্রোতের টানে এবং বাতাসের সাহায্যে। ১৮০২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল। সেদিনের বীর নাবিক কলম্বাস, ভাস্কোদা গামা প্রমুখ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করেছিলেন ওই

www.pathagar.com

পালতোলা জাহাজে করেই। পৃথিবীর প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ চলেছিল স্কটল্যান্ডের ক্লাইড নদীতে ১৮০২ খ্রিস্টব্দে। এর পর রবার্ট ফুলটন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যুক্ত করে জাহাজ চালিয়েছিলেন হাডসন নদীতে। ৩২ ঘণ্টায় তিনি অতিক্রম করেছিলেন ১৫০ মাইল পানিপথ।

রবার্ট ফুলটনের বাষ্পচালিত জলযানকে জাহাজ বলা যায় না। কারণ সেটি আকারে ছিল বড় নৌকার মতো। আর এটা সমুদ্র যাত্রার উপযোগী ছিল না। তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে প্রথম স্থলযানে ব্যবহার না করে জলযানেই ব্যবহার করা হয়েছিল।

ফুলটনের বাষ্পচালিত নৌকা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজেও এনেছিল বিরাট পরিবর্তন। এই জাহাজে পাল খাটিয়ে চালানোরও ব্যবস্থা ছিল। এ পদ্ধতিতে নির্মিত প্রথম জাহাজের নাম এন্টারপ্রাইজ। উক্ত জাহাজটির আরও বৈশিষ্ট্য ছিল, সে চাকার সাহায্যে পানি কেটে এগিয়ে যেতে পারতো।

এন্টারপ্রাইজ পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজের কাঠামো ছিল কাঠের। পরবর্তীকালে নির্মিত জাহাজ 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন'কে চালানো হয়েছিল শুধু যন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ এটিই প্রথম জাহাজ যাতে পাল ছিল না। ১৮৪০ সালের দিকে ইংল্যান্ড প্রথম লোহার জাহাজ তৈরি করে এবং তাতে চাকার পরিবর্তে পানি কাটার জন্য স্ক্রু-প্রপেলার ব্যবহার করা হয়। জাহাজটির নাম ছিল গ্রেটব্রিটেন।

এভাবে জাহাজের ক্রমশ উন্নতি হতে হতে আজকের পর্যায়ে এসে পৌচেছে। বর্তমানে পরমাণু শক্তিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল নৌবহর। যাতে একই সঙ্গে কয়েকটি উড়োজাহাজ ওঠানামা করতে পারে।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ

বর্তমানে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। সাবমেরিন ইচ্ছামতো পানির উপর ভাসতে পারে আবার সাগরতলায় ডুব দিতেও পারে। সাধারণত যুদ্ধের কাজে সাবমেরিন ব্যবহার করা হয়। ওতে বসানো থাকে পেরিস্কোপ। তলায় থাকলেও যাত্রীরা পেরিস্কোপের সাহায্যে সাগরের উপরিভাগ দেখতে পারে।

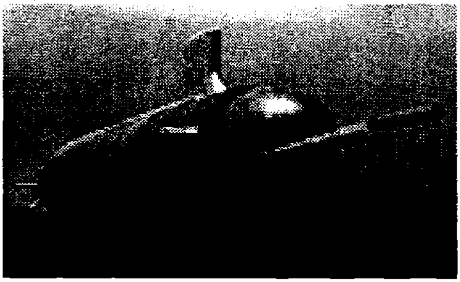

ডুবোজাহাজে থাকে কতগুলো ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক পানিপূর্ণ হলেই ডুব দেয় জাহাজ। আবার ট্যাঙ্ক থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেললে ভেসে ওঠে। সাবমেরিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে টরপেডো নামের একধরনের বোমা। টরপেডো কোনো

www.pathagar.com

যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেলে বিস্ফোরণ ঘটে এবং যুদ্ধজাহাজটি বিনষ্ট হয়।

ডুবোজাহাজের পরিকল্পনাও করেছিলেন ফুলটন। কিন্তু তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। এটি আবিষ্কৃত করেছেন ১৮৭৭ সালে 'সাইমন লেক'। বর্তমানে ডুবোজাহাজকে পারমাণবিক শক্তির দ্বারাও পরিচালনা করা হচ্ছে।

আকাশযান বা উড়োজাহাজ

আকাশযান বা উড়োজাহাজ আবিষ্কার করতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছে। পাখির মতো আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা মানুষের দীর্ঘদিনের। কিন্তু যন্ত্রযুগের পূর্বে মানুষ কিছুতেই মনের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি। গালগল্প ও পুরাণকাহিনীতে সীমাবদ্ধ ছিল অন্তরীক্ষ পরিক্রমা।

মানুষ প্রথম আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা করেছিল বেলুনের মাধ্যমে। বেলুনে চেপে প্রথম আকাশে ওঠেন লিপাৎর দ্য রোজি। বেলুনের উন্নতি সাধন করতে করতে একদিন আবিষ্কৃত হলো জেপেলিন। জানা যায়, জার্মানির গ্রাফ জেপেলিন ২২ দিনে আকাশপথে একবার পৃথিবী পরিক্রমণ করেছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় এবং দীর্ঘদিনের বহুজনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে আবিষ্কৃত হয় উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেন।

এরোপ্লেন প্রথমদিকে এতো উন্নত ছিল না। প্রথম আরোহী উইলবার রাইট মাত্র ৫৯ সেকেন্ড আকাশে থেকে ৮৫২ ফুট অতিক্রম করেছিলেন। অপর ভাই অরভিলের চেষ্টায় এরোপ্লেন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অরভিল একনাগাড়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা উড়েছিলেন আকাশে। আর প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং বহু প্রযুক্তিবিদের হাতে পড়ে এরোপ্লেন নতুন রূপ গ্রহণ করে। অরভিলের উড়োজাহাজ মাত্র একজনকে বহন করতে পারতো এবং বেগ ছিল ঘণ্টায় ৮০ মাইলের মতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এর গতিবেগ্র গিয়ে দাঁড়ালো ঘণ্টায় ১৫০ মাইল এবং একজনের পরিবর্তে বহন করলো চারজন মানুষসহ তিনটি কামান ও ৩০০০ পাউন্ড গোলাবারুদ।

এরপর এরোপ্লেনের শুধু উন্নতির ইতিহাস। বর্তমানে পাঁচ-সাতশ যাত্রী বোঝাই এরোপ্লেনও আকাশে উড়ছে। গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ মাইলের অধিক। শব্দের

www.pathagar.com

চেয়েও দ্রুতগামী (শব্দের বেগ ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল) বিমানও আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকের দিনে মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় তিন-চারবার বিশ্রাম নিয়েও মানুষ ঢাকা থেকে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে।

রকেট বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজেরও উন্নতি হয়েছে। আগে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা হতো। এখন রকেটের নীতিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার জেট বিমান।

মহাকাশযান

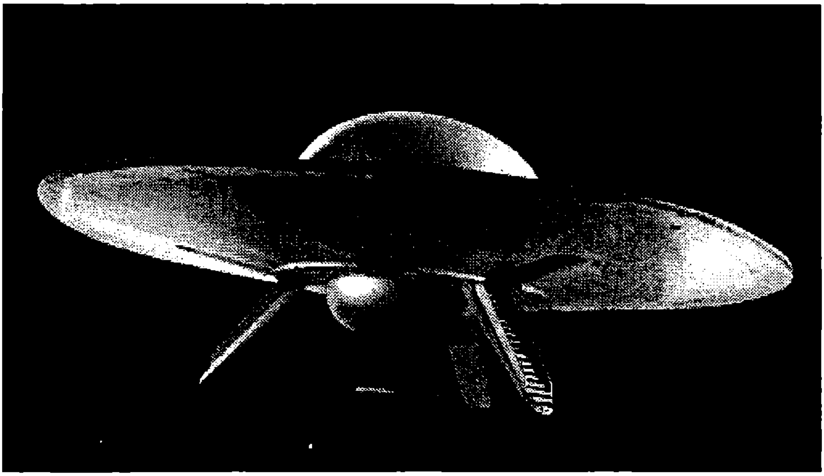

বর্তমানের প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় মহাকাশযান। পৃথিবীর বুক ছেড়ে মানুষ আজ যাত্রা করছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। মহাকাশযান নির্মাণ থেকে কোনো গ্রহে অবতরণ এবং সেখান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা এক জটিল কর্মকাণ্ড। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে এটি সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সকল শাখার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। আর তা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির অভাবনীয় উন্নতির মাধ্যমে।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক, ইন্টিগ্রেটেট সার্কিট, রোবট যন্ত্রমানব আজকে অসাধ্যকে সাধন করেছে। বিশাল বিশাল যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ হোক না, তাকে সমাধান করতে কয়েক সেকেন্ডও সময় লাগে না। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC-এর সাহায্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলোকে মাত্রাতিরিক্তভাবে ছোট করা সম্ভব হয়েছে। ছোট্ট একটু করামিলিকন কেলাসের ভেতরে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে হাজার হাজার অ্যাম্পলিফায়ার ও অন্যান্যকে সংকুলান করানো যাচ্ছে।

www.pathagar.com

রোবট

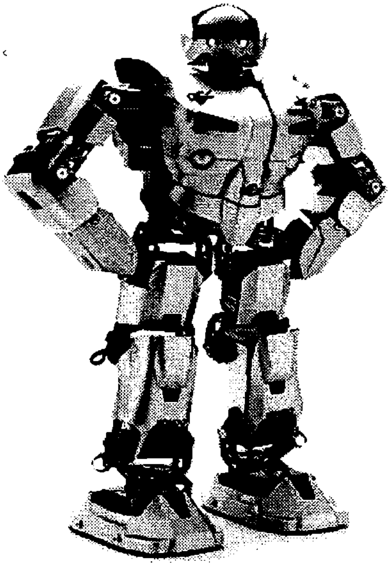

রোবট বর্তমান পৃথিবীর আর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। অত্যন্ত উত্তপ্ত জায়গায়, গভীর সমুদ্রে মানুষ যেখানে কাজ করতে অসমর্থ সেখানে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয় রোবটকে। মানুষ উদ্ভাবন করেছে কৃত্রিম বুদ্ধি ও বোধসম্পন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

রোবট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এতে কম্পিউটার যন্ত্র থাকে এবং কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করা হয়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী রোবট কাজ করে। অদূর ভবিষ্যতে রোবটের আরও উন্নতি হবে এবং মহাকাশযাত্রা ও নতুন নতুন গ্রহে অবতরণের জন্য প্রয়োজন হবে।

প্রাণ প্রযুক্তিবিদ্যা

প্রাণ প্রযুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানের নতুন সংযোজন। আজ কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে রক্তও তৈরি করতে পেরেছে মানুষ। তৈরি করেছে টেস্ট টিউব বেবি এবং কৃত্রিমভাবে জীবকোষ তৈরির ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে মানুষ। উপহার দিতে পেরেছে জীবকোষ। এছাড়া নানা প্রকার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষকে দীর্ঘজীবী করানোর জন্যও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণ প্রযুক্তিবিদ্যা। ভবিষ্যতে প্রযুক্তিবিদ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এবং এর পরিণতি কোথায় তা ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বলে দেবে।

www.pathagar.com

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বর্ণনা

বিবর্তনবাদ ও চার্লস ডারউইন

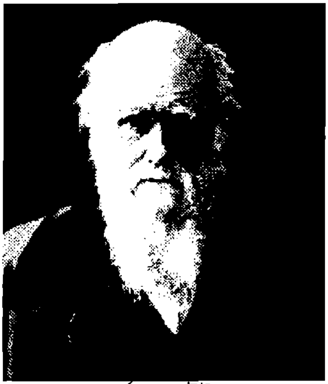

চার্লস ডারউইন

আজ থেকে কয়েকশো বছর আগেই প্রশ্ন উঠেছিল বিবর্তনবাদ নিয়ে। চার্লস ডারউইন নামের একজন মানুষ এই বিবর্তনবাদ নিয়ে পৃথিবীর মানুষের সামনে হাজির করেছিলেন মানুষ সৃষ্টির এক নতুন মতবাদ। ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গে অনেকের ধারণা মানুষের উৎপত্তি বাঁদর থেকে। কিন্তু ডারউইন কখনো এই ধরনের কথা বলেননি। তাঁর অভিমত ছিল মানুষ এবং বাঁদর উভয়েই কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন আজকের মানুষের জন্ম হয়েছে নীচু শ্রেণীর কোনো প্রাণী থেকে বিবর্তন হতে হতে। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাই দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে এই মতবাদ নিয়ে। চার্লস ডারউইনের জন্ম হয় ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। নয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হলেন। তিনি লিখেছেন, বাড়িতে তাঁর ভাই একটি ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি রসায়নের নানান মজার খেলা খেলতেন। ষোলো বছর বয়েসে চার্লসকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হলো। যাঁর মন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে, মরা দেহের হাড় অস্থি-মজ্জা তাঁকে কেমন করে আকর্ষণ করবে! পরবর্তীতে তাকে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি করা হলো। উদ্দেশ্য ধর্মযাজক করা। সেই সময় কেমব্রিজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন হেনসলো (Henslow)। হেনসলোর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়লেন চালর্স। অল্পদিনের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কেমব্রিজ থেকে পাশ করে তিনি কিছুদিন ভূবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে চার্লস ডারউইনের জীবনে এক অযাচিত সৌভাগ্যের উদয় হল। অধ্যাপক হেনসলোর কাছ থেকে একখানি পত্র পেলেন ডারউইন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিগল (H.M.S. Beagle) নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে বের হবে। এই অভিযানের প্রধান হলেন

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন ফিজরয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজন্তু, গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করা। এই ধরনের কাজে বিশেষজ্ঞ এবং অনুরাগী ব্যক্তিরাই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না ডারউইন। ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর 'বিগল' দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ছাড়াও গালাপগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালদ্বীপ, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে জাহাজ ঘুরে বেড়াল।

এই সময়ের মধ্যে ডারউইন ৫৩৫ দিন কাটিয়েছিলেন সাগরে আর ১২০০ দিন ছিলেন মাটিতে। ডারউইন যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন তার নমুনার সাথে সুনির্দিষ্ট বিবরণ, স্থান, সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখতেন। কোনো তত্ত্বের দিকে তাঁর নজর ছিল না। বাস্তব তথ্যের প্রতি ছিল তাঁর আকর্ষণ। ২৪ জুলাই ১৮৩৪ সাল। ডারউইন লিখেছেন 'ইতোমধ্যে ৪৮০০ পৃষ্ঠার বিবরণ লিখেছি, এর মধ্যে অর্ধেক ভূবিদ্যা, বাকি বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর বিবরণ'। 'বিগল' জাহাজে চড়ে দেশভ্রমণের সময় মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর যখন ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন ডারউইন তখন তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু অদম্য মনোবল, বাড়ির সকলের সেবায় অল্প দিনেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময় তিনি তাঁর কাজিন এম্মা ওয়েজউডকে বিবাহ করেন। বিবাহের সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করেন ডারউইন। এম্মার গর্ভে ডারউইনের দশটি সন্তান জন্মায়। শুধু মা হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবেও এম্মা ছিলেন অসাধারণ।

ডারউইনের পরবর্তী বই এক ধরনের সামুদ্রিক গুগলিদের নিয়ে। এই বইটি লিখতে ডারউইনের সময় লেগেছিল আট বছর। এইসময় তাঁর মনোজগতে এক নতুন চিন্তার জন্ম হচ্ছিল। যদিও সুদীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ছিল অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, বিশে-ষণ, গবেষণার মধ্যে দিয়ে তারই মধ্যে থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল এক নতুন মতবাদ—বিবর্তনবাদ। ডারউইন প্রথমে তাঁর বিবর্তনবাদের উপর ২৩০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলেন। এরপর শুরু হল পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ। তাতে নতুন তথ্য সংযোজন করা, প্রতিটি তথ্যের বিচার-বিশে-ষণ করা, তাকে আরো যুক্তিনিষ্ঠ করা। সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চলেছিল এই সংশোধন পর্ব। অবশেষে ২৪ নভেম্বর ১৮৫৯ সালে ডারউইনের বই প্রকাশিত হল। বইয়ের নাম The origin of species by means of Natural Selection or the preservation of Favoured Races in the struggle for life. (পরবর্তীকালে এই বই শুধু Origin of Species নামে পরিচিত হয়। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে ১২৫০ কপি বিক্রি হয়ে গেল। বিবর্তনবাদের নতুন তত্ত্ব বাইবেলের আদম ইভের কাহিনী, পৃথিবীর সৃষ্টির কাহিনীকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশে-ষণ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এই বইতে তিনি লিখেছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে। জীবের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেই

www.pathagar.com

কারণে নিয়ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে চলেছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরামহীন প্রতিযোগিতা। যারা পরিবেশের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে তারাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু যারা পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই ধারাকেই বলা হয়েছে যোগ্যতমের জয় 'Survival of the Fittest'। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সমুদ্রের মধ্যে জন্ম হচ্ছে স্থলভাগের, কত স্থলভাগ হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে, অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবিত প্রাণেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে সঠিক নির্বাচন। ডারউইনের মতবাদ এই পরিবর্তনশীলতা, বংশগতি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণি পরিবেশের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য বিধান করে। জীবের সুবিধার জন্য এই পরিবর্তন তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটায়, সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির। The Origin of Species প্রকাশিত হওয়ার পর ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আরো উন্নতভাবে প্রকাশ করবার জন্য ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করলেন Variation of Animals and Plant under Domestication। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হল ডারউইনের আর একখানি বিখ্যাত রচনা The Descent of Man। প্রাণে বিকাশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতমের জয় হচ্ছে। এক প্রজাতি থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেক প্রজাতি। প্রাণি প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করছে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে। ডারউইনের মতো অনুসারে মানুষ নিম্নতর জীব থেকে ধাপে ধাপে উন্নত জীবের স্তরে এসে পৌঁছেছে। এই ক্রমবিবর্তনের চিত্রই তিনি এঁকেছেন তার The Descent of Man। ডারউইনের মতে মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ সমস্ত জীবজগতের মধ্যে মানুষ সকলের চেয়ে বেশি যোগ্যতম। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো স্বর্গচ্যুত দেবদূত নয়, সে বর্বরতার স্তর থেকে উন্নত জীব। এগিয়ে চলাই তার লক্ষ্য। তিনি যখন শেষবারের মতো লন্ডনে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ৭৩ বছর।

এক বন্ধুর বাড়ির দরজার সামনে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধু বাড়িতে ছিলেন না। বন্ধুর বাড়ির চাকর ছুটে আসতেই ডারইউন বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি একটা গাড়ি ডেকে বাড়ি চলে যেতে পারব। কাজের লোককে কোনোভাবে বিব্রত না করে ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর বিছানা থেকে উঠতে পারেননি তিনি। ক্রমশই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে চলল। ডারউইন বুঝতে পারছিলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। তিন মাস অসুস্থ থাকার পর ১৯ এপ্রিল ১৮৮২ সাল, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু দেশ জুড়ে নয়—পুরো পৃথিবী জুড়ে যেন শোকের কালো ছায়া নেমে আসে।

www.pathagar.com

পানির প্লাবিতা সূত্র ও আর্কিমিডিস

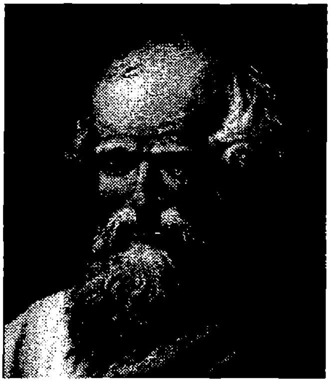

আর্কিমিডিস

দুই হাজার বছর আগের কথা। ইতালির রাজা স্বর্ণকারকে তৈরি করতে দিলেন একটা সোনার মুকুট। মুকুট তৈরি হয়ে যাবার পর স্বর্ণকার রাজার হাতে তুলে দিলেন। মুকুট খুবই সুন্দর হয়েছে। রাজা কিন্তু সন্দেহ করলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে খাদ বা ভেজাল মেশানো আছে। সে সময় পণ্ডিত হিসাবে আর্কমিডিসের নাম ছিল খুব। রাজা তাঁকে ডেকে বললেন, প্রমাণ করতে হবে মুকুটে কোনো খাদ মেশানো আছে কিনা। তবে মুকুটটিকে ভাঙা চলবে না। এই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন আর্কিমিডিস। সম্রাটের আদেশে মুকুটের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। আর্কিমিডিস ভেবে পান না মুকুট না ভেঙে কেমন করে তার খাদ নির্ণয় করবেন। কয়েকদিন কেটে গেল। ক্রমশই অস্থির হয়ে ওঠেন আর্কিমিডিস। একদিন দুপুরবেলায় মুকুটের কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত পোশাক খুলে চৌবাচ্চায় স্নান করতে নেমেছেন তিনি। পানিতে শরীর ডুবাতেই আর্কিমিডিস লক্ষ্য করলেন কিছুটা পানি চৌবাচ্চা থেকে উপছে পড়ল। মূহূর্তে তাঁর মাথায় এক নতুন চিন্তার উন্মেষ হলো। এক লাফে চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন তাঁর শরীরে কোনো পোশাক নেই। সমস্যা সমাধানের আনন্দে নগ্ন অবস্থাতেই ছুটে গেলেন রাজদরবারে। মুকুটের সমান ওজনের সোনা নিলেন। একপাত্র পানিতে মুকুটটি ডোবালেন। দেখা গেল খানিকটা পানি উপছে পড়ল। এইবার মুকুটের ওজনের সমান সোনা নিয়ে পানিপূর্ণ পাত্রে ডোবানো হল। যে পরিমাণ পানি উপছে পড়ল তা ওজন করে দেখা গেল আগের উপছে পড়া পানি থেকে তার ওজন আলাদা।

আর্কিমিডিস বললেন, মুকুটে খাদ মেশানো আছে। কারণ যদি মুকুট সম্পূর্ণ সোনার হত তবে দুটি ক্ষেত্রেই উপচে পড়া পানির ওজন সমান হত। এই আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হলো একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র। 'তরল পদার্থের মধ্যে কোনো বস্তু নিমজ্জিত করলে সেই বস্তু কিছু পরিমাণে ওজন হারায়। বস্তু যে

www.pathagar.com

পরিমাণে ওজন হারায় সেই পরিমাণ ওজন বস্তুর অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান'। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর্কিমিডিসের সূত্র নামে বিখ্যাত। আর এটাই পানির প্লাবিতা সূত্র। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আধুনিক আর নিরাপদ জলযান।

আর্কিমিডিসের জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭ সালে। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সাইরাকিউস দ্বীপে। পিতা ফেইদিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। কৈশোর ও যৌবনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে পড়াশুনা করেছেন। সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। ছাত্র অবস্থাতেই আর্কিমিডিস তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্য সর্বজন পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর গুরু ছিলেন ক্যানন। সম্রাটের আদেশে তিনি প্রায় ৪০টি আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়িক জিনিস হলেও অধিকাংশই ছিল সামরিক বিভাগের প্রয়োজন। আর্কিমিডিসের একটি আবিষ্কার পুলি ও লিভার। একবার কোনো একটি জাহাজ চরে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে তাকে আর কোনোভাবেই পানিতে ভাসানো সম্ভব হচ্ছিল না। আর্কিমিডিস ভালোভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর মনে হলো একমাত্র যদি এই জাহাজটাকে উঁচু করে তোলা যায় তবেই জাহাজটাকে পানিতে ভাসানো সম্ভব। আর্কিমিডিসের কথা শুনে সকলে হেসেই উড়িয়ে দিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্ভাবন করলেন লিভার আর পুলি। জাহাজ ঘাটে একটা উঁচু জায়গায় লিভার খাটাবার ব্যবস্থা করলেন। তার মধ্যে বিরাট একটা দড়ি বেঁধে দিলেন। দড়ির একটা প্রান্ত জাহাজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে সম্রাট হিয়েরো নিজেই এলেন জাহাজঘাটে। নগর ভেঙে যেখানে যত মানুষ ছিল সকলে জড় হয়েছে। আর্কিমিডিস সম্রাটকে অনুরোধ করলেন লিভার লাগানোর দড়ির আরেকটা প্রান্ত ধরে টানতে। আর্কিমিডিসের কথায় সম্রাট তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়িটা ধরে টান দিলেন। সাথে সাথে অবাক কাণ্ড। নড়ে উঠল জাহাজটা। চারদিকে চিৎকার উঠল। এবার সম্রাটের সাথে দড়িতে হাত লাগালেন আরো অনেকে। সকলে মিলে টান দিতেই সত্যি সত্যি জাহাজ শূন্যে উঠতে আরম্ভ করল। সম্রাট আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর্কিমিডিসকে। এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় পাথর, ভারি জিনিস, কুয়া থেকে পানি তোলার কাজ সহজ হলো। একবার আর্কিমিডিস গর্ব করে বলেছিলেন, আমি যদি পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেতাম তবে আমি আমার এই লিভার পুলির সাহায্যে পৃথিবীটাকেই নাড়িয়ে দিতাম। রোমান সেনাপতি মার্কিউলাস সাইরাকিউস আক্রমণের জন্য বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। রোমান সেনাপতি সাইরাকিউস দখল করে নেন। মার্কিউলাস আদেশ দিয়েছিলেন আর্কিমিডিসকে যেন হত্যা না করা হয়। তাঁকে সসম্মানে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয় কারণ তিনি সচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন সেই মহান বিজ্ঞানীকে যিনি একাই তাঁর বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করেছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

সৈনিকদের কেউই আর্কিমিডিসকে চিনত না। তারা সমস্ত নগরময় অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করল। আত্মভোলা আর্কিমিডিস তখন আপন মনে গবেষণার কাজ করে চলেছেন। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জয়ের কোনো সংবাদই তিনি রাখেন না। খোঁজ করতে করতে একজন সৈন্য দেখতে পেল এক বৃদ্ধ, সারা মুখে সাদা দাড়ি। নিজের কুটিরের সামনে বসে আপন মনে চক খড়ি দিয়ে মেঝের উপর বৃত্ত আঁকছেন।

সৈনিকটি বলে উঠল, 'আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমাদের সেনাপতি আপনার খোঁজ করছেন।' বৃদ্ধ আর্কিমিডিস বলে উঠলেন, 'আমি এখন ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারব না।' এ ধরনের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রোমান সৈন্যটির। তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে তা পালন করতেই হবে। আর্কিমিডিসের হাত ধরতেই এক টানে ছাড়িয়ে নিলেন আর্কিমিডিস। অনেকটা রাগের সাথেই বললেন, 'আমার কাজ শেষ না হলে কোথাও যেতে পারব না।' আর সহ্য করতে পারল না সৈনিক। পরাজিত দেশের এক নাগরিকের এতদূর স্পর্ধা, তার হুকুম অগ্রাহ্য করে! একটানে কোমরের তলোয়ার বার করে ছিন্ন করল মহান বিজ্ঞানীর দেহ। রক্তের ধারায় শেষ হয়ে গেল তাঁর অসমাপ্ত কাজ। সেই সাথে পৃথিবীবাসী হারালো তাদের এক পরম সুহৃদকে। আর্কিমিডিসকে হত্যা করা হয়েছিল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২১২ সালে। বিজ্ঞানীর ছিন্ন মুণ্ডু দেখে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন মার্কিউলাস। তিনি মর্যাদার সাথে আর্কিমিডিসের দেহ সমাহিত করেন। মহানবিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কার সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। সামরিক প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলেও ওই বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। মূলত গাণিতিক বিষয়েই ছিল তাঁর আগ্রহ। দিনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। বাইরের জগতের সব কথাই তিনি তখন ভুলে যেতেন। এমন বহু সময় গিয়েছে তাঁর কাজের লোক তাঁকে খাবার দিয়ে গেছে, সারাদিনে তিনি সেই খাবার স্পর্শই করেন নি। ভুলেই গিয়েছেন খাবার কথা। আবার কখনো গোসল করতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। খোঁজ করতেই দেখা গেল তিনি গোসলখানার দেওয়ালেই অঙ্ক কষে চলেছেন। বলবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা বারোটি। এছাড়াও তিনি আর যে সমস্ত রচনা করেছিলেন তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। আর্কিমিডিস আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর কাজ এবং গবেষণার কীর্তি গুনে শেষ করা যাবে না। আজও তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে চির অমর হয়ে আছেন। তাঁর দিক-নির্দেশনায় আজও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্প কারখানা। পৃথিবীবাসী কোনোদিন এই মহান বিজ্ঞানীর কথা ভুলতে পারবে না।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নিকোলাস কোপার্নিকাস

জ্যোতির্বিজ্ঞান অর্থ হলো মহাকাশ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান করা। মহাকাশ হলো এক অপরিসীম রহস্যের আধার। আমাদের মাথার ওপরের ঘন নীল আকাশের ওপারে কি আছে এটা জানার চিরন্তন কৌতূহল মানব সভ্যতার শুরু থেকেই। দিনে দিনে মানুষ যত উন্নত হয়েছে—তাদের এই কৌতূহল ততই বেড়েছে। যুগে যুগে তাই এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মহাকাশ সম্পর্কে একের পর এক নতুন নতুন তথ্য উদ্ভাবন করেছেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীগণ। এদের মধ্যে নিকোলাস কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও গ্যালিলি, আইজ্যাক নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি মহাকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

আমরা জানতে পেরেছি আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। একটি সৌরজগতের বাসিন্দা আমাদের এই গ্রহটি। সৌরজগতের রয়েছে আরও কিছু প্রতিবেশী। আমাদের এই গ্রহের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে আরেকটি উপগ্রহ। যেটাকে আমরা বলে থাকি চাঁদ। আমাদের এই শস্যশ্যামলা পৃথিবীটা নিরন্তর পাক খেয়ে চলেছে সূর্য নামক এক মহাশক্তিশালী নক্ষত্রের চারপাশে। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে দিন এবং রাত। এইসব বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের আগে পৃথিবীতে দিন এবং রাত সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিল। উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে আমরা মহাকাশ সম্পর্কে যেসব তথ্য জানতে পেরেছি সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

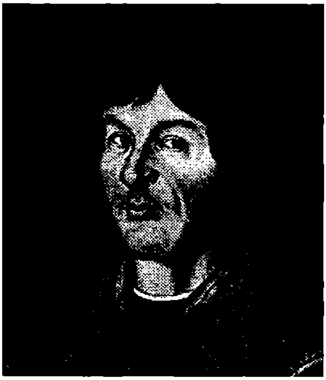
নিকোলাস কোপার্নিকাস

জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানান তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। তিনি বললেন বিশ্ব একটা গোলক এবং তা গোলকের মতোই ঘুরছে। পৃথিবীও একটি গোলাকার বস্তু এবং তা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারদিকে ঘুরছে। তাঁর এই তত্ত্বকে অনুসরণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন তথ্য দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস।

www.pathagar.com

নিকোলাস কোপার্নিকাস বর্ণিত মহাকাশ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্যগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে করে তুললো অনেক অংশে সমৃদ্ধ। সেসব তথ্যে যাবার আগে জানা দরকার নিকোলাস কোপার্নিকাস কে ছিলেন। ১৪৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডের থর্ন শহরে নিকোলাস কোপার্নিকাসের জন্ম। থর্ন বাল্টিক সাগরের কাছে ভিসটুল নদীর তীরে ছোট বন্দর শহর। বাবা ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। কোপার্নিকাসের পারিবারিক নাম ছিল নিকোলাস কোপার্নিক। কোপার্নিক শব্দের অর্থ বিনয়ী। শুধু নামে নয়, আচার ব্যবহারে, স্বভাবেও কোপার্নিকাস ছিলেন যথার্থই বিনয়ী।

ছেলেবেলা থেকেই কোপার্নিকাসের আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, তারা সম্বন্ধে ছিল গভীর কৌতূহল। যখন তার দশ বছর বয়স, বাবা মারা গেলেন। বালক কোপার্নিকাসের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন চাচা লুকাস ভাৎমেসনরোড। চাচার বাড়িতে বিশাল বড় গ্রন্থাগার ছিল। এখানেই বাবাকে হারানোর দুঃখ ভুলে থাকতেন। সারাদিন নানান বিষয়ের বই পড়তেন। তবে তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত বিজ্ঞান আর সাহিত্য। পড়াশুনায় এই আগ্রহ দেখে চাচা তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৮ বছর বয়সে কোপার্নিকাস ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলেন। সেই যুগে ক্র্যাকাও গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেই যুগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ব্রডজেৎস্কি ছিলেন এখানকার শিক্ষক। কোপার্নিকাস কলাবিভাগের ছাত্র হলেও বেশিরভাগ সময়েই গণিত ও জ্যোর্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার এই আগ্রহ দেখে চাচা বলতেন, আকাশের দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকাও। চাচার ইচ্ছা অনুসারে তিনি ডাক্তারিতে ভর্তি হলেন। ডাক্তারি পাশ করলেন। কিন্তু মানুষের দেহের জটিলতার চেয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জটিলতাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত। তাই স্থির করলেন ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ইতালিতে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন। চাচা তাকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

২৩ বছর বয়সে তিনি ইতালির বেলেগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি চার বছর অধ্যয়ন করেন। এই সময় প্রধানত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করতেন। গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শিখলেন—যাতে গ্রিক ভাষায় লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই পড়তে পারেন। তাছাড়া, প্রাচীন আরব পণ্ডিতদের লেখা বহু বই গ্রিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তিনি এই সমস্ত বইগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করতেন। যথাসময়ে তিনি বেলেগনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। সেই সময় টলেমীর সিদ্ধান্তগুলোই ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান পাঠ্য। কিন্তু কোপার্নিকাসের মনে টলেমীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে ওঠে। পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তাকে কেন্দ্র করে সূর্য তারা চাঁদ

www.pathagar.com

ঘুরছে। এই মতকে তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। অ্যারিস্টাকার্স নয়, পরবর্তী যুগে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লসের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ওরিসিমি অ্যারিস্টটলের অভিমতের বিরুদ্ধে গতিশীল পৃথিবীর ধারণার কথা বলেন। কুপার নিকোলাস নামে এক পণ্ডিত বলেন, গ্রহ-নক্ষত্রের মতো পৃথিবীও আবর্তিত হচ্ছে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিও বিশ্বাস করতেন পৃথিবী স্থির নয়, গতিশীল।

তিনি বললেন, শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, পরীক্ষার দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। তাছাড়া কোপার্নিকাসের শিক্ষক ডোমেনিকোও এ্যারিস্টটলের মতে বিশ্বাস করতেন না। এই পরস্পর বিরোধী অভিমতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোপার্নিকাসের মনে হলো প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। যে বিষয়ে তিনি নিজেই সন্দিহান—কেমন করে তা ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কোপার্নিকাস। মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিলেন। ফিরে এলেন চাচা লুকাসের কাছে ফ্রাউয়েনবার্গে। এখানে তিনি গ্রাম্য যাজকের কাজ নিলেন।

ফ্রাউয়েনবার্গ ছিল একটি পাহাড়ি গ্রাম। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানকার মানুষদের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন কোপার্নিকাস। অসুস্থ মানুষেরা তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসত। অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু চিকিৎসা আর সমাজসেবা নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও তার ছিল সুগভীর জ্ঞান। তিনি নানা ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতেন। অর্থনীতির উপর তিনি একটি বই লিখেছিলেন। এই বইয়ে সে যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নানান ভুল ত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বহু অভিমত সরকার গ্রহণ করে। তিনি দেখেছিলেন একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা তৈরি করে। তিনি বললেন, এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলের মানুষ গ্রহণ করতে চায় না। তাছাড়া, বিদেশি বণিকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। লাভের আশায় শাসকেরা ইচ্ছামতো মুদ্রামান কমায় বা বাড়ায়।

কোপার্নিকাস সারা দেশে একই ধরনের মুদ্রা চালু করার কথা বললেন। তাছাড়া মুদ্রামান কমানোর বিপক্ষেও তিনি অভিমত প্রকাশ করতেন। কোপার্নিকাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো আধুনিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করা। ক্যালেন্ডার চালু হওয়ার পর থেকে তাতে বিশেষ কোনো সংশোধন হয়নি। তিনি পোপের অনুরোধে ক্যালেন্ডার সংশোধনের কাজে হাত দিলেন এবং সঠিকভাবে, দিন, মাস, বছরের হিসাব নির্ণয় করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম বছরের সঠিক কাল পরিমাণ আবিষ্কার করেন। তখনো দুরবীন আবিষ্কার হয়নি। রাতের পর রাত তিনি আকাশের দিকে চেয়ে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করতেন তার অনন্ত রহস্য এবং প্রতিটি পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানের ফলাফল তিনি খাতার পাতায় লিখে রাখতেন।

www.pathagar.com

বেশ কয়েকজন প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর রচনার মধ্যে তার অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য খালি চোখের উপরই নির্ভর করতে হত। দূরের আকাশ তার পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। খালি চোখে যতটুকু দেখেছিলেন এবং ১৫০৫ এবং ১৫১১ সালে দুটি সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে এই বিশ্ব প্রকৃতির গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলেন।

প্রধানত তার উপরে ভিত্তি করেই গণিতের সূত্রের সাহায্যে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্রের অবস্থান নির্ণয় করেন এবং এই অবস্থানগুলো কোনো টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়াই কীভাবে এত নির্ভুলভাবে স্থির করেছিলেন তা ভাবতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

তিনি যখন গবেষণায় নিমগ্ন, কিছু মানুষ তার উদারতা সরলতার সুযোগ নিয়ে নানানভাবে বিব্রত করতে আরম্ভ করল। এরা সাধারণ মানুষের কাছে নানাভাবে প্রচার করতে আরম্ভ করল, 'একটা নিতান্তই বোকা লোক খালি চোখে দেখতে পায়, সূর্য আমাদের চারদিকে ঘুরছে আর পৃথিবী স্থির' আর কোপার্নিকাস মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বলছে পৃথিবী ঘুরছে আর সূর্য স্থির। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, শিক্ষিত মানুষেরাও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ উপহাস করতে লাগলেন। প্রটেস্টান্ট ধর্মগুরু মার্টিন লুথার বললেন, 'কোপার্নিকাস একজন নির্বোধ। গোটা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই ওলট-পালট করে দিতে চাইছে।'

আর একজন বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'পৃথিবী স্থির, কেউ একে নড়াতে পারবে না। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতাকে কখনোই তিনি প্রকাশ করেননি। সাধারণ মানুষের বিদ্রূপ উপহাসের চেয়ে পোপের ইনইকুইজিনিসের ভয় ছিল অনেক বেশি। বাইবেলের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করার অর্থই নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। জীবন সায়াহ্নে এসে কোপার্নিকাস তাঁর জীবনব্যাপী পর্যবেক্ষণ আর আবিষ্কারকে প্রকাশ করলেন তার যুগান্তকারী গ্রন্থে—দি রিভোল্যুশনিবাস আররিথাম কোয়েলেসটিয়াম (মহাজাগতিক বস্তুগুলোর ঘূর্ণন)। বইটি রচনা করলেও প্রকাশ করলেন না।

এই বইটির প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল পৃথিবী আপন অক্ষের চারদিকে আবর্তনশীল। কিন্তু মানুষ তা জানে না। তাদের অনুমান জ্যোতিষ্করাই পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনই সত্য। আকাশের বুকে গ্রহ নক্ষত্রের যে আপাত অবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা পৃথিবীর প্রকৃত আবর্তনের প্রতিফলন মাত্র। কোপার্নিকাসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল সূর্যই কেন্দ্রে অবস্থান করছে। পৃথিবী সহ প্রত্যেকটি গ্রহ ব্যাসার্ধের নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে আপন আপন বৃত্তপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধুমাত্র চাঁদই পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তপথে ঘুরছে। তারকারা বহু দূরে বৃত্তপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

www.pathagar.com

দুরবিন বা টেলিস্কোপ এবং গ্যালিলিও গ্যালিলাই

দুরবিন বা টেলিস্কোপের আবিষ্কার হয়েছে অনেক আগে, সেই কোন স্মরণাতীত কালে। তবে সে দুরবিন কেমন ছিল তা জানা যায় না। আধুনিককালে লিপারশি নামে হল্যান্ডের এক চমশা প্রস্তুতকারকই দুরবিনের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি ধাতুনির্মিত একটা সরল চোঙের তলায় লেন্স বসিয়ে ঠিক দুরবিন না হলেও দুরবিনের মতো একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেটা ছিল ইংরেজি ১৬০৮ সাল।

এর দুই বছর পর ১৬১০ সালে ইতালির বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই সেই চশমা প্রস্তুতকারক লিপারশীর যন্ত্রের অনুরূপ আর এক ধরনের দুরবিন তৈরি করেন। এটিও ছিল ধাতুনির্মিত একটি সরল চোঙ। তবে একটি লেন্সের বদলে দুটি লেন্স ব্যবহার করেছিলেন গ্যালিলিও। চোঙের তলায় যুক্ত করেছিলেন একটি বড় লেন্স এবং উপরে তারচেয়ে ক্ষুদ্র আর একটি লেন্স। সেদিন নিজের তৈরি দুরবিন নিজের চোখে লাগিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন গ্যালিলিও। অবাক হয়েছিলেন নিজেই।

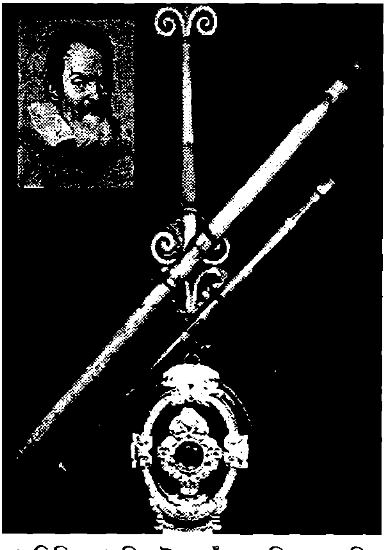

গ্যালিলিও গ্যালিলাই ও তাঁর আবিষ্কৃত দূরবিন

ছেলেবেলা থেকেই গ্যালিলিওর মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। বিচিত্র বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল কৌতূহল। Valiombrosa-র ধর্মীয় স্কুলে পড়তে পড়তে সেখানকার ধর্মীয় শিকদের প্রভাব দেখে তিনি স্থির করলেন যাজকের পথই জীবনে গ্রহণ করবেন। গ্যালিলিওর বাবা তাঁর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে পথে নিশ্চিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে, তাতেই ছেলেকে ভর্তি করবেন। গ্যালিলিওর ইচ্ছা ছিল অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করা। পিতার আদেশে ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি ভর্তি হলেন পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

www.pathagar.com

গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, বয়স ১৯। একদিন গ্যালিলিও রিচির বাড়িতে গিয়েছেন, রিচি তখন তার ঘরের মধ্যে ছাত্রদের ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াচ্ছিলেন। এক সময় আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বাধ্য হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন যদি কোথাও অধ্যাপনার চাকরি পাওয়া যায়। এই সময়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষকের একটি পদ খালি ছিল। মাইনে মাত্র কুড়ি শিলিং। তবুও সানন্দে সেই পদ গ্রহণ করলেন গ্যালিলিও। তখন তিনি পঁচিশ বছরের এক তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখতেই গ্যালিলিও দেখলেন যে দিকেই তাকান শুধু অ্যারিস্টটল আর অ্যারিস্টটল। তিনি যা কিছু বলে গিয়েছেন তাই সত্য, তাকে নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর অনেক কিছুই মানতে পারলেন না। অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল, অনেকে তাঁর স্পর্ধা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'দুটি জিনিসকে উপর থেকে একই সঙ্গে ফেললে ভারী জিনিসটি আগে পড়বে, হালকা জিনিসটি পরে মাটি স্পর্শ করবে'– অ্যারিস্টটলের এই তথ্য ভুল। প্রকৃত পক্ষে দুটি জিনিস একই সঙ্গে পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, আমি সকলের সামনে প্রমাণ করব আমার বক্তব্যের সত্যতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, শহরের সমস্ত জ্ঞানী-গুণী মানুষদের সাথে নিয়ে গ্যালিলিও এলেন পিসার বিখ্যাত হেলানো টাওয়ারের সামনে। কয়েকজনকে নিয়ে তিনি উঠে গেলেন টাওয়ারে মাথায়। এক হাতে দশ পাউন্ডের বল অন্য হাতে এক পাউন্ডের বল। দুটিকে একই সাথে উপর থেকে ফেলে দিলেন। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল দুটি বল একই সাথে মাটি স্পর্শ করল।

গ্যালিলিওর সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। তবুও অনেকে মানতে পারলেন না। তারা প্রচার করতে লাগলেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কারসাজি ছিল।

পিসার ডিউকের পুত্র রাজকুমার ডন জিওভান্নি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন স্থানীয় বন্দরের পলি পরিষ্কারের জন্য। ডিউক যন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য গ্যালিলিওর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সব দেখে শুনে গ্যালিলিও বললেন যন্ত্রটি কাজের অনুপোযুক্ত। জিওভান্নি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। অন্য সকলের সাথে তিনিও চাইলেন গ্যালিলিওর বিতাড়ন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলেন গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর কয়েকজন বন্ধু অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদ পেলেন (১৫৯২)। মাইনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে তিনি পেলেন বিদ্যাচর্চার আদর্শ পরিবেশ। এখানে গ্যালিলিও শুরু করলেন তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনা করলেন একাধিক প্রবন্ধ। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল সমস্ত ইউরোপে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিলেন। ছাত্রদের ভিড় সামলাবার জন্য তিনি বিরাট একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। মাঝে মাঝে সব ছেড়ে দিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতেন শহরের উপকণ্ঠে সমাজ পরিত্যক্তা এক রমণীর কাছে। তার

www.pathagar.com

নাম মারিনা গাম্বা। কিছুদিন পর তাকে নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। যদিও কখনো মারিনাকে তিনি বিবাহ করেননি তবুও উত্তরকালে তার গর্ভে গ্যালিলিওর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।

এই সময় নানান যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন। প্রথমে কম্পাস, এর মধ্য দিয়ে বোঝালেন পৃথিবীর চুম্বকত্ব শক্তির কথা। তারপর পানি উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের লিভার। বাতাসের উত্তাপ পরিমাপ করার জন্য থার্মোমিটার। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির ক্রমশই এত চাহিদা বাড়তে থাকে, তিনি বাড়িতে লোক রাখলেন তাকে সাহায্য করার জন্য। এইসব আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিল কিন্তু তবুও তাঁর অভাব দূর হলো না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে মনোনিবেশ শুরু করেন ১৬০৪ সাল থেকে।

এই সময় আকাশে একটি নতুন তারা দেখা গেল। বিভিন্ন লোকের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো, কেউ বললেন উল্কা, কেউ বললেন নতুন কোনো তারা। গ্যালিলিও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে সর্বসমক্ষে তার মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, এটি কোনো গ্রহ নয়, উল্কাও নয়, সৌরমণ্ডলে অবস্থিত নিতান্তই একটি তারা। তার এই বক্তৃতা শুনতে দলে দলে লোক এসে হাজির হলো। এরপর তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর। তার সাথে লিখতে লাগলেন গতিতত্ত্ব, বিশ্ব প্রকৃতি, শব্দ, আলো, রং প্রভৃতি নানান বিষয়ের উপর রচনা।

১৬০৯ সাল। চারপাশে গুজব শোনা গেল একজন ডাচ চশমার দোকানের কর্মচারি কাজ করতে করতে এমন একটা জিনিস তৈরি করেছে যা দিয়ে নাকি অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়। গ্যালিলিও কথাটি শুনলেন। শুরু হলো চিন্তা-ভাবনা। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর একটা ফাঁকা নলের মধ্যে একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতেই দেখতে পেলেন বহু দূরের বাড়িটি মনে হচ্ছে কয়েক হাতের মধ্যে এসে গিয়েছে। আবিষ্কৃত হলো দুরবিন বা টেলিস্কোপ।

অবশেষে ১৬০৯ সালের ২১ আগস্ট তিনি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য দুরবিন নিয়ে গেলেন ভেনিসের এক উঁচু বাড়ির মাথায়। লোকেরা বিস্ময়ে দেখতে লাগল দুই মাইল দূরের সমুদ্র, তাতে ভেসে চলা জাহাজ। আরো দূরের পাহাড়। রাতের আকাশে বড় বড় তারা। চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁকে আজীবন অধ্যাপক পদ দিলো। চারদিক থেকে দুরবিন তৈরির অর্ডার আসতে লাগল। তিনি বাড়িতে কারখানা করে প্রায় ১০০টির মতো দুরবিন তৈরি করলেন। নিজের জন্য তৈরি করলেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি দুরবিন। আকারে আয়তনে এই দুরবিন অন্য সব দুরবিনের চেয়ে বড়। বিরাট সেই দুরবিন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন সমস্ত আকাশ। তিনি বললেন চাঁদ একটি উপগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে ছোট-বড়

www.pathagar.com

অসংখ্য পাহাড় আর গিরিখদ। তিনি আবিষ্কার করলেন শনির বলয়। জুপিটারের উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জ। এই পর্যবেক্ষণ আর আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করলেন প্রথম বই SIDEREUS NUNCIUS (The Messenger)। এত আবিষ্কার খ্যাতি অর্থ সম্মান পেয়েও কিছুতেই সন্তুষ্ট হলেন না গ্যালিলিও।

পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার জন্য ডিউকের কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু ডিউক তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে ডিউক মারা যাবার পর তার পুত্র দ্বিতীয় কসিমো নতুন ডিউক হলেন। তিনি ছিলেন গ্যালিলিওর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি গুরুকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন, সেই সঙ্গে ডিউকের দর্শন ও অঙ্কের শিক্ষকের পদ পেলেন। ক্লাস করবার বা পিসায় থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। এর মূল কারণ ছিল কোপার্নিকাসের মতবাদ। গ্যালিলিওর বহু আগেই ১৫৪৩ সালে পোল্যান্ডের মহান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন সূর্য স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করেই এই পৃথিবী ও অন্য গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের ভয়ে এই বই তিনি জীবিতকালে প্রকাশ করতে পারেন নি। ১৬১১ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন সূর্যের উপরে কিছু চিহ্ন। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুরাগীর কাছে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রথম প্রকাশ করলেন। কোপার্নিকাসের মতের সমর্থনের প্রকাশ করলেন তাঁর যুক্তি ও অভিমত। ক্রমশই তার সেই ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তাঁর শত্রুর সংখ্যা। যে সমস্ত অধ্যাপক এতদিন অ্যারিস্টটলের মতের বিশ্বাসী ছিল, তাদের মনে হলো নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝি এবার ধ্বংস হয়ে যায়। এবার গ্যালিলিও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কাছে ডেকে প্রথমে তাদের প্রতিটি যুক্তি অভিমত শুনতেন তারপর সামান্য কয়েকটি কথায় তাদের সমস্ত যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। বন্ধুরা অনুভব করতে পারছিলেন গ্যালিলিওর বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে। তারা বারংবার তাকে সাবধান করতে থাকে। কিন্তু গ্যালিলিও কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই ইনকুইজিশানের পক্ষ থেকে গ্যালিলিওকে ডেকে পাঠানো হল। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৬১৬ সালে গ্যালিলিও বিচারকদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হলো তিনি সূর্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধে যে সব কথা প্রচার করেছেন তা ধর্মবিরুদ্ধ সুতরাং তিনি এই সম্বন্ধে আর কোনো বই লিখতে পারবেন না। কোনো মত প্রকাশ করতে পারবেন না। এই আদেশ অমান্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

তিনি জানতেন কি ভয়ংকর শাস্তির বোঝা নেমে আসবে তার উপর। গ্যালিলিও তাই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে সমস্ত আদেশ মেনে নিলেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ফ্লোরেন্সে নিজের পরিবারে ফিরে এলেন গ্যালিলিও। গোপনে পুনরায় শুরু

www.pathagar.com

করলেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কেউ তাঁর কোনো সংবাদই জানতে পারল না। দীর্ঘ পনেরো বছর পর তিনি রচনা করলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ। 'বিশ্বের প্রধান দুটি নিয়ম সম্বন্ধে কথোপকথন'।

গ্যালিলিও রোমে গিয়ে পোপের কাছে তা ছেপে বের করবার অনুমতি নিলেন। বইটিতে তিন চরিত্র। একজন কোপারনিকাসের মতকে সমর্থন করেছেন, আর একজন টলেমির সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আর তৃতীয়জন নিরপেক্ষ। প্রথম চরিত্রটি গ্যালিলিওর প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় ব্যক্তি সিমপ্লিসিও কিছুটা মজার আর বোকা ধরনের লোক। ১৬৩২ সালে বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। অপরদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের মনে হলো ১৬১৬ সালের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এই বই রচনা করেছেন গ্যালিলিও। তাছাড়া অনেকে প্রচার করতে আরম্ভ করল, পোপকে বিদ্রূপ করেই গ্যালিলিও মজার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। সাথে সথে বইয়ের প্রচার বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। বইটির সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য একটি কমিটি তৈরি হলো।

কমিটি সবকিছু বিচার করে রায় দিল গ্যালিলিও পূর্বের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এই বই রচনা করেছেন। রোমে বিচারসভায় উপস্থিত হবার জন্য গ্যালিলিওকে আদেশ দেওয়া হলো। গ্যালিলিও তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। বাধ্য হয়ে ১৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রোমে এসে হাজির হলেন। দীর্ঘ চার মাস অন্তরীন

গ্যালিলিও গ্যালিলাই তাঁর আবিষ্কৃত দুরবিন ও চাঁদ সম্পর্কে পরিচিতজনদের নানা তথ্য দিচ্ছেন

www.pathagar.com

থাকার পর ১৬৩৩ সালের ১২ এপ্রিল তিনি প্রথম ইনকুইজিশানের সামনে উপস্থিত হলেন। ৩০ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয়বার কোর্টের সামনে এসে হাজির হলেন। কথোপকথন বইটি সম্বন্ধে তাকে জেরা করা হলো। জুন মাসের ১৬ তারিখে পোপের সভাপতিত্বে সভা বসল, এতে ঠিক হলো যদি গ্যালিলিও তার অপরাধ স্বীকার না করেন তবে তাঁর উপর অত্যাচার করা হবে। ২১ তারিখে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। শুরু হলো তাঁর উপর অত্যাচার। গ্যালিলিও তাঁর শারীরিক-মানসিক সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন। শেষপর্যন্ত সব অভিযোগ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দিলেন। ২২ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে ১৮১৬ সালের নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য এবং ধর্মবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দিত্বের আদেশ দেওয়া হলো। নির্দেশ দেওয়া হল ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো বই রচনা করতে পারবেন না। ডিসেম্বর মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তার গ্রাম Arcetry-তে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। অসুস্থ শরীরে নতুন উদ্যমে তিনি আবার কাজ শুরু করলেন। এবার সম্পূর্ণ গোপনে রচনা করলেন 'দুটি নতুন বিজ্ঞানের বিষয়ে কথোপকথন'। এই বইয়ের মধ্যে তিনি তাঁর আগেকার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে বলবিদ্যার মূল তত্ত্বের আলোচনা করেছেন।

আইজাক নিউটন পরবর্তীকালে বলবিদ্যার যে সমস্ত সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, গ্যালিলিওই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বই ইতালিতে প্রকাশ করবার সাহস হলো না। গোপনে তিনি পাঠিয়ে দিলেন হল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৬৩৮ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর বই অমূল্য সৃষ্টি। কিন্তু নিজের সৃষ্টি ছাপা অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। ক্রমশই তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেলেন গ্যালিলিও। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি অন্ধ অবস্থায় কাটান। এই সময় তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে ফ্লোরেন্সে যেতে দেওয়া হলো। কিছু বাধা-নিষেধ শিথিল করা হলো। ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করল। গ্যালিলিও তখন অসুস্থ, বিছানায় শয্যাশায়ী।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কাছে এলেন আঠারো বছরের তরুণ ছাত্র ভিভানি। গ্যালিলিওর প্রথম জীবনীকার। তিনি সেবা-যত্নে গ্যালিলিওর শেষ দিনগুলো ভরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৬৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "The Law of Motion"। যা তাঁর মৃত্যুর স্থিতিকে অতিক্রম করে পৌঁছে দিয়েছিল জীবনের অনন্ত গতিতে।

www.pathagar.com

গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্র

গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানের রাণী। কাজেই সকল বিজ্ঞানের রাণী হিসেবে এর রূপ এবং জটিলতা অপরিসীম। বস্তুত ওজনের সূত্রপাত যেদিন থেকে সেদিন থেকেই প্রায় গণিতের চর্চা শুরু। অন্যভাবে বলা যায় গণিতচর্চার মাধ্যমেই আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষের বিজ্ঞানচর্চার শুরু। বিজ্ঞানের সব শাখার সঙ্গেই গণিতের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আজকে আমরা যে কম্পিউটার সভ্যতায় বসবাস করছি—তার পেছনেও কিন্তু গণিতের অবদান অপরিহার্য। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই জানি, গণিতের সাধারণ সূত্র দিয়েই কম্পিউটার তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে। কম্পিউটারের যে দুটো প্রধান উপদানের মাধ্যমে তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে সে দুটো হলো গণিতের অতি পরিচিত দুটি সংখ্যা। সেগুলো হলো ০ এবং ১। এই দুটো সংখ্যার সাহায্যে যে-কোনো কম্পিউটার চালু হয় বা বন্ধ হয়। এমনকি তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার পেছনেও কাজ করে এই সংখ্যা দুটো। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়—গণিতের সাধারণ সূত্রের মাধ্যমেই কম্পিউটার কাজ করে থাকে। সাধারণ জীবনেও আমরা প্রায় প্রত্যেকটা লোকই অল্পবিস্তর অঙ্ক করে থাকি। প্রত্যেক দিনই বাজারের সময়ের হিসাব, আয়ের হিসাব প্রভৃতি আমাদের করতে হয়। এ সবই পাটিগণিতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি রাস্তা পার হবার সময় রাস্তায় চলমান গাড়ি এবং তার দূরত্বের সঙ্গে সময়ের একটা আনুপাতিক হিসাব মাথার মধ্যে আমাদের অজান্তেই হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অঙ্ক বা গণিতশাস্ত্রের প্রভাবও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গণিতশাস্ত্র এক বিরাট জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর এর শাখাপ্রশাখাও অনেক। প্রথমেই আসা যাক পাটিগণিতের কথায়। গুণীজনরা বলেন, প্রাচীনকালে পাটি বা পাটির মতো জিনিসের উপর বসে গণিতচর্চা করা হত। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাটিগণিত। বীজগণিতের বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হয় তা সকল শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যেই প্রযোজ্য। প্রাচীন ভারতেরই এক বিরাট গণিতজ্ঞ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত। ইনি তাঁর 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' বইটিতে পাটিগণিত ও বীজগণিত নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইনিই প্রথম পাটিগণিত ও বীজগণিতের প্রভেদ নির্দেশ করেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই বইটিতে যে অধ্যায়ে বীজগণিতের আলোচনা করেছেন তার নাম কুট্টক। গণিতশাস্ত্রের আর একটি ধারায় বিভিন্ন প্রকার স্থানের পরিমাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই ধারাটির নাম জ্যামিতি। পূর্বে একে ক্ষেত্রমিতি বা কল্পসূত্র

www.pathagar.com

বলা হত। ত্রিকোণমিতি হচ্ছে জ্যামিতির একটা ধারা। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ত্রিভুজ। ত্রিকোণমিতি বিভিন্ন প্রকার ত্রিভুজকে পরিমাপ করার পদ্ধতি আলোচনা করে। কাজেই যদি একটা ত্রিভুজের কিছু অংশ জানা থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতির মাধ্যমে আমরা ত্রিভুজের অন্যান্য অংশগুলোর রূপ নির্ণয় করতে পারি। বিশে-ষণাত্মক জ্যামিতিকে (অ্যানালিটিকাল জিওমেট্রি) বলা হয় বীজগণিত ও জ্যামিতির মিশ্রণ। জ্যামিতিক অভিব্যক্তিকে বীজগণিতের মাধ্যমে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বিশে-ষণাত্মক জ্যামিতি বলা হয়। পারস্য দেশের বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম সর্বপ্রথম বিশে-ষণাত্মক জ্যামিতির ধারণা দেন। এর প্রায় পাঁচশ বছর পরে ফরাসী গণিতজ্ঞ ডেকার্তে এর উপর একটি বই রচনা করেন। এই বই-এর প্রকাশকাল ছিল ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। গণিতের আর এক ধারা হল ক্যালকুলাস বা কলম। মহাবিজ্ঞানী নিউটন এবং লিবনিৎস্কে এই বিশেষ গণিতের প্রবর্তক বলা হয়। তবে এঁদের থেকে প্রায় বারশো বছর আগে আমাদের দেশের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। ক্যালকুলাসে বিভিন্ন Variable-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা যায়। পরিসংখ্যান বা Statistics হচ্ছে ফলিত গণিত বিজ্ঞানের একটি ধারা। ল্যাটিন শব্দ States, ইটালিয়ান শব্দ Statista আর জার্মান শব্দ Statistik-এর অর্থ হল রাষ্ট্র। প্রাচীনকালে দেশের সরকার রাষ্ট্রের জনসংখ্যা গণনা, দেশের সম্পদের পরিমাণ প্রভৃতির কাজ করত। এই থেকেই এর নাম Statistics হয়েছে। বর্তমানে পরিসংখ্যান বলতে তথ্য সম্পদের সামগ্রিক পরিমাণ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা ও কোনো যুক্তিযুক্ত মান অনুসারে মূল্যায়িত ও পরিকল্পিত করা।

ফলিত গণিতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা। প্রাচীনকাল থেকেই গণিতশাস্ত্র প্রসার লাভ করেছে মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। (ক) সময় গণনা; (খ) সংখ্যা গণনা ও (গ) ক্ষেত্র গণনা। এই সময় গণনার কাজটি প্রাচীনকাল থেকেই করা হয়ে থাকে মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক এবং সূর্য চন্দ্রের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে। এই কারণে বেশিরভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ ছিলেন। টলেমি, আর্যভট্ট, কোপানিকাস, গ্যালিলিও—বিখ্যাত এ-সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মূলত গণিতজ্ঞ ছিলেন। আবার প্রাচীনকালের বিখ্যাত গণিতজ্ঞের জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল।

গণিতের ব্যবহার ঠিক কবে শুরু হয়েছে তা আজ বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করে শুরুতে একেবারে সেই প্রস্তর যুগেও (প্রায় পাঁচ হাজার থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে) সভ্য মানুষেরা ভালোই গণিতের ব্যবহার করত। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে আজ থেকে আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। ব্যাবিলনবাসীরা হিসাব বা গণনা কার্যের জন্য যে লিপির ব্যবহার করত তার নাম ছিল কিউনিফর্ম লিপি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ব্যাবিলনবাসীরা একাধিক

www.pathagar.com

লিপির ব্যবহার করতে জানত। লিখিত ব্যাপারকে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য ব্যাবিলনবাসীরা মাটির উপর সরু কঠিন ধাতুদণ্ড দিয়ে লিখে তা পুড়িয়ে নিত। এই রকম পোড়া মাটির ফলকের সাহায্যেই তারা হিসাব রাখত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ-রকম প্রচুর চাকতির সন্ধান পেয়েছেন। পাটিগণিতের প্রায় সব রকম প্রক্রিয়ার সাথেই ব্যাবিলনবাসীরা পরিচিত ছিল। ব্যাবিলনবাসীরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল সবকিছুতেই বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিল। ব্যাবিলনীয়রা বেশ বড় বড় সংখ্যার ব্যবহার জানত। আমরা যে রকম এক, দশ, একশ, হাজার—মানে দশগুণ করে বাড়িয়ে বড় বড় সংখ্যা তৈরি করি। ব্যাবিলনের লোকেরাও অনেকটা একই পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা তৈরি করত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাচীনকালে ব্যাবিলনের এই সংখ্যা দশমিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত ছিল। অনুমান করা যায়, এরা শূন্যের ব্যবহারও জানত। যদিও বলা হয় শূন্যের আবিষ্কার হয়েছিল আদি ভারতবর্ষে। ঠিক বীজগণিতের সাথে পরিচিত না হলেও বলা যায় যে বীজগণিতের একেবারে প্রাথমিক পর্বের সাথেও ব্যাবিলনীয়রা পরিচিত ছিল।

অজানা প্রতীক ব্যবহার করে ছোটখাট গাণিতিক সমাধান এরা করতে পারত। ঠিক কি রকম প্রতীক এরা ব্যবহার করত বা কোন্ প্রক্রিয়াতে এরা এসব সমাধান করত তার সঠিক বিবরণ জানা যায়নি। তবে জানা গেছে যে একাধিক অজানা রাশির সমাধান তারা করতে পারত।

বীজগণিত পাটিগণিতের মতোই জ্যামিতিতেও ব্যাবিলনবাসীরা বেশ অগ্রগতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। অনুমান করা যায়, বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের পরিমাপ করতে এরা জানত। শুধু তাই নয় বৃত্ত সম্বন্ধেও এদের প্রচুর জ্ঞান ছিল। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের নির্দিষ্ট অনুপাত এবং মান সম্বন্ধেও এরা ওয়াকিবহাল ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলনে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও প্রসার লাভ হয়েছিল। জীবন রক্ষার তাগিদেই বলা যায় তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করত। ব্যাবিলনবাসীরা প্রতিটি দিনকে ২০ ভাগে ভাগ করেছিল এবং ৭দিনে এক সপ্তাহ, ৪সপ্তাহে ১মাস এবং ১২মাসে ১বছর গণনা করত। ফলে ব্যাবিলনবাসীদের বছর প্রকৃত সৌরবছরের থেকে কিছু কম হত। কাজেই হিসাব ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝেই একটা ১৩মাসের বছর করে সূর্যের পরিক্রমণের (সেকালে ধারণা ছিল সূর্য পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করছে) সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত।

মিশর, ব্যাবিলনের মতো সিন্ধু সভ্যতায়ও গণিতশাস্ত্র-সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। শুধু তাই নয় ভারতের এই জ্ঞানচর্চা চলেছিল প্রায় ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় যে, গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারায় ভারতীয়রা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের লেখা লীলাবতীতে শূন্যের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এর থেকে জানা যায় যে

www.pathagar.com

শূন্যের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা পারদর্শী ছিলেন। ক্যালকুলাসের বিষয়েও ভারতীয় গণিতজ্ঞদের জ্ঞান ছিল। এই বিষয়ে ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত গণিতজ্ঞরা কাজ করে গেছেন। প্রাচীন ভারতে পাটিগণিতের সবকটি প্রক্রিয়ারই বিশেষ চল ছিল। এছাড়া বীজগণিতেও সেই সময় প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীধর আচার্য দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানে যে ফর্মুলা আবিস্কার করেছিলেন তা আজও পৃথিবীব্যাপী ব্যবহার করা হয়।

ভারতের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট প্রায় ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে বীজগণিতের ল্যাগ্রাঞ্জ এবং অয়লার থিয়োরোমের মূল তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করেছিলেন পরে ল্যাগ্রাঞ্জ থিয়োরেম আবিষ্কার করেন ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে এবং অয়লার ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে আর একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব দুটি তাঁদের নামেই আজ পরিচিত পেয়েছে। তৎকালীন গণিতজ্ঞরা বাইনোমিয়াল তত্ত্ব প্রভৃতি বীজগণিতের উচ্চ পর্যায়ের সুত্রগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। পাটিগণিত বীজগণিতের মতো জ্যামিতি ত্রিকোণমিতিতেও ভারতীয়রা দক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন প্রকার ত্রিভূজ, আয়তত্রে, বর্গক্ষেত্র সামন্তরিক প্রভৃতির ক্ষেত্রফল তৎকালীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা বের করতে পারতেন।

অন্যান্য সভ্যতাগুলির মতন ভারতীয় গণিতজ্ঞরাও বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাছাড়া কোণ, গোলক, পিরামিড প্রভতি বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক স্থানের সম্বন্ধেও তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেও বহু তত্ত্ব এ উপমহাদেশেই আবিস্কৃত হয়েছে।

জ্যামিতি শাস্ত্র ও ইউক্লিড

ইউক্লিড

আজকের সভ্যতায় জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশার অবদানের কথা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষ করে স্থাপত্যকলা বিভাগে জ্যামিতি একটি বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। বস্তুত জ্যামিতি ছাড়া স্থাপত্যকলা বিভাগের কথা চিন্তা করাই যায় না। এছাড়া বিভিন্ন জ্যামিতিক মাপ-জোকের মাধ্যমেই গ্রহ-নত্রের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদির মোটামুটি মান বের করা গেছে।

আধুনিক জ্যামিতির সূত্রপাত মাত্র কয়েকশো বছর আগে। তবে অনেকের মতে প্রকৃত জ্যামিতির সূত্রপাত ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের দিকে ইউক্লিড নামক এক গণিতবিদের হাতে।

www.pathagar.com

যদিও এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারণ, প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে অন্তত তিনজন ইউক্লিড আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সবাই ছিলেন গণিতজ্ঞ। একজন প্লেটোর সতীর্থ ইউক্লিড, একজন বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের কিছু পূর্ববর্তী এবং শেষ জন গ্যালিলিওর সময়ে।

তবে বিশেষ করে যে একজন ইউক্লিডের কথা বিশেষভাবে ধরা হয়– এবং বলা হয়ে থাকে প্রকৃত জ্যামিতির সূত্রপাত তাঁর হাতই হয়েছে–তিনি প্লেটোর পরবর্তীকালে এবং আর্কিমিডিসের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। ইনি প্লেটোর শিষ্যদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং রাজা প্রথম টলেমির রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই মহান গণিতজ্ঞের প্রকৃত নাম ইউক্লিড কিংবা ইউক্লিদেশ তাও ঠিক করে বলার উপায় নেই। তবে, আমরা তাঁকে ইউক্লিড নামেই অভিহিত করব। ইউক্লিডের জীবনকাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য লাভ করার আজ কোনো উপায় নেই। পণ্ডিতেরা অনেক যুক্তি তর্কের পর সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি। ইউক্লিড ছিলেন এথেন্সের বাসিন্দা এবং তাঁর পিতার নাম ছিল নাউক্রাতেস। তিনি প্লেটোর একাডেমিতে প্লেটোর শিষ্যদের কাছে শিক্ষালাভ করে সম্ভবত অলেকজান্দ্রিয়াতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রদের পাঠদান করতেন। সেকালে সব দেশের পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শিক্ষাদান করা উভয়ই পূণ্যকর্ম। তাঁরা আরো মনে করতেন, সৎভাবে জীবনযাপন করতে হলে একমাত্র শিক্ষাদান ব্রতই গ্রহণ করা উচিত। প্রাচীন ভাবধারার ইউক্লিডও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পর মনোযোগ সহকারে শিষ্যদের পাঠদান করতে আরম্ভ করলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ইউক্লিডের নাম দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হল। চিন্তাশীল ইউক্লিড তাঁর চিন্তাধারাকে এবার পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। প্রবৃত্ত হলেন গ্রন্থ রচনায় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই কাজে লিপ্ত ছিলেন।

তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি পরবর্তীতে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর লেখা সমস্ত পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। মহাকালের গর্ভে অধিকাংশ নিক্ষিপ্ত হয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মাত্র তিনটি গ্রন্থ কালের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে আজও সগৌরবে বিরাজমান। সেই বইগুলির নাম 'ডাটা', 'অপটিকস' ও 'এলেমেন্টস'। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ইউক্লিডের 'কনিকস', 'সিকউডারিয়া', 'পরিসম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আরো বহু গ্রন্থ ছিল। কবে এবং কীভাবে যে গ্রন্থগুলি হারিয়ে গেছে সে কথা আজ অর বলার কোনো উপায় নেই। ইউক্লিডের সর্বপ্রধান কীর্তি তাঁর এলেমেন্টস নামক গ্রন্থখানি।

এই গ্রন্থটি প্রাচীনকাল থেকেই প্রাথমিক জ্যামিতি শিক্ষাদান করা হয় তার অধিকাংশই ইউক্লিডের জ্যামিতির অনুকরণ। অনেকে মনে করেন, জ্যামিতির ভিত্তি

www.pathagar.com

স্থাপন করে গেছেন ইউক্লিড। তাঁর আগে যেসব জ্যামিতির প্রচলন ছিল সেগুলিকে জ্যামিতি না বলে পরিমিতিই বলা উচিত। কারণ সে যুগে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি আকারের ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে জ্যামিতির উদ্ভব এবং প্রচলন একেবারেই হয়নি এমন নয়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত ইউডক্সস, থিয়েতেতস প্রভৃতি মনীষীদের লেখার মধ্যে জ্যামিতির উল্লেখ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, ইউক্লিডের আগে যে সমস্ত জ্যামিতির প্রচলন ছিল সেগুলিকে তিনি একীভূত করেছিলেন তাঁর এলেমেন্টস নামক গ্রন্থখানিতে।

ইউক্লিডের আরও একটি কীর্তি, তিনি কতকগুলি প্রচলিত উপপাদ্যের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, কতকগুলি অসম্পূর্ণ উপপাদ্যকে সম্পূর্ণ করেছিলেন, আবার কতকগুলি তিনি নিজেই আবিষ্কার করে গেছেন। এলেমেন্টস গ্রন্থখানির গুরুত্ব আজো বর্তমান। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রেখে গ্রন্থখানিকে বিশেষভাবে সংস্কারও করা হয়েছে ফলে গ্রন্থখানির গৌরব বহুলাংশে বেড়েছে। ইউক্লিডের অন্যান্য গ্রন্থগুলিও গভীর গণিত ও জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। শুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চাও করেছিলেন তিনি। তবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যুক্তিতর্কের অবতারণাই করেছেন। মোট কথা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের ভাবকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি।

কারো কারো মতে, ইউক্লিড আলোকবিদ্যা সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, আলো সরলরেখায় চোখ থেকেই নির্গত হয়। ইউক্লিডের রচিত মহান গ্রন্থগুলিই চিরকাল ইউক্লিডকে অমর করে রাখবে। প্রথমেই স্বীকার করা হয়েছে, ইউক্লিডের জীবনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কেসে, হেরণ প্রভৃতি পরবর্তীকালের চিন্তানায়কগণ ইউক্লিডের বইগুলির কথা বারবার স্মরণ করেছেন। ইউক্লিডকে এবং নিজেদের রচনায় উদ্ধৃত করেছেন ইউক্লিডের মতবাদকে। কোথায়, কবে এবং কীভাবে যে এই মহান জ্যামিতিবিদের জীবনাবসান হয়েছে সে কথা গভীর অন্ধকারে আবৃত।

www.pathagar.com

পরমাণুবিজ্ঞান ও জন ডালটন

জন ডালটনকেই প্রকৃত পরমাণুবাদের প্রবর্তকরূপে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ইগলসফিল্ড নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডালটন। গ্রাম্য বিদ্যালয়েই তাঁর প্রথম পড়াশোনা শুরু হয়। অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল। কথিত আছে, বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তিনি গ্রিক ও ল্যাতিন নামক দুটি দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান এবং অঙ্কের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করতেন ভীষণভাবে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করার পর ডালটন বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন কলেজে। সেখানেও রেখেছিলেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অবশেষে বিজ্ঞানে এম. এস-সি ডিগ্রি লাভের পর ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে।

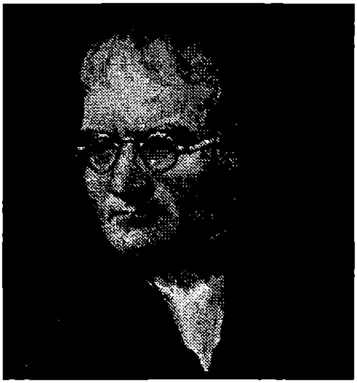

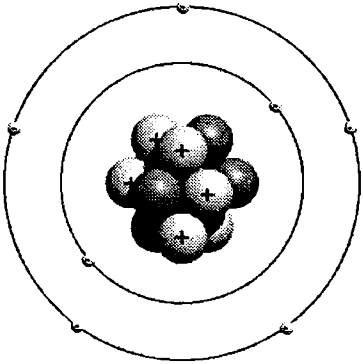

জন ডালটন ও তাঁর পরমাণু মডেল

সেই থেকেই তাঁর গবেষণা শুরু। তখন বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। জন ডালটনের মৌলিক গবেষণাগুলো প্রথম ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন গ্যাস প্রসারণ সূত্র এবং গ্যাসের অংশ চাপ সূত্র। এই সূত্র দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ডালটনের সূত্রগুলো যাচাই করতে। শেষে তাঁরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন সূত্রগুলোকে এবং ডালটনও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী হিসেবে। এই ঘটনা থেকে রসায়ন বিজ্ঞান

www.pathagar.com

ডালটন ব্যতীত আরো বহু বিজ্ঞানীর মতবাদ লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্যাস আয়তনের সূত্র আবিষ্কারের পর ডালটনের মনে পদার্থের গঠন সম্পর্কে চিন্তা স্থান লাভ করেছিল। সেই চিন্তা থেকেই জন্মলাভ করেছিল 'পরমাণুবাদ' নামক ডালটনের বিখ্যাত মতবাদটি। তাঁর এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণা নিয়ে গঠিত। সেই অন্তিম কণাগুলোর নাম পরমাণু বা এ্যাটম। এই কণাকে ভাঙাও যায় না কিংবা গড়াও যায় না।

প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে এক কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের ওজনে এবং ধর্মে আছে স্বাতন্ত্র্য। মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা আবার সরল ও সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হতে পারে। ডালটন অবশ্য মৌলিক বা যৌগিক যে কোনো পদার্থের সূক্ষ্মতম অন্তিম কণাকে পরমাণু নামে অভিহিত করেছিলেন। এখানে ছিল তাঁর কল্পনার বড় রকমের ত্রুটি। সেই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল অনেক পরে। তাছাড়া পূর্ববর্তী কল্পনা আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞান স্বীকার করছে না। ডালটনের উপরোক্ত সূত্র ও মতবাদগুলো ছাড়া আরো অনেক আবিষ্কার আছে। তিনি পরমাণুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং পরমাণুর ওজন সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গ্যাসের তরলীকরণের উপায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, উচ্চচাপে এবং নিম্ন তাপমাত্রার সমস্ত গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ডালটন জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন, তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসেবে। জীবনে বহু সম্মান এবং পুরস্কারও লাভ করেছিলেন তিনি। লন্ডনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ দান করেছিল সুবর্ণপদক। আজীবন অধ্যাপনা এবং গবেষণার পর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

www.pathagar.com

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও লিউয়েন হুক

চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক দূর এগিয়ে গেলেও মানুষের দেহে কেন রোগ জন্মায় এ ব্যাপারটি তখনো অজানাই থেকে গেল। এ-সময় আবির্ভাব হলেন জনসেন, তিনি ছিলেন ওলন্দাজ নাগরিক। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে চশমার কাঁচ নিয়ে এমন এক যন্ত্র আবিস্কার করলেন যাতে যে কোনো জিনিসকে ১৫০ গুণ বড় করে দেখা যায়। যন্ত্রটার নাম দিলেন মাইক্রোস্কোপ। এর সাহায্যে অজানা জীবাণুরা ধরা পড়ে গেল বিজ্ঞানীদের কাছে।

লিউয়েন হুক

তবে জীবাণু আবিষ্কার প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যাঁর নাম মনে আসে তিনি লিউয়েন হুক নামের ডেনমার্কের এক চশমাওয়ালা। তিনিই প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি দেখলেন এক ফোঁটা পানি মাইক্রোসস্কোপের তলায় রাখলে দেখা যাবে তার মধ্যে রাশি রাশি পোকা কিলবিল করছে। তাঁর এই আবিষ্কারের সমর্থক আর একজন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক—লুই পাস্তুর।

তবে সত্যিকার অর্থে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে লিউয়েন হুকের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

জ্যানসন নামে এক ভদ্রলোক এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম নির্মাতা হিসাবে স্বীকৃত হলেও প্রকৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি, তার নির্মাতা লিউয়েন হুক। সারা জীবন ধরে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন যন্ত্রটির উন্নতি সাধনের জন্য। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন লিউয়েন হুক। শৈশবে লেখাপড়া তাঁর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। লেখাপড়া অপেক্ষা যন্ত্রপাতির অনুকরণে নতুন কিছু তৈরি করার দিকেই ছিল তাঁর আগ্রহ। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড্ড খামখেয়ালি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই খেয়ালিপনা আরও বেড়ে যায়। লোকে ভাবতো, লিউয়েন হুক মাথাটায় একটু গোলমাল আছে।

www.pathagar.com

পরিণত বয়সে জীবিকা অর্জনের জন্য লিউয়েন হুক একটি চশমার দোকান খুলেছিলেন। তবে খেয়ালি মানুষের খেয়াল তো? চশমা বিক্রি অপেক্ষা কাঁচকে ঘসে ঘষে লেন্স তৈরি করতে ভালোবাসতেন। এমন একদিন এল, যেদিন তাঁর খেয়ালিপনায় অসুন্তুষ্ট হয়ে একটিও খরিদ্দার উঠল না দোকানে। তাতে যেন খুশিই হলো লিউয়েন হুক। সারাদিন বসে বসে কেবল লেন্সই বানাতেন। লেন্সের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওর ভেতর দিয়ে ছোট ছোট জিনিসকে দেখলে বেশ বড়ো দেখায়। ছেলেমানুষের মতো লিউয়েন হুক গাছের পাতা, ঘাস, ছোট ছোট কীটপতঙ্গ, প্রাণীর চামড়া, চুল প্রভৃতিকে লেন্সের সাহায্যে দেখতেন এবং ভারি মজা পেতেন। একবার কী খেয়াল হলো তাঁর! লেন্সকে হাতে ধরে না রেখে তামার পাতের নল তৈরি করে তার মধ্যেই পুরে দিলেন। অনেক সুবিধা হলো এবার। তারপর নলের মধ্যে একটি লেন্সের বদলে দুটি—এইভাবে এগিয়ে চলল তাঁর পরীক্ষা।

অবশেষে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিউয়েন হুক আবিষ্কার করলেন একটি যন্ত্র। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ—যাকে খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায় না তাদের খুব সুন্দরভাবে দেখা গেল যন্ত্রটির মাধ্যমে।

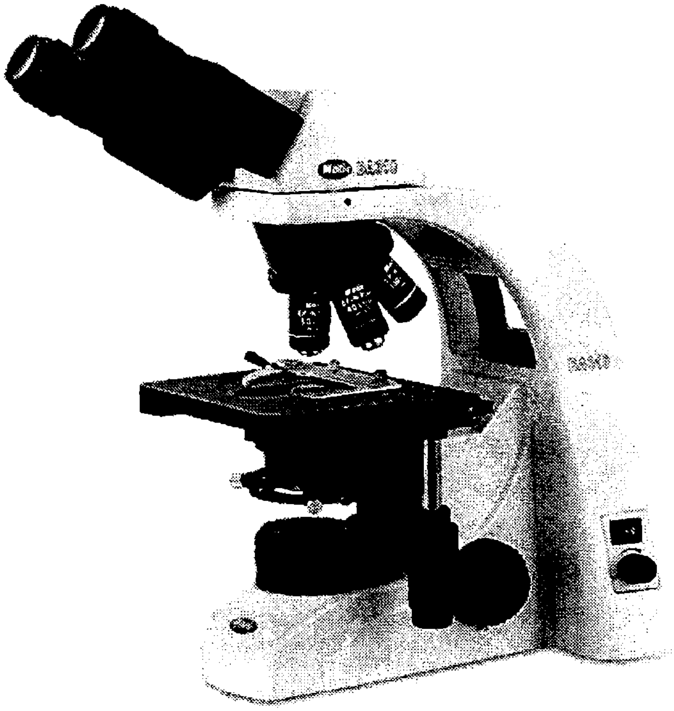

একটি আধুনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র

www.pathagar.com

সেদিন মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। কী মনে করে বাগানের একটা ভাঙা টবে জমে থাকা পচা পানি এনে যন্ত্রের সম্মুখে ধরলেন লিউয়েন হুক। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সেই পচা পানির মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র ধরনের জীব কিলবিল করছে। বেশ কয়েকবার পানি এনে পরীক্ষা করলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, পানিতে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বাস করে। ভালো পানিতে ওদের পরিমাণ কম এবং পচা পানিতে পরিমাণ বেশি। ওরা এত ক্ষুদ্র যে, আমরা খালি চোখে ওদের দেখতে পাই না। কয়েকদিন পরে আরও একটা পরীক্ষা করলেন লিউয়েন হুক। একটি পাত্রে কিছুটা ভালো পানি রেখে তাতে লঙ্কা ভিজিয়ে দিলেন। পাঁচ সাত দিন পরে সেই পানির এক ফোঁটা যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এই পানিতে জীবাণুর পরিমাণ অনেক বেশি।

এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, পানিতে জীবরা আপনা হতেই জন্মায়। খেয়ালি লিউয়েন হুক পরীক্ষাগুলো নিজে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অনেককে ডেকে দেখালেন। অবশেষে তাঁর পরীক্ষার ফলাফলগুলো লিখে পাঠিয়ে দিলেন রয়েল সোসাইটিকে। সোসাইটির কর্মকর্তারা প্রথমটায় পাগল লিউয়েন হুকের পাগলামি ভেবে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা। পরে দু-একজন উৎসাহী সদস্য তাঁর পাগলামি সচক্ষে দেখার জন্য উপস্থিত হলেন দোকানে।

লিউয়েন হুক খুশি হয়ে পরীক্ষাটি দেখালেন তাঁদের। বিস্মিত হলেন সদস্যরা। কিছু লঙ্কা ভেজানো পানি আর লিউয়েন হুকের তৈরি একটা যন্ত্র নিয়ে ফিরে এলেন রয়েল সোসাইটিতে। সোসাইটি বুঝতে পারল, লিউয়েন হুকের মাথায় একটু ছিট থাকলেও এক অত্যাশ্চর্য জিনিসের আবিষ্কর্তা তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম সোসাইটির সদস্য তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হলো। লিউয়েন হুকের নাম এবার ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে। সারাজীবন ধরে লিউয়েন হুক, কেবল গবেষণাই করে গেছেন। সেই গবেষণাগুলি বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যেন এক একটি মণিমুক্তা। তাঁরই পরীক্ষা থেকে মানুষ বুঝতে পারল, এক ধরণের জীব পৃথিবীতে বাস করে—যাদের আমরা খালি চোখে একেবারেই দেখতে পাই না। ঐ অদৃশ্য জীবাণুরা পানিতে, গাছের পাতায়, ভিজে মাটিতে এমনকি মানুষের খাদ্যনালীতে এবং দাঁতের গোড়ায়ও দলে দলে বাস করে।

পরবর্তীকালে লিউয়েন হুকের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জীবাণুতত্ত্ববিদরা বিজ্ঞানে এনেছে যুগান্তর। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন কত রোগজীবাণুদের। সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন ওদের ধ্বংসের উপায়। জেনাল, পাস্তুর, কখ, ফ্লেমিং, রোনাল্ড রস প্রভৃতি মানবদরদী বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে উপকার সাধন করে গেছেন তার মূলে আছে বিজ্ঞানী লিউয়েন হুকের সেই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং অদৃশ্য জীবাণু। তাঁর অবদান কোনোদিনই ভুলবে না বিজ্ঞান। ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৯১ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

রেডিও ও মার্কোনি

রেডিও দেখেনি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা শুনতে পাওয়া যায় ছোট্ট এই যন্ত্র দিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে রেডিও। বিনা তারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের মুখের কথাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রেরণ করার প্রযুক্তির নামই রেডিও। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে টেলিফোন, গ্রামোফোন, রেডিও, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, মোটরগাড়ি ও এরোপ্লেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে রেডিও। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে একটা লোকের কণ্ঠস্বর সারা পৃথিবীর মানুষ একই সাথে শুনতে পারে রেডিওর মাধ্যমে।

রেডিওতে শব্দ প্রেরণ করার জন্যে দুই ধরনের যন্ত্র প্রয়োজন। একটি হচ্ছে প্রেরক যন্ত্র এবং অপরটি গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক যন্ত্র থেকে শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর সেই ছড়িয়ে পড়া শব্দকে একত্রিত করে শ্রবণযোগ্য করার কাজে ব্যবহৃত হয় গ্রাহক যন্ত্র। সুতরাং আমাদের সকলের বাড়িতে যে রেডিও আছে সেটা থেকে শুধু শব্দ বা কথা শোনা যাবে তার মাধ্যমে কোনো শব্দ প্রেরণ করা যাবে না।

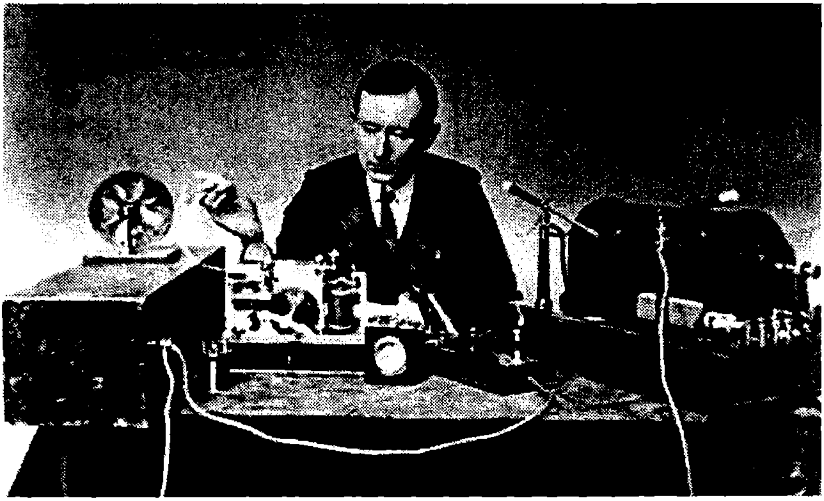

রেডিও আবিষ্কারের গবেষণায় নিমগ্ন মার্কোনি

www.pathagar.com

বেতার প্রযুক্তির প্রকৃত আবিষ্কারক হচ্ছেন ইতালির বোলোনিয়া শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র–মুগলিয়েলমো মার্কোনি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল ইতালিতে। তাঁর পিতা ছিলেন ইতালির এক ধনী ব্যক্তি, মা ছিলেন আইরিস।

মার্কোনির জন্মের দশ বছর আগে ১৮৬৪ সালের দিকে রেডিও আবিষ্কারের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল নামের একজন অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। তিনি বলেছিলেন, বিদ্যুৎ তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে। এই তত্ত্ব থেকে পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন বেতার তরঙ্গের কথা। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর এর উপর ভিত্তি করে ম্যাক্সওয়েল বেতার তরঙ্গের প্রকৃতি ও গুণাগুণ, বেতার তরঙ্গের দ্রুতি ও বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তবে তিনি এটা প্রমাণ করতে পারেন নি বলে তত্ত্বটির প্রতি কেউই তেমন উৎসাহী হয়নি।

পরবর্তীতে তাঁর এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এক জার্মানি পদার্থবিদ হেনরিখ রুডলফ হার্টজ বেতার তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই সম্পর্কে নতুন কিছু তত্ত্বও আবিষ্কার করেন তিনি। মানুষ বুঝতে পারে বেতার তরঙ্গ নামে কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে। চেষ্টা করলে এই তরঙ্গের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেতার সংকেত পাঠানো সম্ভব হবে। গবেষণা চলতে থাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এই সময় মার্কোনির বয়স ছিল মাত্র পনের বছর।

হার্টজের আবিষ্কার ১৭৮৭ ও ১৮৮৯ সালের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা পায়, বহু বিজ্ঞানী বেতার তরঙ্গের উপর গবেষণা করতে থাকেন। এদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের অলিভার লজ, রাশিয়ার আলেকজান্ডার পোপোভ, ভারতবর্ষের জগদীশচন্দ্র

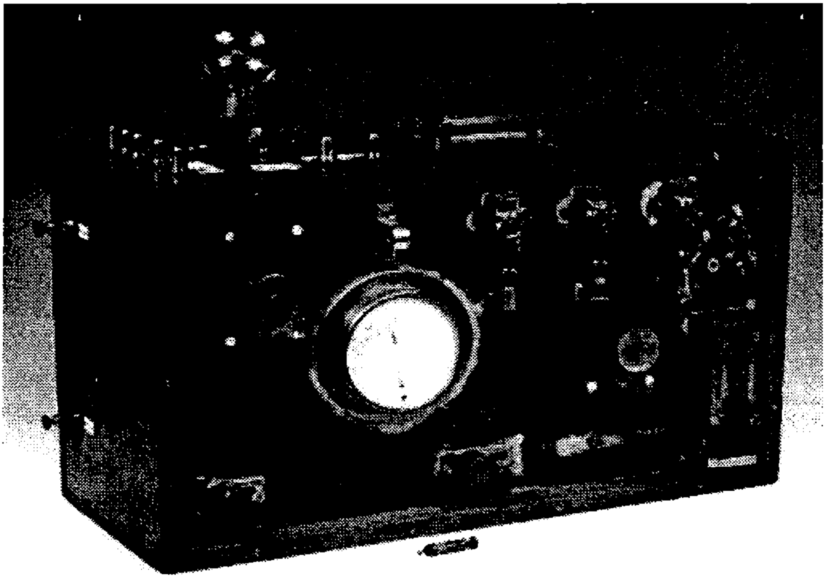

মার্কোনির নিজের আবিষ্কৃত রেডিও

www.pathagar.com

বসু, সত্যেন বসুসহ আরও অনেক বিজ্ঞানী। ইতালির অগাস্টো রিঘি তখন বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। রিঘির ছাত্র ছিলেন তরুণ যুবক মার্কোনি।

হার্টজের আবিষ্কারের সময় মার্কোনির বয়স ছিল পনের বছর। মার্কোনি তাঁর গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেন। তখন থেকেই তিনি এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন ধনী ঘরের ছেলে। তাই বাড়িতে বসেই শিক্ষকদের কাছ থেকে পড়তেন।

১৮৯৫ সালে নিজের বাড়িতে বসে পরীক্ষা চালান। পুরনো সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি বেতার সংকেতের কার্যকরী পদ্ধতি তৈরি করেন। ১৮৯৫ সালের শেষদিকে তিনি বাড়িতে একটি গবেষণাগার তৈরি করে পুরোনো কিছু জিনিসপত্র নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমে তিনি বেতার সংকেত প্রেরক এবং গ্রাহক যন্ত্র তৈরি করলেন। একসময় তিনি তাঁর প্রেরক যন্ত্র থেকে এক মাইল দূরে বেতারবার্তা পাঠাতে সমর্থ হন। ১৮৯৬ সালে এই দূরত্ব দাঁড়ায় দুই মাইলে। পরবর্তী বছরের মধ্যেই তাঁর উদ্ভাবিত প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে দশমাইল দূরের গ্রাহক যন্ত্রে শব্দ প্রেরণ করা সম্ভব হয়। মার্কোনি প্রমাণ করে দেখান, উপযুক্ত প্রেরক যন্ত্র বসানো সম্ভব হলে এর চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে শব্দ তরঙ্গ।

মার্কোনি তার সদ্য আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে এক মাইল দূরে বেতারবার্তা পাঠাতে পারেন। ১৮৯৬ সালে তিনি দুই মাইল দূরত্বে বেতারবার্তা পাঠাতে পারেন, মার্কোনি তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ইতালি সরকারকে জানালেন। কিন্তু ইতালি সরকার তাঁকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিলেন, সে বছরই তিনি ইংল্যান্ডে আসেন তাঁর যন্ত্রের পেটেন্ট করতে। এখানে এসে ডাকঘরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁদের দেখালেন দশ মাইল পর্যন্ত বেতারবার্তা পাঠানো যায়।

গোড়ার দিকে খুব একটা উৎসাহ না দেখালেও– তাঁর এই আবিষ্কারে এবার নড়েচড়ে ওঠে ইতালির সরকার। সেই সাথে ইতালির সরকার মার্কোনির মূল্যটা বুঝতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মার্কোনিকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তিনি একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। এখানে বার মাইল দূরে যুদ্ধ জাহাজে বেতারবার্তা পাঠানো যায়। এরপর থেকে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে, এর সাথে বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারলেন এর গুরুত্ব ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা।

১৮৯৭ সালে মার্কোনি তাঁর আবিষ্কার ইতালির সম্রাট হামবার্ট ও রানী মারগারিটারের সামনে প্রদর্শন করেন। সেই সময় তিন জায়গায় বেতার স্টেশন তৈরি হয়।

১৮৯৯ সালে মার্কোনির আবিষ্কারের সম্পর্কে সাধারণ মানুষও সজাগ হয়ে ওঠে। কারণ সে বছরই একটি স্টীমারের সাথে সংঘর্ষে আলোর সংকেতদাতা ইস্ট গুডইউন নামের একটি জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। এই জাহাজে মার্কোনি উদ্ভাবিত বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র বসানো ছিল। সেই যন্ত্র দিয়ে বেতারবার্তা পাঠানো হল

www.pathagar.com

লাইটহাউসে, সাথে সাথে নৌকা পাঠিয়ে নাবিকদের জীবন বাঁচানো হল। এরপরই জয়জয়কার পড়ে গেল এই বেতার যন্ত্রের। উৎসাহী বিজ্ঞানীরাও ঝুঁকে পড়লেন এই যন্ত্রের আরও নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের দিকে।

এরপর ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ওপারে বেতার যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। তারপর মার্কোনি আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে বেতারবার্তা পাঠানোর কাজে লেগে যান। ১৯০১ সালে ১২ ডিসেম্বর তিনি সফল হন।

১৯০৫ সালে বেতার যন্ত্রের আরও উন্নতি ঘটে। বেতার গ্রাহক যন্ত্রের সমস্ত অসুবিধাগুলো দূর হয়ে যায়।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে বেতারবার্তা পাঠানোর পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়। যার ফলে তখনই আসল রেডিও তৈরি হয়।

১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে মার্কোনি প্রচুর পুরস্কার ও সম্মান পান।

১৯০১ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে 'দি মার্কিন'-এ ভূষিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মার্কোনির মৃত্যুর পর তার আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হতে থাকে।

মার্কোনির সময়ে আবিষ্কৃত বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রগুলো ছিল আকারে বেশ বড় এবং নির্মাণ খরচ ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে এই যন্ত্রের মধ্যে ব্যবহার করা হতো এক বিশেষ ধরনের ভাল্ব। এগুলোর নির্মাণ খরচ ছিল যেমন বেশি, তেমনি এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করাও বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। খুব দ্রুত এগুলো গরম হয়ে যেত। বেশিরভাগ সময় অত্যাধিক গরম হওয়ার ফলে এগুলো নষ্ট হয়ে যেত। এ কারণে এই যন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের উৎসাহ থাকলেও খরচের বিশালত্বের দিক বিবেচনা করে এগুলোর ব্যাপক প্রসারে বাধাগ্রস্ত হতে থাকে।

এই ভাল্বের বিকল্প কিছু খুঁজতে শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। আরও কম খরচে কিভাবে এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করা যায়– সেদিকে দৃষ্টি দিলেন তাঁরা। ১৯৩৭ সালে মার্কোনির মৃত্যুর পর এই গবেষণা আরও বিস্তার লাভ করে।

১৯৫১ সালের দিকে অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়ামকে রেডিও ভাল্ব হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হলে এর নির্মাণ খরচ অনেক কমে আসে। জার্মেনিয়াম হচ্ছে অত্যন্ত বিশুদ্ধ একটি পদার্থ। এই জার্মেনিয়ামকে রেডিও ভাল্বের বিকল্প জিনিস অর্থাৎ ট্রানজিস্টার নাম দেওয়া হলো। ছোট্ট একটুকরো জার্মেনিয়ামের সাহায্যে তৈরি হতে থাকলো ট্রানজিস্টার। পরবর্তীতে সিলিকন আবিষ্কারের পর ট্রানজিস্টার তৈরিতে ব্যবহৃত হতে থাকলো এই ধাতুটি। কম খরচে তৈরি হতে লাগলো রেডিও। শব্দ প্রেরণের ক্ষেত্রে দূরত্ব আর কোনো বাধা হিসেবে থাকল না। পরবর্তীতে এই রেডিওর হাত ধরেই মানুষ কথার পাশাপাশি পাঠাতে সক্ষম হয় ছবি। অর্থাৎ আবিষ্কৃত হয় টেলিভিশন।

www.pathagar.com

টেলিগ্রাফ ও স্যামুয়েল মোর্স

টেলিগ্রাফ নামের এই যন্ত্রটি আমরা অনেকেই দেখেছি। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কিংবা পোস্ট অফিসে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি স্থাপন করা থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবর পৌঁছে দেয়া যায়। শব্দ সংকেতের মাধ্যমে তোমার দেয়া যে কোনো খবর দেশের দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা যায়।

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ম্যাসাচুসেটের চার্লস স্টাউন নামক একটা স্থানে জন্মগ্রহণ করেন স্যামুয়েল মোর্স। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি চিত্রকরের কাজ বেছে নেন। কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইউরোপে এবং বিভিন্ন জাদুঘর থেকে লাভ করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা। প্রায় চার বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে শেষে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে। দেশে ফেরার পথে জাহাজেই আলাপ হয় একজন চিকিৎসকের সাথে। জ্যাকসন নামের ফ্রান্সের অধিবাসী এই ডাক্তার ভদ্রলোক পেশায় ডাক্তার হলেও বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে চলেছেন। চিকিৎসক কিন্তু চিকিৎসা অপেক্ষা গবেষণা করতেই ভালোবাসতেন তিনি।

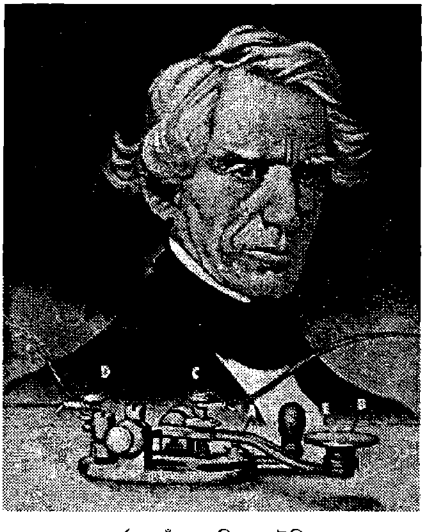

স্যামুয়েল মোর্স ও তাঁর আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফের মডেল

বিশেষ করে চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তাই হাতের কাছে সব সময় মজুত থাকতো চুম্বক ও বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি। চিকিসৎক সেই জাহাজেই মোর্সকে কতকগুলো পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন এবং বিদ্যুৎ ও তারের মাধ্যমে সংকেত প্রেরণের কথা আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া, জ্যাকসন বিভিন্ন লোহার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে সেই তারকে তাৎক্ষণিক চুম্বকে পরিণত করেও দেখালেন মোর্সকে। ফলে মোর্সের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিষয়টা

www.pathagar.com

কৌতূহলী করলো মোর্সকে। তিনি জ্যাকসনের এসব গবেষণা দেখলেন। মোর্স লক্ষ্য করলেন যতক্ষণ ওই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়- শুধু ততক্ষণই উক্ত তারটির মধ্যে চুম্বকত্ব থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়ামাত্র এই চুম্বকত্ব শেষ হয়ে যায়। জ্যাকসনের সাথে আলাপ আলোচনায় মোর্স বুঝতে পারলেন তার যতই বড়ো হোক না কেন, এই চুম্বকত্বের প্রক্রিয়াটি ঘটতে অসুবিধা নেই।

মোর্স ভাবলেন, যদি এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা সম্ভব হয়, তাহলে এই চুম্বকত্বের প্রভাবে কোনো শব্দও নিশ্চয় প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। বিষয়টা যদি সম্ভব হয় তাহলে সেটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে। সেই সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবর প্রেরণ করা খুবই দুরূহ একটা ব্যাপার ছিল। যদি এভাবে শব্দ সংকেতের মাধ্যমে খবর প্রেরণ করা যায় তাহলে সমস্ত পৃথিবী চমকে যাবে। মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

বাড়ি ফিরে বিষয়টা নিয়ে গবেষণায় মত্ত হলেন মোর্স। একের পর এক জিনিসপত্র কিনে ঘরবাড়ি ভরে ফেললেন। সেই সাথে চলতে লাগলো তাঁর কঠিন সাধনা। সে সময় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। শিল্পী স্যামুয়েল মোর্সও তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে ছবি আঁকা কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। আর ছাড়বেনই বা কী করে। এই একটি বিষয় তো তার শরীরের মজ্জায় ঢুকে আছে। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু এত প্রিয় শখটিকেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হলো মোর্সকে। কারণ, শেষদিকে তারের মাধ্যমে সংকেত প্রেরণের জন্য এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, ছবি আঁকতে আর সুযোগ পাননি।

দীর্ঘ চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন স্যামুয়েল মোর্স। জগৎ জানতে পারল, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদশীর্ষ থেকে ৬০০ গজ দূরে তারের মাধ্যমে সংকেত প্রেরণ করতে পেরেছেন তিনি। সবাই বিস্ময়ে হতবাক

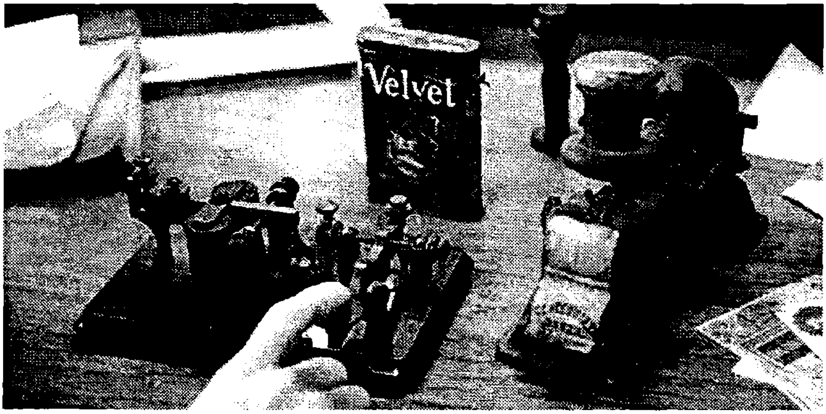

একটি আধুনিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র

www.pathagar.com

হয়ে গেল সেদিন। কিন্তু এই দূরত্ব খুশি করতে পারলো না মোর্সকে। তিনি চাইলেন আরও দূরে সংকেত পাঠাতে।

মোর্সের গবেষণা কিন্তু ওখানে থেমে গেল না। একসময় তিনি আবিষ্কার করলেন 'রিলে' পদ্ধতি। দূরে সংকেত প্রেরণের আর কোনো অসুবিধা রইল না এবার। কিন্তু ততদিনে গবেষণা চালাতে চালাতে মোর্স হয়ে গেছেন পথের ফকির। গবেষণার জিনিসপত্র কিনতে কিনতে তাঁর সঞ্চিত অর্থের সবটা তো গেছেই, সেই সাথে বসতবাড়িটাও যেতে বসেছে। এইসময় সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন মোর্স। তিনি জানালেন সরকার যদি সহযোগিতা করে, তাহলে তিনি তারের মাধ্যমে সংকেত প্রেরণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খবরের আদান-প্রদান করতে পারেন।

তাঁর এই ইচ্ছাকে স্বাগত জানালেন সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে মোর্স লাভ করলেন ৩০ হাজার ডলারের অর্থ সাহায্য। এই টাকা দিয়ে মোর্স ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত তার টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর নিজ হাতে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরণ করলেন শব্দ সংকেত। সমস্ত পৃথিবীবাসী অবাক হয়ে শুনলো, সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছেন মোর্স।

খবরের প্রথম সংকেত প্রেরণ করেছিলেন স্যামুয়েল মোর্স নিজেই।

ওয়াশিংটন থেকে মোর্সের 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্ভব হলো' শব্দ সংকেতটি মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল বাল্টিমোরে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে রচিত হলো এক নতুন অধ্যায়ের। আবিষ্কৃত হলো টেলিগ্রাফ নামের যুগান্তকারী একটি যন্ত্র। মুহূর্তের মধ্যে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে যেতে লাগলো খবর।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্থাপিত হলো যোগাযোগের এক অনন্য মাইলফলক। প্রথম প্রবর্তিত হলো টেলিগ্রাফ। ঐ দিনই মানুষ বধ করল দূরত্বকে।

একজন সাধারণ মাত্রার চিত্রকর পরিচিত হলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে। সেইদিন থেকে স্যামুয়েল মোর্সের নাম ছড়িয়ে পড়লো সারা পৃথিবীতে।

মোর্সের এই পদ্ধতিতে কিন্তু কথা নয়—একধরনের শব্দ সংকেত পাঠানো হয়। এক প্রান্ত থেকে পাঠানো শব্দ সংকেত, অপর প্রান্তের যন্ত্রে শুনে সেই শব্দ সংকেত থেকে সঠিক খবরটি বুঝে নিতে হয়। এই শব্দ সংকেতকে বলা হয় মোর্স কোড।

সময় পেরিয়ে গেছে অনেক। পরিবর্তিত সময়ের সাথে পরিববর্তিত হয়েছে পৃথিবী। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এসেছে টেলিফোন, এসেছে ইন্টারনেট। কিন্তু মোর্সের সেই পদ্ধতি এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বের বড় শহরগুলোর সাথে আমাদের বাংলাদেশেও। তাঁর সেই মোর্স কোডে সংবাদ প্রেরণ এখন অবধি মানুষের কাছে জনপ্রিয় পদ্ধতি।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২ তারিখে এই মহান বিজ্ঞানী ও চিত্রকরের জীবনাবসান ঘটে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগের পর যুগ ধরে মানুষ স্মরণ করবে তাঁকে। স্মরণ করবে তাঁর কালোত্তীর্ণ এই মহা আবিষ্কারকে।

www.pathagar.com

টেলিফোন ও গ্রাহাম বেল

টেলিফোন নামের এই যন্ত্রটি দেখেনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজকাল তো মানুষের হাতে হাতেই চলে এসেছে ফোন, মোবাইল ফোন। এক স্থান থেকে দ্রুততার সাথে অন্য স্থানে সরাসরি কথা প্রেরণের যে মাধ্যম—তাকেই বলা হয় টেলিফোন।

টেলিফোনে প্রথম ধ্বনি ও প্রথম কথা ছিল "Mr. Watson, come here please. I want you." এই কথাগুলো বলেছিলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল নামের একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। বস্তুত তিনিই টেলিফোনের আবিষ্কর্তা। টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নাম বিজ্ঞান জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক। জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ। তিনি জাতিতে স্কটিস ছিলেন। তাঁর বাবা মেলভিল বেলও ছিলেন প্রতিভাবান মানুষ। মেলভিল ফোনেটিক্সে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তিনি এডিনবরা স্কুলে পড়াশুনা করে পরে লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে যান। পরে তাঁর বাবার সঙ্গে কানাডায় যান, সেখানে তিনি মূক ও বধিরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন। পি.এইচ.ডি ডিগ্রি পান জার্মানির উর্জবাগ থেকে।

নিজের আবিষ্কৃত টেলিফোনে কথা বলছেন গ্রাহাম বেল

১৮৭৫ সালের একটি ঘটনা যা গ্রাহাম বেলকে সজাগ করে তোলে। টেলিগ্রাফে অনেকগুলো বার্তা পাঠানো নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সেই সময় সবে মাত্র টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে।

www.pathagar.com

এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শব্দ সংকেতের মাধ্যমে খবর আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু মানুষ শুধু শব্দ সংকেত পাঠিয়েই খুশি নয়, তারা কণ্ঠস্বরকেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে চাইছে।

শিশুবয়স থেকেই এই যন্ত্রটি কৌতূহলী করে তোলে গ্রাহাম বেলকে। তাঁর ভেতরে একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশা জাগে।

এই কাজ করার সাথে বিদ্যুতের সাহায্যে শব্দ পাঠানো নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন, হঠাৎ তারের ভিতর দিয়ে এক স্প্রিংয়ের টংকার ধ্বনি তাকে সচকিত করে তোলে। তখন থেকেই তিনি এই কাজে মেতে ওঠেন। বিজ্ঞানে এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু গ্রাহাম বেলই প্রথম টেলিফোনীয় সঠিক নীতি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বায়ুর যেমন ঘনত্বের তারতম্য হয়; তেমনই শব্দ উৎপাদনে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতার তারতম্য ঘটানো যায় তাহলে টেলিগ্রাফে বার্তা পাঠানোর বদলে শব্দধ্বনি পাঠানো যাবে।

বড় হবার পর টেলিগ্রাফ মেশিনে খবর পাঠানোর সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, বায়ুর যেমন ঘনত্বের তারতম্য হয়; তেমনি শব্দ উৎপাদনে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতার তারতম্য ঘটাতে পারা যায় তাহলে টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠানোর বদলে শব্দধ্বনি পাঠানো সম্ভব হবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। ভাবনাটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন গ্রাহাম বেল। এই কাজে ওয়াটসন নামে তাঁর এক সহকারী বন্ধু সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। সারা ঘর ভরে ফেললেন তাঁরা—লোহা ও তামার পাত, বৈদ্যুতিক ব্যাটারী, বিভিন্ন ধরনের তার ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস দিয়ে। দুই বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম চলতে লাগলো। তারের সঙ্গে তার জোড়া দিয়ে, লোহার পাতকে তাৎক্ষণিক চুম্বকে পরিণত করে কথা প্রেরণের চেষ্টা করতে থাকলেন গ্রাহাম বেল এবং ওয়াটসন। অবশেষে ১৮৭৬ সালের ১০ মার্চ বিকালে সার্থক হলো সেই পরীক্ষার। ওয়াটসন একটি তারের এক প্রান্তে হাতে বানানো একটি যন্ত্রকে কানে লাগিয়ে অন্য কাজ করছিলেন। পাশের ঘরে রয়েছেন গ্রাহাম বেল। হঠাৎ ওয়াটসনের কানে লাগানো যন্ত্রটিতে ভেসে এলো গ্রাহাম বেলের কণ্ঠস্বর, "Mr. Watson, come

একটি আধুনিক টেলিফোন সেট

www.pathagar.com

here please. I want you." তীব্র আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ওয়াটসন। দ্রুত ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। জড়িয়ে ধরলেন আবিষ্কারক বন্ধুটিকে। আবিষ্কৃত হলো টেলিফোন নামের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। একদিন ব্রাজিলের সম্রাট ডন পেদ্রো কানে রিসিভার লাগিয়ে বসে আছেন। অন্য প্রান্ত থেকে গ্রাহাম বেল হ্যামলেট থেকে দুটো বিখ্যাত লাইন টেলিফোনে আবৃত্তি করলেন, "To be or not to be'... সম্রাট চেঁচিয়ে বললেন, My God! It speaks! তারপর প্রদর্শনীতে এই টেলিফোন দেখানো হলো। এই টেলিফোন দেখার ও কথা বলার ভিড় উপচে পড়ল, মানুষের চোখে ও মনে বিস্ময়। এই যন্ত্রে কথা বলা ও শোনা যায়। সেই শুরু। তারপর থেকে দ্রুত উন্নতি ঘটতে লাগলো এই ছোট্ট যন্ত্রটির। মানুষের কণ্ঠস্বরকে মুহূর্তের মধ্যে এক স্থান থেকে দ্রুত অন্য স্থানে প্রেরণ করা সম্ভব হলো। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথা বলার মাধ্যমে দূরত্বকে জয় করল মানুষ। টেলিফোনের প্রকৃত আবিষ্কারক কে—এই নিয়ে সেই সময় তুমুল হৈচৈ শুরু হয়। কারণ একই আবিষ্কারের জন্য কাজ করছেন তিনজন তাতেই এত গোলমাল, যখন আবিষ্কর্তা নিয়ে এত হৈচৈ তখন বেল ও তাঁর সহকর্মী ওয়াটসন দুজনে মিলে টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত। টেলিফোন আবিষ্কর্তা কে এই নিয়ে অনেক মামলাও চলে। শেষে গ্রাহাম বেলই টেলিফোন আবিষ্কারক হিসেবে গণ্য হন।

জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছিলেন গ্রাহাম বেল। তবে তিনি ব্যক্তি-জীবনে সুখী ছিলেন না। নিঃসঙ্গ জীবনে খুব কষ্ট পেতেন, নিজের আবিষ্কৃত টেলিফোনটাকে তিনি একসময় ঘৃণা করতেন। বলতেন, 'এই জানোয়ারটাকে আমি কখনও ব্যবহার করি না।' তাঁর মানসিক যন্ত্রণাই তাঁকে খুব কষ্ট দিত। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট নিজের বাড়িতেই তিনি মারা যান। তাঁর আবিষ্কার টেলিফোন আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেয় বৈজ্ঞানিক গ্রাহাম বেলকে।

www.pathagar.com

ক্যামেরা : দুনিয়া হাতের মুঠোয়

ক্যামেরা দেখেনি এমন লোক আজকাল পাওয়া যাবে না। শুধু দেখাই নয়, অনেকেই হয়তো ক্যামেরার সাহায্যে স্টুডিওতে কিংবা বাড়িতে নিজেদের ছবি নিজেরাই তুলে থাকেন। এই কাজে অনেকে নিজের হাতে ক্যামেরা ব্যবহারও করে। কোনো বস্তুর স্থিরচিত্র চিরস্থায়ীভাবে ধারণ করতে ক্যামেরার বিকল্প আর কিছু নেই। কিন্তু এই ক্যামেরা কিভাবে আবিষ্কার হয়েছিল? ক্যামেরা আবিষ্কার সম্পর্কে একটা গল্প চালু আছে। তাসাদ্দেক হারুন আল বিরুনী নামের এক মিশরীয় সওদাগর তার বিশাল দল নিয়ে সাহারা মরুভূমি পার হচ্ছিলেন। দিনের বেলায় সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেয়া সহজ কথা নয়। প্রচণ্ড গরম বাতাসে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবার উপক্রম হয়। এই কারণে বেলা বাড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে আল বিরুনী একটা মরুদ্যানে বিশ্রাম নেয়ার জন্য লোকজনসহ তাঁবু খাটালেন। সওদাগর যে তাঁবুতে অবস্থান নিলেন সেই তাঁবুটা ছিল বেশ পুরোনো। স্থানে স্থানে বেশ কয়েকটা ছিদ্র। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আল বিরুনী। পড়ন্ত বেলায় ঘুম ভাঙলো তাঁর। ঘুম ভাঙতেই তাঁবুর দেয়ালের দিকে চোখ পড়লো। আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। তাঁবুর দেয়ালে একটি দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন আল বিরুনী। উটের পিঠে আসীন একদল লোক সারিবদ্ধভাবে চলে যাচ্ছে। দৃশ্যটা সাধারণ। তবে আল বিরুনীর চোখে দৃশ্যটা অসাধারণ লাগলো এই জন্যে যে, দৃশ্যটির উল্টো প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন তিনি তাঁবুর দেয়ালে। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। দেখতে পেলেন উটের পিঠে

জার্মান বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ক্যামেরা আবিষ্কারে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। অন্যদিকে ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কার করেন স্টিভেন।

www.pathagar.com

করে একদল আরোহী তাঁর তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আল বিরুনী বুঝতে পারলেন, কোনো না কোনোভাবে উক্ত দৃশ্যটির উল্টো প্রতিবিম্ব পড়েছে তাঁর তাঁবুর দেয়ালে। কিন্তু কারণটা কি? সেটা বুঝতে পারলেন না। বিষয়টা ভাবিয়ে তুললো তাঁকে। দেশে ফিরে আল বিরুনী তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা বিশেষজ্ঞদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আল বিরুনীর মতো একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর কথা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে পারলেন না বিশেষজ্ঞরা। বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন তাঁরা। গবেষণার পরে গভীর আশ্চর্যের সাথে বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করলেন একটি বন্ধ বাক্সের একপাশে ছোট একটি ছিদ্র তৈরি করে কোনো বস্তুর সামনে ধরলে সেই বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি উক্ত ছিদ্র দিয়ে বাক্সের ভেতর প্রবেশ করে এবং বাক্সের বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। ক্যামেরা আবিষ্কারের সূত্রপাত কিন্তু তখনই ঘটে। ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের। এ সময় স্যুলজে নামের এক জার্মান বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন, সিলভার ক্লোরাইড দ্রবণের ওপর সূর্যের আলো পড়লে সেটা কালো হয়ে যায়। ঐ তথ্যটিকে কাজে লাগাতে বদ্ধ পরিকর হলেন জোসেফ নিপসে নামের এক ফরাসী শিল্পী। ছবিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে প্রবলভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন তিনি। এমন একটা রাসায়নিক পদার্থের খোঁজ করছিলেন, যার দ্বারা কাজটা সহজতর হয়ে উঠবে। স্যুলজের আবিষ্কারের পর নিপসে অনেক চিন্তা করে ঐ সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রথমে তিনি একখানা কাগজকে সিলভার ক্লোরাইডে সিক্ত করে ক্যামেরার ভেতরে ঘষা কাঁচের পর্দার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। ছিদ্রটিকেও ইচ্ছামতো খোলা এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ছিদ্রপথে দৃশ্যবস্তু থেকে আলো যখন কাগজের উপর পড়েছিল, তখন গঠিত হয়েছিল একটা সুন্দর স্থায়ী ছবি। কিন্তু ছবিটি হয়েছিল উল্টো। উল্টো হওয়ার কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি নিপসে এবং উল্টো ছবি থেকে প্রকৃত নিখুঁত ছবি পাওয়ার কোনো চেষ্টাও করেননি। বোধ হয় মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করেন আর একটা কৌশল। এবার সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণের পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন বিটুমিন মাখানো একখানি তামার পাত। উক্ত তামার পাতটি ক্যামেরার মধ্যে রেখে প্রখর রোদে এক্সপোজার দিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে রোদ পড়ে সেখানে বিটুমিন শক্ত হয়ে এঁটে যায় আর যেখানে রোদ পড়ে না সেখানে বিটুমিন আগের মতো নরম থাকে। কয়েক ঘণ্টা পরে ল্যাভেন্ডার তেল দিয়ে তিনি তুলে ফেললেন বিটুমিনকে। তারপর সেখানে ঢেলে দিলেন অ্যাসিড। অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে নিপসে লক্ষ্য করলেন, বিটুমিন যেখানে শক্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানে তামার পাতের কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু যেখানে বিটুমিন নরম ছিল সেখানে তামার পাত ক্ষয় হয়ে সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর একটা ছবির ছাঁচ।

www.pathagar.com

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন নিপসে। এবার তিনি উক্ত তামার পাতে সৃষ্ট ছবির ছাঁচে কালি মাখিয়ে ছাপ দিতেই পাওয়া গেল দৃশ্যবস্তুর অবিকল প্রতিচ্ছবি। নিপসে এখানে থেমে গেলেন না। ছবিকে আরো সুন্দরভাবে বন্দী করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে তাঁর সাথে এসে জুটলেন দ্যাগোরে নামে আর একজন খেয়ালি শিল্পী। দুজনে শুরু করলেন অক্লান্ত পরিশ্রম। কিন্তু কিছুদিন পরেই নিপসে হলেন লোকান্তরিত। তখন দ্যাগোরে একা চালালেন গবেষণা। শেষে নিপসের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কৃতকার্য হলেন অনেকখানি। তবে দ্যাগোরের এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়নি। কারণ, এই পদ্ধতিতে কোনো বস্তুর ছবি তুলতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে বসে থাকতে হতো। তাছাড়া একটা প্লেট থেকে একটার বেশি ছবি পাওয়া যেত না।

ট্যালবট নামের এক ইংরেজ বিজ্ঞানী গবেষণা করে বের করলেন কাগজে ছবি তৈরির পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তিনি যে কাগজ ব্যবহার করতেন সেই কাগজকে বিভিন্ন রাসায়নিক উপায়ে তৈরি করে নিতে হতো। প্রথমে লবণ পানিতে ভিজিয়ে নিতেন কাগজটিকে। তারপর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মাখিয়ে ক্যামেরার ভেতর রেখে রোদে এক্সপোজ দিতেন। অবশেষে ছবি তোলা শেষ হয়ে গেলে উক্ত কাগজটিকে লবণ পানিতে ধুয়ে নিতেন। এতে করে একটা স্থায়ী নেগেটিভ পেয়ে যেতেন তিনি। এই নেগেটিভ থেকে একাধিক ছবি তৈরি করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ফটোগ্রাফির জন্ম হয় ট্যালবটের হাতেই। কারণ এই পদ্ধতিতেই পরবর্তীতে আধুনিক ফটোগ্রাফি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছে।

তবে, ট্যালবটের এই পদ্ধতিও জনপ্রিয় হয়নি। কারণ এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এক্সপোজ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ডেভেলপ না করলে ছবি নষ্ট হয়ে যেত। তাছাড়া লবণ পানি দিয়ে ধুয়ে নেবার সময়ও ফটোগ্রাফারকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। পরবর্তীতে ট্যালবটের এই পদ্ধতিকে আরও উন্নততর রূপ প্রদান করেন ম্যাডক্স নামের এক ফটোগ্রাফার। দ্রবীভূত জিলাটিনের সঙ্গে ব্রোমাইড লবণ এবং সিলভার নাইট্রেট মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে কাঁচের প্লেটের ওপর আস্তরণ দিয়ে সেটাকে শুকিয়ে নিয়ে ক্যামেরাতে সেই প্লেট ব্যবহার করেছিলেন। এতে করে আগেকার অসুবিধাগুলো অনেকাংশেই দূর হয়ে গিয়েছিল। এক্সপোজ দেয়ার সাথে সাথেই সেগুলো ডেভেলপ করার দরকার পড়ল না। ফলে ফটোগ্রাফার একসাথে বেশ কয়েকটি প্লেটে এক্সপোজ দিয়ে তারপর সেগুলোকে ডেভেলপ করতে পারতেন।

ক্যামেরায় ছবি ওঠার আসল রহস্য কি? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলে বলতে হয় ক্যামেরা আমাদের চোখেরই একটা অনুকরণ, যেমন আমাদের চোখের তারা হচ্ছে একটা লেন্স। আমরা যখন কোনো কিছুর দিকে তাকাই তখন তা আমরা দেখে থাকি। চোখের মতো ক্যামেরার সামনেও থাকে একটা লেন্স, সেটাই হচ্ছে ক্যামেরার চোখের তারা। ঐ লেন্সের সামনে যা কিছু থাকবে তার ওপরকার আলো ঠিকরে এসে পড়বে লেন্সের ওপর, আর তারই ফলে লেন্সের পিছনের দিকে, ক্যামেরার ভিতরকার একটা পর্দায় সেই দৃশ্যটি অবিকল দেখা যাবে।

www.pathagar.com

অদি যুগের সেই বাক্সের মতো সাদাসিধে বক্স ক্যামেরা এখনও চলছে, কিন্তু নতুন ধরনের ক্যামেরাও আবিষ্কার হয়েছে। বক্স ক্যামেরা ব্যাপারটা খুবই সহজ। এর লেন্স এমনভাবে লাগনো রয়েছে যে, প্রতিচ্ছবিটা সবসময় একই জায়গায় এসে পড়ে। ক্যামেরার সামনের দিকে ছোট্ট একটা অতিরিক্ত লেন্স রয়েছে যা দিয়ে সামনে কি রয়েছে তা সহজেই দেখা যাবে। এই লেন্সকে বলা হয় ভিউ ফাইন্ডার। এরপর ভিউ ক্যামেরা। এই ক্যামেরাগুলি দেখতে অনেকটা হারমোনিয়ামের বেলোর মতো ভাঁজ করা চামড়া বা অনুরূপ কিছু দিয়ে তৈরি। ভাঁজগুলোর জন্য ওটিকে ইচ্ছে মতো টেনে বা চেপে ছোট বড় করা যায়, তার ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে যে প্রতিচ্ছবি আসে তার দূরত্ব ইচ্ছে মতো কমানো-বাড়ানো যায়। ভিউ ক্যামেরার পিছন দিকে থাকে একটা কাঁচ, যার ওপর চোখ রেখে ছবিটা কি রকম উঠবে তা আগে ভাগেই দেখে নেওয়া যায়। এর পর রিফ্লেক্স ক্যামেরা। ভিউ ক্যামেরার সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে। কারণ এখানেও একটা ঘষা কাঁচের ওপর কেমন ছবি উঠবে তা আগেই বুঝতে পারা যায়। তবে এখানে ঘষা কাঁচটা ক্যামেরার পিছন দিকে থাকে না– থাকে উপরের দিকে। ছবি তোলার সময় একটা বোতাম টিপলেই বাঁকানো আয়নার মাথা উপরে উঠে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের সামনের পর্দাটাও সরে যায়। ফলে লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো ঢুকে ফিল্মের উপরে পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে।

একটি আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা

আর এক রকমের ক্যামেরাও আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একে বলে লাইকা মিনিয়েচার ক্যামেরা। এগুলো আকারে খুব ছোট আর একসঙ্গে ক্রমাগত অনেক ছবি তোলা যায়। ৩৫ মিলিমিটার চওড়া ফিল্মের সাহায্যে এই ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়। ক্যামেরা অর্থাৎ ফটোগ্রাফি এখন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এর দান অসামান্য। ক্যামেরার সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স লাগিয়ে অদৃশ্য জীবাণু জগতের ছবি তোলা হচ্ছে। এক্সরে ছবি তুলে শরীরের অদৃশ্য অংশের ছবি দেখে অস্ত্রের চিকিৎসা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আজ টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে দূর প্রান্তের ছবি, সুদূর চাঁদে নামার দৃশ্য, এমনকি চন্দ্র অভিযানের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছেন। ক্যামেরার সঙ্গে দুরবিনের লেন্স লাগিয়ে দূর আকাশের গ্রহ-তারার খোঁজ করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। শুধু তাই নয়, এই যুগের ক্যামেরা শব্দের ছবি তুলছে, ভূমিকম্পের কাঁপুনির ছবি তুলছে, আকাশের ছবি তুলছে। দিন বদলের সাথে সাথে এই ফটোগ্রাফির অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছেন গবেষকরা। স্থির ফটোগ্রাফির পথ ধরেই এগিয়ে এসেছে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের চলমান ক্যামেরা।

www.pathagar.com

টেলিভিশন ও জন লগি বেয়ার্ড

টেলিভিশন হচ্ছে সেই যন্ত্র, যার সাহায্যে বিনা তারে অর্থাৎ কোনো সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত শব্দের সাথে সাথে ছবিও দেখা যায়। এখানেও রেডিওর মতো দুই ধরনের যন্ত্রের প্রয়োজন। একটি হচ্ছে প্রেরক যন্ত্র এবং অপরটি গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত শব্দ এবং কথাগুলো একত্রিভূত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। টেলিভিশনের সাহায্যে শব্দ আর ছবি সহযোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা দেখতে পাওয়া যায়। ডিস এ্যান্টেনার কল্যাণে বিশ্বের দূর-দূরান্তের অনুষ্ঠান দেখাটাও হয়ে উঠেছে এখন সহজসাধ্য। শুধু সুইচ টিপলেই ঢুকে পড়া যায় বিনোদনের এক সীমাহীন জগতে। টেলিভিশনের বাংলা নাম দূরদর্শন। ভিশন মানে দেখা। পরে আরও সহজ নাম হয়েছে 'টেলিভিশন'। আমরা যখন সামনা সামনি কোনো কিছু দেখি তখন বিভিন্ন সময়ের আলো এবং তার ছায়া আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু সেই দৃশ্য যদি আমরা সামনে না দেখে অনেক দূরে দৃশ্যটির নেপথ্যে থেকে দেখতে চাই তাহলে সেটাকে কোনো মাধ্যমে না পাঠিয়ে একটি উপায় খুঁজে বের করতে হয়। আলো এবং ছায়ার মাত্রার উপর নির্ভর করে কোনো দৃশ্যের এই বিন্দুগুলিকেই রেডিও বা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পাঠানো হতে থাকে। টেলিভিশনে সাধারণত প্রতি সেকেন্ডে ২০ লক্ষেরও বেশি মৌল বিন্দু প্রতিফলিত বৈদ্যুতিক উপায়ে পাঠানো হয়। তারপর রিসিভার যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে আবার সাধারণ প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়। টেলিভিশনকে এক কথায় রেডিও আর সিনেমা বলা যেতে পারে। টেলিভিশন সেট

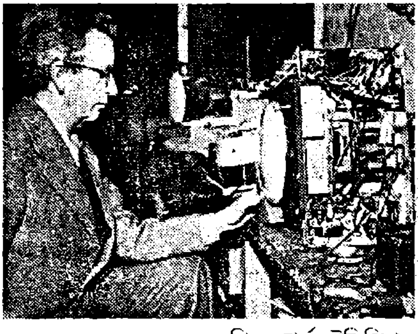

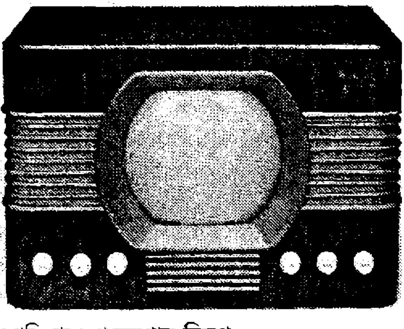

জন লগি বেয়ার্ড টেলিভিশন আবিষ্কারে গবেষণায় নিমগ্ন

www.pathagar.com

দেখতে অনেকটা বড় বেতার যন্ত্র বা রেডিও সেটের মতোই। টেলিভিশনের স্ক্রিনের গায়ে গায়ক বা বক্তার ছবিও ভেসে ওঠে। সেই কারণেই রেডিওর তুলনায় টেলিভিশন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই যন্ত্রের আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেই বিজ্ঞানের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন যে ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন জন লগি বেয়ার্ড। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের পরপরই মানুষের চাহিদা বেড়ে যায়। বিনা তারে শব্দ তো প্রেরণ করা সম্ভব হলো। এবার কৌতূহলী মানুষ চাইল বিনা তারের সাহায্যে এমন কোনো প্রযুক্তি কি উদ্ভাবন করা যায় না, যার সাহায্যে শুধু কথা নয়—সেই কথা বলা মানুষের ছবিও দেখা যাবে? টেলিভিশনের আবিষ্কার কিন্তু খুব বেশিদিন আগের নয়। টেলিভিশন বলতে আমরা যা বুঝি তার আবিষ্কার হয়েছিল ১৯২৬ সালে। এর আবিষ্কর্তা হলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী জন লগি বেয়ার্ড। গোড়ার দিকে লগি বেয়ার্ড মাত্র কয়েকগজ দূরে শব্দ এবং সচল ছবি পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মূল গবেষণাগারের বাইরে কয়েকজন দর্শকের সামনে একটি পর্দায় পাঠিয়েছিলেন সচল ছবি। সেই প্রথম মানুষ টেলিভিশন সম্পর্কে সম্যকভাবে কিছু উপলব্ধি করতে পারল। বেয়ার্ড মূল যে যন্ত্রটির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, সেটার নাম ফটো ইলেকট্রিক সেল। ছবি বা দৃশ্যের কোনো বিন্দুতে আলো ফেলে সে আলোকে ফটো ইলেকট্রিক সেলে রুপান্তির করেন তিনি।

এই বিন্দুর আলো তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ আবার ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে একত্রিভূত অবস্থায় পর্দায় ফুটে ওঠে। ছবিকে সচল করার জন্য যে কোনো ছবিকে সরাসরি না চালিয়ে সেটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন বেয়ার্ড। সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট গোলাকার ধাতব চাকতি ব্যবহার করে উক্ত ভাগ করা ছবির ওপর আলো ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। চাকতিটিকে দ্রুত ঘোরাবার ব্যবস্থাও ছিল। উজ্জ্বল আলোর জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন আর্কল্যাম্প। আর্কল্যাম্প থেকে আগত আলোকরশ্মিকে লেন্সের সাহায্যে ঘূর্ণায়মান গোলাকার চাকতির সাহায্যে ছবির ওপর ফেলেছিলেন তিনি। চাকতিটিকে দ্রুত ঘুরিয়ে পুরো ছবিটিকেই একসাথে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষয়টি বুঝতে হলে, একটি ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানের দিকে লক্ষ্য করলেই বিষয়টা ভালো বোঝা যাবে। ফ্যানটি যখন বন্ধ থাকে তখন তার পাখার কারণে সিলিংয়ের কিছুটা জায়গা দৃষ্টির আড়ালে থাকে। কিন্তু ফ্যানটি যখন দ্রুত ঘুরতে থাকে তখন পাখার পেছনের পুরো সিলিংটি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। এটা ঘটে শুধুমাত্র দ্রুতগতিতে ফ্যানটির পাখা ঘুরছে বলে। বেয়ার্ডের এই গোলাকার চাকতি এমনভাবে ঘোরানো হতো, যেন এ থেকে প্রতিসরিত আলোকরশ্মি পুরোপুরি ছবির ওপর পড়ে।

www.pathagar.com

এই চাকতির সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলোর আকারও ছিল বিভিন্ন। যার ফলে এর মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশের পরিমাণের ক্ষেত্রেও ছিল ভিন্নতা। যেসব ছিদ্র দিয়ে কম আলো প্রবেশ করতো সেইসব আলো ফটো ইলেকট্রিক সেলে সৃষ্টি করত কম শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ। আর যেসব ছিদ্র দিয়ে বেশি আলো প্রবেশ করত সেই আলোকরশ্মি সৃষ্টি করতো বেশি শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ। এই বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎস্পন্দনে সৃষ্টি হতো এক মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এই তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়া হতো আকাশে অর্থাৎ ইথারে। ইথার থেকে এই মিশ্রতরঙ্গ গ্রহণ করার কাজটি করতো গ্রাহক যন্ত্র। এই যন্ত্রে ইথার থেকে মিশ্র তরঙ্গ নিমিষের মধ্যে ধরে রাখবার ক্ষমতা ছিল। এর প্রধান কাজ ছিল, মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ থেকে কম ও বেশি শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহকে পৃথক করে নেওয়া। এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল একধরনের বায়ুশূন্য টিউবের। এই টিউবের ভেতর দিয়ে মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করার ফলেই গ্রাহক যন্ত্র সেগুলো থেকে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গকে আলাদা করতে সমর্থ হতো। প্রেরকযন্ত্রের মতো গ্রাহকযন্ত্রেও সুক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট গোলাকার চাকতি ছিল। উক্ত বায়ুশূন্য টিউবের মধ্যে দিয়ে মিশ্র বিদ্যুৎতরঙ্গ আলোকরশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে এই চাকতির উপর আছড়ে পড়তো। পরবর্তীতে সেই আলোকরশ্মি আগের মতো পর্যায়ক্রমিকভাবে পর্দায় উপস্থাপিত হতো। এর ফলেই প্রেরকযন্ত্র থেকে প্রেরিত শব্দ আর ছবি একত্রিভূত হয়ে গ্রাহকযন্ত্রের পর্দায় দেখা যেতো। বেয়ার্ডের এই আবিষ্কারের ফলে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। পরবর্তীতে প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন হলো। বেয়ার্ডের এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে এক মার্কিন বিজ্ঞানী জোরকিন প্রেরক যন্ত্রে ফটো ইলেকট্রিক সেলের বদলে ব্যবহার করেন ইকনোস্কোপ নামের যন্ত্র। পাশাপাশি গ্রাহকযন্ত্রে বায়ুশূন্য টিউবের পরিবর্তে ব্যবহার করেন কিনোস্কোপ নামের যন্ত্র। বর্তমানে যেসব উন্নত প্রযুক্তির টেলিভিশন দেখা যায়, সেগুলো এই জোরকিনের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে সেই সময় আবিষ্কৃত গ্রাহক যন্ত্রে প্রদর্শিত ছবির স্বচ্ছতা এবং সচলতা খুব একটা ভালো ছিল না। কোনো সচল ছবি এখনকার মতো এত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হতো না। প্রেরকযন্ত্র থেকে প্রচারিত ছবি আর শব্দের সুস্পষ্ট রূপ দেখা যেত না। পরবর্তীতে টেলিভিশনের উন্নতি সম্ভব হয় অর্থিকন, ইমেজ অর্থিকন, টিভিকন ইত্যাদি নামের যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। এই সময় থেকে গ্রাহক যন্ত্রে ব্যবহার শুরু হয় পিকচার টিউব নামের একটি অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশের। বর্তমানে প্রত্যেকটি টেলিভিশনের ভেতরেই ছবিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এই পিকচার টিউব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রেরকযন্ত্র থেকে প্রেরিত শব্দ এবং ছবি প্রেরণের ক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দ এবং ছবি গ্রাহকযন্ত্রে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে রিলে ব্যবস্থা। এই কাজে বিভিন্ন রিলে স্টেশন তো বটেই—এমনকি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যও নেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

টেলিভিশনে যেভাবে ছবি ফুটে ওঠে

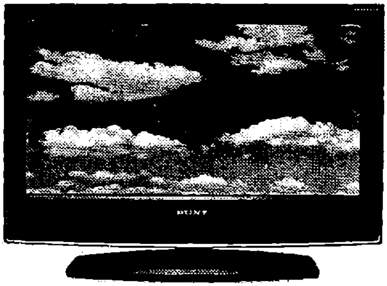

একটি আধুনিক ফ্লাট টেলিভিশন

প্রেরণকেন্দ্র থেকে প্রেরিত ছবি আর শব্দের বৈদ্যুতিক সংকেত টিভির এ্যান্টেনা প্রথমে গ্রহণ করে। তারপর সেই সিগন্যাল আলাদা আলাদাভাবে টিভির পিকচার টিউবের ভেতর বসানো ইলেকট্রন বিমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই ইলেকট্রন বিম উক্ত গৃহীত ছবিকে অসংখ্য ডট বা বিন্দুতে রূপান্তরিত করে। এই ডট বা বিন্দুর নাম ট্রায়োড ডট। এই ট্রায়োড ডটে রূপান্তরিত হওয়ার পর পর্দায় যাবার আগে ছবিকে একটি ছিদ্রযুক্ত স্তর পার হতে হয়। এই স্তরটিকে বলা হয় স্যাডো মাস্ক। এই স্যাডো মাস্কের ভেতর দিয়েই বিশি-ষ্ট বিন্দুগুলো একত্রিভূত হয়। এইসময় এই ট্রায়োড ডট রূপান্তরিত হয় ফসফর ডটে। টিভি পর্দার ভেতরের দিকে লেপে দেয়া থাকে একধরনের প্রলেপ। এই প্রলেপের উপর প্রতিফলিত হয় ফসফর ডট। টেলিভিশনে প্রতি সেকেন্ডে ২০ লক্ষেরও বেশি মৌল বিন্দু প্রতিফলিত বৈদ্যুতিক উপায়ে টেলিভিশন সেন্টার থেকে পাঠানো হয়। ক্যামেরার সাহায্যে যে ছবি টেলিভিশন প্রেরক কেন্দ্রে তোলা হয় বা প্রচারিত হয়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফসফর ডট সেই ছবিই আমাদের সামনে রাখা টেলিভিশনের পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। টেলিভিশনে রঙিন ছবি দেখার জন্য প্রেরক এবং গ্রাহকযন্ত্র উভয়েরই রঙিন ছবি প্রেরণ এবং গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

তবে ছবি প্রেরণের সময় প্রেরক যন্ত্র থেকে রঙিন ছবি প্রেরিত হলেই সাদাকালো এবং রঙিন ছবি একই নিয়ম মেনে প্রেরণ করা হয়। এই রঙিন ছবি প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন হয় রঙিন টেলিভিশনের। টেলিভিশন রঙিন হলে নিশ্চয় রঙিন ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। আর সাদাকালো হলে সেই ছবি দেখতে পাওয়া যাবে সাদাকালো অবস্থায়।

www.pathagar.com

বৈদ্যুতিক বাতি ও টমাস আলফা এডিসন

যে আলো আজ আমাদের ঘর আলোকিত করছে, অন্ধকারকে সরিয়ে দিচ্ছে অনায়াসে—সেই বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়েছিল টমাস আলভা এডিসন নামের এক বিজ্ঞানীর কঠোর সাধনায়। এডিসনের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইতালির শিল্পনগরী মিলানে। তাঁর পিতা ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভুত। এডিসনের পিতার আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ছেলেবেলার দিনগুলো আনন্দেই কেটেছিল। সাত বছর বয়েসে এডিসনের পিতা মিশিগানের অন্তর্গত পোর্ট হ্যারান নামে একটা শহরে নতুন করে বসবাস শুরু করেন। এখানে এসেই স্কুলে ভর্তি হলেন এডিসন। ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব মেধাবী ছিলেন তিনি। শেষ হলো এডিসনের তিন মাসের স্কুল জীবন। পরবর্তীকালে আর কোনোদিন স্কুলে যাননি এডিসন। মায়ের কাছেই শুরু হলো তাঁর পড়াশুনা।

ছেলেবেলা থেকেই এডিসনের ঝোঁক ছিল পারিপার্শ্বিক যা কিছু আছে, যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। একবার তিনি মুরগির

টমাস আলফা এডিসন ও তাঁর আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি

www.pathagar.com

মতো ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করতে পারেন কিনা দেখবার জন্য ঘরের কোণে ডিম সাজিয়ে বসে পড়লেন। কয়েক বছর পর কিশোর এডিসন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটা ছোট ল্যাবরেটরি তৈরি করে ফেললেন তাঁর বাড়ির নিচের তলার একটা ঘরে। অল্প কিছুদিন যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন হাতে-কলমে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি আর নানান জিনিসপত্রের। ততদিনে বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। স্থির করলেন তিনি কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করবেন। তেরো বছরের ছেলে চাকরি করবে! বাবা-মা দুজনেই তো অবাক। কিন্তু এডিসন জেদ ধরলেন, অগত্যা মত দিতে হলো এডিসনের বাবা-মাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর খবরের কাগজ ফেরি করার কাজ পাওয়া গেল। আরো বেশি কিছু আয় করার জন্য এডিসন খবরের কাগজের সাথে চকলেট বাদামও রেখে দিতেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন। এই সময় এডিসন সংবাদ পেলেন একটি ছোট ছাপাখানা কম দামে বিক্রি হচ্ছে। সামান্য যে অর্থ জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি কিনে ফেলেন, এবার নিজেই একটি পত্রিকা বের করে ফেললেন। সংবাদ জোগাড় করা, সম্পাদনা করা, ছাপানো, বিক্রি করা, সমস্ত কাজ তিনি একাই করতেন। অল্পদিনেই তাঁর কাগজের বিক্রির সংখ্যা বেড়ে গেল। এক বছরের মধ্যে তাঁর লাভ হলো একশো ডলার। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। শুরু হলো তাঁর নতুন এক জীবন। স্টাফোর্ড জংশনে রাত্রিবেলায় ট্রেন ছাড়ার সিগনাল দেওয়ার কাজ পেলেন। রাত জেগে কাজ করতে হত আর দিনের বেলায় সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে নিজের গবেষণার কাজ করতেন। তিনি একটি ঘড়ি তৈরি করলেন যেটি আপনা থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে সিগনাল দিত। এক জায়গায় বেশিদিন কাজ করার অভ্যাস ছিল না এডিসনের। বোস্টন শহরে টেলিগ্রাফ অফিসে অপারেটরের কাজ নিলেন। এডিসন যেখানে চাকরি করতেন সেই অফিস জুড়ে ইঁদুরের ভীষণ উৎপাত। মাঝে মাঝেই তারা যন্ত্রপাতির মধ্যে ঢুকে পড়ে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাত। এডিসন একটি যন্ত্র বার করলেন যাতে সহজেই ইঁদুরের ধ্বংস করা যায়। এছাড়াও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আরো কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করলেন।

১৮৬৯ সালে যখন তিনি বোস্টনে চাকরি করছেন তখন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে ভোট গণনা করা যায়। এই যন্ত্রের পেটেন্ট পাবার জন্য তিনি আবেদন করলেন। এই যন্ত্রের গুণাগুণ বিবেচনা করে উদ্ভাবক হিসেবে তাঁকে পেটেন্ট দেওয়া হলো। এই পেটেন্ট এডিসনের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। বোস্টন শহর আর ভালো লাগছিল না। সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে এলেন নিউ ইয়র্কে। হাতে একটি পয়সা নেই, দুদিন প্রায় কিছু খাওয়া হয়নি। এমন সময় আলাপ হলো এক অল্পবয়সী টেলিগ্রাফ অপারেটরের সাথে। সে এডিসনকে এক ডলার ধার দিয়ে গোল্ড ইনডিকেটর কোম্পানির (Gold indicator Company) ব্যাটারি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। দু'দিন সেখানে কেটে গেল। তৃতীয় দিন এডিসনের নজর পড়ল অফিসের ট্রানসমিটারটি খারাপ হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

অফিসের ম্যানেজার, কর্মচারীরা বহু চেষ্টা করেও যন্ত্রটি ঠিক করতে পারছে না। ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রানসমিটারটি ঠিক করে দিলেন। ম্যানেজার খুশি হয়ে তখনই তাঁকে কারখানার ফোরম্যান হিসেবে চাকরি দিলেন। তাঁর মাইনে ছিল ৩০০ ডলার। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় ম্যানেজার পদে উন্নীত হলেন। ম্যানেজার হিসেবে যে অর্থ পেতেন এডিসন তা দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় নানান যন্ত্রপাতি কিনে গবেষণার কাজ করতেন। গোল্ড ইন্ডিকেটর কোম্পানি টেলিগ্রাফের জন্য এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করত যার ফিতের উপর সংবাদ লেখা হত। এডিসনের মনে হত বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে আরো উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার। চাকরিতে ইস্তফা দিলেন এডিসন। কয়েক মাস নিরলস পরিশ্রমের পর উদ্ভাবন করলেন এক নতুন যন্ত্র যা আগের চেয়ে অনেক উন্নত আর উৎপাদন ব্যয়ও কম।

এডিসন যন্ত্রটি নিয়ে গেলেন গোল্ড ইন্ডিকেটর কোম্পানির মালিকের কাছে। যন্ত্রটি পরীক্ষা করে খুশি হলেন কোম্পানির মালিক। এডিসনকে জিজ্ঞাসা করলেন কত দামে সে যন্ত্রটি বিক্রি করতে চান? এডিসন দ্বিধাগ্রস্থভাবে বললেন, যদি পাঁচ হাজার ডলার দাম বেশি বলে মনে হয় আবার তিন হাজার খুব কম হয় তবে কোম্পানি স্থির করুক তারা কি দামে যন্ত্রটি কিনবে। কোম্পানির মালিক এডিসনকে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে বললেন, আশা করি আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন এডিসন। এই অর্থ এডিসনের জীবনে এক পরিবর্তন নিয়ে এল। এতদিন তিনি অন্যের অধীনস্ত হয়ে কাজ করতেন। সেখানে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ছিল না। নিউ জার্সিতে তৈরি হলো কারখানা। দিবারাত্রি সেখানে কাজ চলত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন এডিসন, বাকি সমস্ত সময় কর্মচারীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর কারখানাটি ছিল একটি গবেষণাগার। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রায় একশোটির বেশি নতুন জিনিস উদ্ভাবন করে তার পেটেন্ট নিলেন। এই সমস্ত পেটেন্ট বিক্রি করে হাতে অর্থও আসতে আরম্ভ করল। ইতোমধ্যে বিবাহ করেছেন এডিসন। তাঁর স্ত্রীর নাম মেরি স্টিলওয়েল। মেরি এডিসনের কারখানায় তাঁর সহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। মেরি ছিলেন যেমন দক্ষ তেমনি বুদ্ধিমতী। ১৮৮৪ সালে মেরির মৃত্যু হয়। তখন তিনি তিন সন্তানের জননী। মেরির মৃত্যুর দুবছর পর এডিসন মিনা মিলারকে বিবাহ করেন, কিন্তু জীবনের এই পর্বে তাঁর সৃজনীশক্তি আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। নিজের কারখানায় কাজ করতে করতে, পুনরায় আকৃষ্ট হলেন টেলিগ্রাফির দিকে। অল্পদিনেই তৈরি হল ডুপ্লেক্স টেলিগ্রাফ পদ্ধতি। এর সাহায্যে দুটি বার্তা একই সাথে একই তারের মধ্যে দিয়ে দুই দিকে পাঠানো সম্ভব। এরপরে একই সময়ে একই তারের মধ্যে দিয়ে একাধিক বার্তা প্রেরণ করতে সক্ষম হলেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শুধু যে অসাধারণ উন্নতি করতে সক্ষম হলেন তাই নয়, খরচও কয়েকগুণ হ্রাস পেল।

www.pathagar.com

১৮৭৬ সালে এডিসন তাঁর নতুন কারখানা স্থাপন করলেন মেনলো পার্কে। এখানে একদিকে তাঁর গবেষণাগার অন্যদিকে কারখানা। এই মেনলো পার্কেই এডিসনের প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার, টেলিফোন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন গ্রাহাম বেল কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এডিসনকে অনুরোধ করা হলো টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার জন্য। এডিসন কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি করলেন কার্বন ট্রান্সমিটার। এতে গ্রাহকদের প্রতিটি কথা স্পষ্ট আর পরিষ্কারভাবে শোনা গেল। এডিসনের খ্যাতি সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৭৭ সালে বছর শেষ হয়ে এসেছে। একদিন এডিসন তাঁর এক কর্মচারীকে একটি স্কেচ দেখে মডেল তৈরি করতে বললেন, কর্মচারীটি ফোরম্যানের উপর দায়িত্ব দিলেন। ফোরম্যান কিছুক্ষণ স্কেচটি নাড়াচাড়া করে বলল, এ মডেল তৈরি করা অসম্ভব। এবার নিজেই কাজে হাত দিলেন এডিসন। তিনি মেশিনটি তৈরি করে তার গায়ে ফয়েলের একটি মোড়ক জড়িয়ে দিলেন, তারপর হ্যান্ডেলটা ধরে নাড়াতে নাড়াতে একটা নলের সামনে মুখ রেখে একটা ছড়া বললেন, 'মেরির একটা ভেড়া আছে...' বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের মাথাতে খেলে গেল এই চিন্তা। তিনি ভাবলেন, যেসব তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে, বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য সেগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার যেসব তারের রোধ বেশি, বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে সেই তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে সেটা আরো বেশি উত্তপ্ত হয়। এডিসন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হলেন যে, পরিবাহী তার যত চিকন হবে, বিদ্যুতের রোধ ততই বেশি হবে। শুরু হলো এডিসনের গবেষণা। সরু তার বা ফিলামেন্ট তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন তিনি। কাজ করতে গিয়ে বুঝলেন, সব পরিবাহীর সরু তার এই কাজের জন্য উপযোগী নয়। বেশিরভাগ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা মাত্র সেগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এডিসন নতুন করে কাজ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি এমন একটি ধাতুর সন্ধান করছিলেন যার মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত করলে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে। তিনি বিভিন্ন রকমের ধাতু নিয়ে ১৬০০ রকমের পরীক্ষা করলেন। গবেষণা করতে করতে একসময় কার্বনের মিশ্রণ দিয়ে একধরনের তার বা ফিলামেন্ট তৈরি করলেন এডিসন। তারপর এই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দিলেন। বিদ্যুৎ প্রবাহ চলামাত্র তারটি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠলো। তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এডিসন ভাবলেন, বিষয়টার সাথে বাতাসের কোনো সম্পর্ক আছে নিশ্চয়। এডিসন নিজেই লিখেছেন সেই চমকপ্রদ কাহিনী: 'ফিলামেন্ট তৈরি হওয়ার পর তাকে কাঁচ তৈরির কারখানায় নিয়ে যেতে হবে। ব্যাচিলরের (এডিসনের এক সহকর্মী) হাতে কার্বনের ফিলামেন্ট। পেছনে আমি। এমনভাবে দু'জন চলেছি মনে হচ্ছে যেন কোনো মহামূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে যাচ্ছি। কাঁচের কারখানায় সবেমাত্র পা দিয়েছি, সম্ভবত অতি সতর্কতার জন্যেই হাত থেকে ফিলামেন্টটি মাটিতে পড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল। হতাশ মনে ল্যাবরেটরিতে

www.pathagar.com

ফিরে গেলাম। নতুন ফিলামেন্ট তৈরি করে আবার চললাম কাঁচ কারখানায়। কপাল মন্দ, এবার এক স্বর্ণকারের হাতের স্ক্রু ড্রাইভার পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। আবার ফিরে গেলাম। রাত হবার আগেই নতুন একটা কার্বন নিয়ে এসে বাল্বের মধ্যে ঢোকালাম। বাল্বের মুখ বন্ধ করা হলো, তারপর কারেন্ট দেয়া হলো। মুহূর্তে চোখের সামনে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক বাতি।' প্রথম বৈদ্যুতিক বাতিটি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা জ্বলেছিল। দিনটা ছিল ২১ অক্টোবর ১৮৭৯ সাল, এডিসন সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর সৃষ্ট আলো একদিন পৃথিবীর সমস্ত গৃহের অন্ধকার দূর করবে। প্রথমে তিনি শুধুমাত্র বাল্বের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। এরপর প্রয়োজন দেখা দিল সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। এডিসন নতুন এক ধরনের ডায়নামো তৈরি করলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার জেনারেটর থেকে শুরু করে ল্যাম্প তৈরি করা, শেষপর্যন্ত তাকে জ্বালানোর উপায় বের করা সমস্তই তাঁর উদ্ভাবন। দু'দিন দু'রাত ধরে একটানা বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে রেখেছিলেন এডিসন। এই পুরো সময়টা ধরে উক্ত কার্বন ফিলামেন্ট আলো বিকিরণ করেছিল। ১৮৮০ সালে এই আবিষ্কারকে সর্বসমক্ষে প্রকাশের জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এডিসন। কিন্তু উক্ত প্রদর্শনীতে জোসেফ উইলসন সোয়ান নামের একজন বিজ্ঞানীও প্রদর্শন করেন তাঁর আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি। তাঁর বাতিতেও ব্যবহার করা হয়েছিল কার্বন ফিলামেন্ট। সুতরাং এই বাতি আবিষ্কারের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না প্রকৃতপক্ষে কে বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কর্তা। তবে উক্ত প্রদর্শনীতে উভয় আবিষ্কারক মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদের উভয়ের আবিষ্কার যখন একই সময়ে এবং একই বিষয়ে তখন তাঁদের আবিষ্কৃত উক্ত বাতির নাম হবে উভয়ের নাম মিলিয়ে। উভয়ের মিলিত সিদ্ধান্তে বাতিটির নাম রাখা হয় এডি-সোয়ান ল্যাম্প। পরবর্তীতে এই বাতির প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে টিউব লাইট, সোডিয়াম লাইট ইত্যাদি। যাই হোক, ফিরে আসি আগের কথায়। যখন নিউ ইয়র্কে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র গড়ে উঠল, এডিসন ছিলেন একাধারে তার সুপারিনটেন্ডেন্ট, তার ফোরম্যান, এমনকি তার দিনমজুর।

১৮৭৪ সালে তিনি উদ্ভাবন করলেন 'কিনেটোগ্রাফ' যা গতিশীল ছবি তোলার জন্য প্রথম ক্যামেরা। যখন আমেরিকাতে বাণিজ্যিকভাবে ছায়াছবি নির্মাণের কাজ চলছিল তখন সিনেমার প্রয়োজনীয় সবকিছুই উদ্ভাবন করে ফেলেছেন এডিসন। প্রথম অবস্থায় সিনেমা ছিল নির্বাক। ১৯২২ সালে এডিসন আবিষ্কার করলেন কিনেটোফোন যা সংযুক্ত করা হয় সিনেমার ক্যামেরার সাথে। এরই ফলে তৈরি হলো সবাক চিত্র। প্রতিভায় বিশ্বাস করতেন না এডিসন, বলতেন পরিশ্রমই হচ্ছে প্রতিভার মূল কথা। এই মহান কর্মবীর মানুষটির মৃত্যু হয় ১৯৩১ সালের ১৮ অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পর নিউইয়র্ক পত্রিকায় লেখা হয়, 'মানুষের ইতিহাসে এডিসনের মাথার দাম সবচেয়ে বেশি। কারণ এমন সৃজনীশক্তি অন্য কোনো মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি।'

www.pathagar.com

ডিনামাইট ও আলফ্রেড নোবেল

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী, নাম তাঁর হেনরি ব্রেকনন্ট। একদিন কী খেয়াল হলো তাঁর, রসায়নাগারে এটা-ওটা মিশিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ চিনির সঙ্গে নাইট্রিক এ্যাসিড মিশিয়ে ফেললেন। সেটি ছিল ইংরেজি ১৮৩২ সাল। ব্রেকনন্ট আপন মনে অনেকটা অজান্তেই আবিষ্কার করলেন একটি বিস্ফোরক পদার্থ।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'আস্কানি' ও 'সোব্রেরো' নামে দুজন বিজ্ঞানী বিস্ফোরক পদার্থের খোঁজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে একদিন মিশিয়ে ফেললেন চিনি ও গি-সারিনের সঙ্গে নাইট্রিক এ্যাসিড। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে ঘটলো জোর বিস্ফোরণ। চমকে উঠলেন তাঁরা। এই বিস্ফোরণ পূর্বের সমস্ত বিস্ফোরণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল। গি-সারিন এবং নাইট্রিক এ্যাসিড থেকে জন্ম নিল বলে বিস্ফোরকটির নাম হলো নাইট্রোগি-সারিন। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই ভয়াবহ বিস্ফোরককে করায়ত্ত করল মানুষ। এগিয়ে এলেন সুইজারল্যান্ডের সুপ্রসিদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাইট্রোগি-সারিনকে নিরাপদে ব্যবহার করা। দীর্ঘদিন ধরে উপায় খুঁজছিলেন তিনি। শেষে তাঁর সাধনা বাস্তবে রূপায়িত হলো।

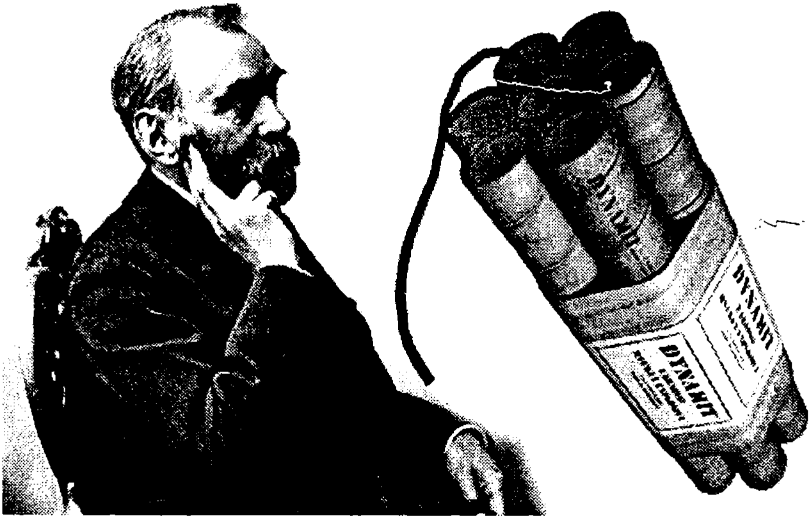

আলফ্রেড নোবেল ও তাঁর আবিষ্কৃত ডিনামাইট

www.pathagar.com

আবিষ্কৃত হলো আসল ডিনামাইট। সেই অর্থে ডিনামাইটের আসল আবিষ্কর্তা হিসেবে আলফ্রেড বার্নাড নোবেলের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়।

আলফ্রেড বার্নাড নোবেল অবশ্য আরেকটি পরিচয়ে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। সেটা হলো—বিশ্বে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ'-এর কথা সবাই জানে। যিনি এই পুরস্কারটির প্রবর্তন করেছেন, তিনি স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল। বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাই তিনি চিরস্মরণীয়। আলফ্রেড নোবেল ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর স্টক্‌হম শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন প্রসিদ্ধ টর্পেডো ও মাইন নির্মাতা। তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গে চাকরি করতেন। পুত্রও তাঁরই মতো কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে নয়, এই কারণে পুত্রকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে নোবেল রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং গৃহশিক্ষকদের চেষ্টায় ও পিতার আগ্রহে অতি অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নোবেলকে কোনোদিন কোনো স্কুল কিংবা কলেজে ভর্তি করা হয়নি। কেবলমাত্র গৃহশিক্ষকগণই তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে "নাইট্রোগি-সারিন" নামক বিস্ফোরক পদার্থটি। ওকে নিরাপদে ব্যবহারের উপায় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী মহলে পড়ে গেছে দারুণ সাড়া। জিনি-এর উৎসাহে নোবেল ঐ নাইট্রোগি-সারিনকে নিয়েই আরম্ভ করলেন গবেষণা। পরীক্ষা করতে করতে একদিন টের পেলেন নোবেল 'কাইজেলগার' নামে একরকমের সচ্ছিদ্র মাটি নাইট্রোগি-সারিনকে শোষণ করতে পারে। নোবেল তখন কাইজেলগার দিয়ে নাইট্রোগি-সারিনকে শোষণ করালেন। সামান্য আঘাতে নাইট্রোগি-সারিন বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষমতা হারালো।

তারপর স্যার নোবেল নাইট্রোগি-সারিন যুক্ত কাইজেলগার দিয়ে তৈরি করলেন এক বিস্ফোরক। এর মধ্যে নাইট্রোগি-সারিনের ক্ষমতা পুরোপুরি অটুট থাকল অথচ ওকে নিরাপদে ব্যবহারও করা গেল। এভাবে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে কাইজেলগার নামক এক ধরনের সচ্ছিদ্র মাটির দ্বারা নাইট্রোগি-সারিনকে শোষিত করিয়ে আবিষ্কার করলেন সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশল। পরে আরও গবেষণা করে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দেই আবিষ্কার করেন নিরাপদ ডিনামাইট। স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন ডিনামাইটকে নিয়ে। আবিষ্কার করেছিলেন নানা ধরনের ডিনামাইট। নোবেল কিন্তু কাইজেল গার ডিনামাইট প্রস্তুত করে ক্ষান্ত হলেন না। নাইট্রোগি-সারিনকে আরও নিরাপদে ব্যবহার করা যায় কিনা, সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, ভালো শোষক হলেই নাইট্রোগি-সারিনের নিরাপত্তা

www.pathagar.com

বেড়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভালো শোষক খুঁজতে। তাঁর খোঁজাখুজি ব্যর্থ হলো না। একদিন তিনি পেয়ে গেলেন সোরাকে। দেখলেন তিনি, কাইজেলগারের চেয়ে সোরা উত্তম শোষক। তার উপর সোরা উত্তম জারকও বটে। সোরাতে থাকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। বিস্ফোরণ ঘটলে তার সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে বিস্ফোরণের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

নোবেল এবার তৈরি করতে লাগলেন নানা ধরনের ডিনামাইট। নাইট্রোগি-সারিনের মাত্রা বাড়িয়ে বা কমিয়ে উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন এবং নিম্ন শক্তিসম্পন্ন উভয় প্রকার ডিনামাইট তৈরি হলো মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। পরবর্তীকালে ওই ডিনামাইট তৈরি থেকেই উপার্জন করেছিলেন প্রচুর অর্থ। বিশাল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থের একটা বড় অংশ তিনি দান করে গেছেন মানব কল্যাণে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর প্যারিস শহরে একটি উইল রচনা করেন। সেই উইল অনুসারে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য, বিশ্বের সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য এবং বিশ্বশান্তি—এই পাঁচটির প্রত্যেকটির জন্য একটা মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হয়। নোবেলের উইল অনুযায়ী ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে আসছে। পুরস্কারদাতার নামানুসারে পুরস্কারটির নাম হয়েছে "নোবেল পুরস্কার"। পুরস্কারসমূহ এর টাকা নোবেল গঠিত তহবিলের সুদ থেকেই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র একটি সংস্থা থেকে সবগুলি পুরস্কার প্রদান করা হয় না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দুটি প্রদান করে সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমি, চিকিৎসাবিদ্যার পুরস্কার প্রদান করে স্টক্‌হমের কারোলিন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে স্টক্‌হম সাহিত্য একাডেমি এবং বিশ্বশান্তি বিষয়ক পুরস্কারটি প্রদান করা হয় নরওয়েজিয়ান স্টরটিং কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির দ্বারা।

নোবেল পুরস্কারের মতো মোটা অঙ্কের পুরস্কার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এই পুরস্কারটি দাতার নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোনো জাতির মানুষ লাভ করতে পারে। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রদান করা হয়েছিল এই পুরস্কার। যদিও নির্বাচন করা হয়েছিল তার পূর্ববর্তী বছরে। যাঁরা প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন জার্মানির রন্টজেন (পদার্থবিদ্যা), হল্যান্ডের ভান্ট হফ (রসায়ন), জার্মানির ফন বেরিং (চিকিৎসা বিদ্যা), ফ্রান্সের সুলি প্রুদোম (সাহিত্য) এবং সুইজারল্যান্ডের ডুনান্ট ও ফ্রান্সের পাসি (শান্তি)।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবদ্দশায় নোবেল পুরস্কার কাউকে প্রদান করা হয়নি। বিজ্ঞানের রাজ্যে 'আলফ্রেড বার্নাড নোবেল' চিরকালই অমর হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

অ্যাটম বোমা : বিজ্ঞানের অভিশাপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইহুদিদের প্রতি হিটলারের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ইউরোপ ভূখণ্ডের বেশ কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানীকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশ গোপনে আমেরিকায় পলায়ন করেন এবং আমেরিকাও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে।

দেশত্যাগী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন আইনস্টাইন, লিজে মাইটনার, অটো ফ্রিস, এনরিকো ফার্মি, নীলস বোর, জিলার্ড টেলার প্রভৃতি পরমাণু বিজ্ঞানের দিক্‌পাল গবেষকরা।

সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট। তিনি আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীর কাছে শুনলেন, জার্মানি পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি ভয়ঙ্কর এক মারণাস্ত্র নির্মাণে তৎপর হয়ে উঠেছে।

তখনই তিনি দেশি ও বিদেশি বিজ্ঞানীদের নির্দেশ দিলেন তাঁরাও যেন মারণাস্ত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও ওপেনহাইমার

www.pathagar.com

শুরু হলো বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা। তাঁরা ভেবে দেখলেন, পরমাণু বোমা তৈরি একক বিজ্ঞানীর সাধ্যের বাইরে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁর গভীর জ্ঞান আছে একমাত্র তাঁকেই দেওয়া যেতে পারে দূরূহ কর্মের ভার। কিন্তু কে আছেন এমন চৌকস বিজ্ঞানী! অনেক খুঁজে তাঁরা ঠিক করলেন, এই কর্মকাণ্ডের নেতা হওয়ার যোগ্যতা আমেরিকায় মাত্র একজন বিজ্ঞানীরই আছে, তিনি হচ্ছেন রবার্ট ওপেনহাইমার। বিজ্ঞানীরা সমবেতভাবে রুজভেল্টের কাছে তাঁরই নাম প্রস্তাব করলেন এবং রুজভেল্ট দ্বিরুক্তি না করেই ওপেনহাইমারকে নেতা মনোনীত করলেন। ওপেনহাইমারকে সাহায্য করার জন্যেও নিযুক্ত হলেন স্বদেশের ও বিদেশের বহু নাম করা বিজ্ঞানী। সরকারও প্রথম কিস্তিতে অর্থ মঞ্জুর করলেন দুই শত কোটি ডলার। আর এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রায় ৭৫ হাজারের মতো লোক। ওপেনহাইমার শুরু করে দিলেন অমানুষিক পরিশ্রম। দৈনিক দুই তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতেন না। খাওয়া-দাওয়ার কথাও মনে হতো না তাঁর। কেবল গবেষণা আর গবেষণা। এক প্রচণ্ড পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। এত রোগা হয়ে গেলেন যে, গায়ের কোট ও প্যান্ট ঢিলা হয়ে গেল। তবুও হাল ছাড়লেন না তিনি। ওপেনহাইমার একদিন বুঝতে পারলেন, এই কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে হলে আরও চাই লোক, আরও অর্থ এবং আরও গবেষণাগার। সরকার তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে সমর্থন করল এবং নানা জায়গায় গোপন কারখানা স্থাপিত হলো। লোকও নিযুক্ত হলো আরও কয়েক হাজার। অতঃপর শিকাগো ও ওকরিজে স্থাপিত হলো পরমাণু বিভাজনের গবেষণা। এই কাজ শুরু হলো ইউরেনিয়ামকে নিয়ে।

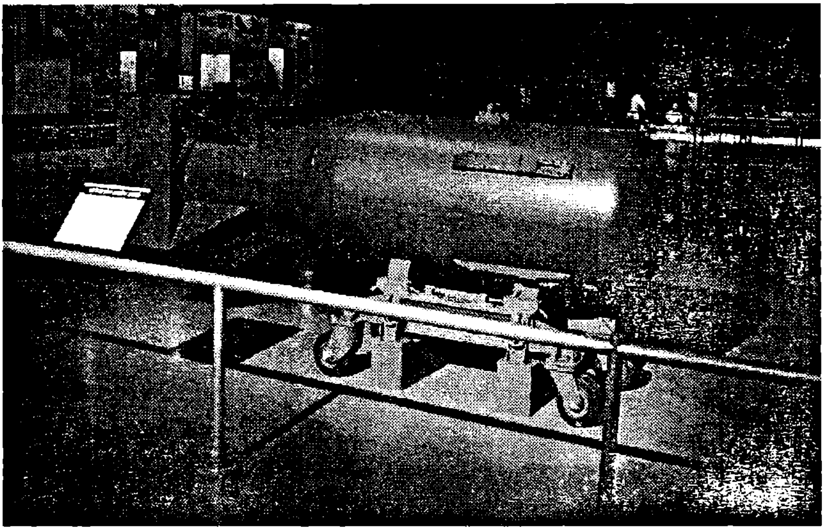

লিটলম্যান নামের ভয়ঙ্কর সেই এ্যাটম বোমা

www.pathagar.com

পরে প্লুটোনিয়ামকে নিয়েও চললো গবেষণা। অবশেষে বহু বিজ্ঞানীর সমবেত প্রচেষ্টা, প্রায় এক লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয়ে একদিন ওপেনহাইমার সন্ধান পেলেন পরমাণুর বিধ্বংসী শক্তির। ঠিক করলেন, জনবিরল লস আলমাসের কাছে একটি পাহাড়ের ওপর বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার শক্তি পরীক্ষা করবেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ জুলাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ওই দিন ওপেনহাইমারসহ অন্য বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালেন। কিন্তু একী! বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সবাই। তাঁরা যা কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সহস্র সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর এই বোমা। এত শক্তিধর যে হবে, তা তাঁরা কল্পনায় স্থান দিতে পারেননি। এবার বেঁকে বসলেন ওপেনহাইমারসহ অন্য বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মনে হলো, একি করছেন তাঁরা! মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে কী ভীষণ সর্বনাশ ডেকে আনলেন! ওপেনহাইমার বিলম্ব না করে সরকারের কাছে দাবি জানালেন, এ বোমাকে ব্যবহার করা চলবে না। নীলস বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও সমর্থন জানালেন ওপেনহাইমারকে। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক কর্ণপাত করলেন না তাঁদের কথায়। ওপেনহাইমার এবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। লিখিতভাবে সরকারের কাছে কতকগুলো দাবি উপস্থাপিত করলেন। সেই দাবিগুলির মধ্যে একটি ছিল পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে অবিলম্বে জানাতে হবে এই মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা এবং এর প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহারবিধি। মার্কিন সরকার অসন্তুষ্ট হলেন ওপেনহাইমারের প্রতি। তাঁকে পুলিশী হেফাজতে রেখে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নামক দুটি জনবহুল শহরের ওপর। বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পরমাণু বোমার সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে এবার মার্কিনসহ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়করাও শিউরে উঠলেন।

ওপেনহাইমার পুলিশী হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন অন্য বিজ্ঞানীরা। তাঁরা অনুরোধ জানালেন, ধ্বংসাত্মক কাজে পরমাণুকে নিয়োগ না করে যেন মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরাও সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

তখন বাধ্য হয়ে মার্কিন সরকার ওপেনহাইমারের কয়েকটা দাবি মেনে নেয়। তবে তাঁর সব দাবিকে মানা হয়নি।

www.pathagar.com

বাষ্প শক্তি ও রেলগাড়ি

জেমস ওয়াট নামের এক বৈজ্ঞানিক মানুষকে ধারণা দিলেন বাষ্পের একটা আলাদা শক্তি আছে। তিনি বিশ্ববাসীকে জানালেন বাষ্পের শক্তিকে ব্যবহার করে যানবাহন চালানো সম্ভব।

ফ্রান্সের নিকোলাস কুনো নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় এই চিন্তাটা ভর করে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন তৈরি করে, সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ি চালানোর নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি। একসময় তিন চাকার একটি গাড়ি তৈরি করে, পেছনে বয়লার রেখে বয়লারের বাষ্পকে ব্যবহার করলেন গাড়িটির চাকা ঘোরানোর কাজে। কুনোর এই প্রচেষ্টা সফল হলো। কুনোর এই বাষ্পচালিত গাড়িটি ঘণ্টায় চার মাইল গতিবেগ নিয়ে চলতে শুরু করলো। প্রথম দিকে গভীর রাতে কুনো একাই গাড়িটি চালাতেন। পরবর্তীতে তাঁর কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুদের নিয়ে চেপে বসলেন গাড়িতে। ভালোই চলছিল গাড়ি। বন্ধুরাও প্রবল উৎসাহে বসে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গাড়িটি চলতে চলতে ধাক্কা খেল রাস্তার ধারে একটা দেওয়ালের গায়ে। এই ধাক্কায় গাড়ির বয়লার ফেটে গিয়ে, কুনোসহ যাত্রীরা ছিটকে পড়লেন। তবে গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছিল বলে আরোহীরা কেউই

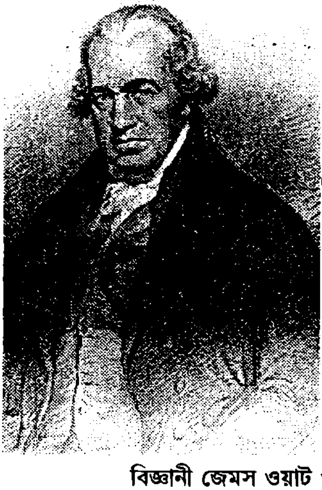

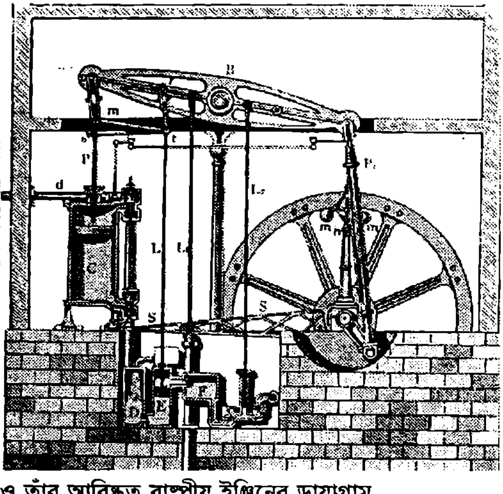

বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট ও তাঁর আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ডায়াগ্রাম

www.pathagar.com

তেমন আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এই সংবাদে আতংকিত হয়ে উঠেছিল সাধারণ জনগণ। সকলের একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল গাড়ি একটা বিপজ্জনক জিনিস। এই গাড়িতে চড়ে যাত্রা করলে অঘটন তো ঘটবেই—এমনকি প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

কুনো পরবর্তীতে আর গাড়িটা চালাতে পারেন নি। জনগণের রোষের কারণে সরকার উক্ত গাড়িটি চালানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এমনকি কুনোর গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে তাকে জেলে পর্যন্ত পুরে দেয়া হয়েছিল। এই ঘটনার পর ইঞ্জিন চালিত গাড়ির প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ একেবারেই ছিল না। তবে গবেষণা থেমে থাকেনি। লন্ডনের অধিবাসী উইলিয়াম মার্ডক নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার কুনোর এই ধারণাকে সম্বল করে একটি উন্নতমানের গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলেন। এটাকেই রেল ইঞ্জিনের প্রাথমিক রূপ বলা যায়।

ইঞ্জিন তৈরি হওয়ার পর সেটা গাড়িতে জুড়ে মার্ডক বুঝতে পারলেন—জিনিসটা বেশ উন্নত হয়েছে। এই গাড়ি থেকে দুর্ঘটনার ভয় অনেক কম। কিন্তু এই গাড়ি চালাবেন কোথায় তিনি? কারণ, কুনোর সেই দুর্ঘটনার পর গাড়ির প্রতি জনসাধারণের শুধু ভীতি ছিল তা নয়—বরং একটা তীব্র আক্রোশও ছিল। কিন্তু এত পরিশ্রমের পর একটা জিনিস তৈরি করেছেন তিনি। সেটা পরীক্ষা করে দেখাও তো দরকার।

একদিন গভীর রাতে যখন সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—সেইসময় গাড়িটি বাইরে বের করলেন মার্ডক। কিন্তু মার্ডক বুঝতে পারেননি, তাঁর তৈরি ইঞ্জিন এতো বিকট ধরনের শব্দ করবে। ইঞ্জিনের সেই প্রচণ্ড শব্দে স্থানীয় লোকজন ঘুম থেকে আঁতকে জেগে উঠেছিল। তীব্র আতংকে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল অনেকে। তাদের চোখে পড়েছিল বিরাট দৈত্যের মতো একটা কিছু লকলকে আগুন আর বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা বিকট আকারের জন্তু প্রবল আক্রোশে ফুঁসছে। জিনিসটা দেখামাত্রই শিউরে উঠেছিল সবাই। এমনকি গির্জার পাদ্রী সাহেবরাও মনে করেছিলেন, অসৎ মানুষদের শায়েস্তা করার জন্য ঈশ্বর এই বস্তুটিকে প্রেরণ করেছেন। এই বস্তুটি শয়তানেরই পাঠানো। এই শয়তান মশাল জ্বেলে অতিক্রম করছে পৃথিবী। এখন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে এই শহরের সাথে সাথে পুরো পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রাণপণে ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করলেন পাদ্রী সাহেব। বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর মার্ডক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু সে রাতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর শয়তানের কথা লোকের মুখে মুখে রটে গেলো। কেউ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি- কাজটা মার্ডকের। সবার ধারণা শয়তান এসেছে পৃথিবীতে। আর সেই শয়তান লুকিয়ে আছে এই শহরেই। একসময় কৌতূহলী মানুষ বুঝতে পারলো, কাজটা শয়তানের নয়- মার্ডকের। গির্জার পাদ্রী সাহেব ধরে নিলেন, মার্ডকের

www.pathagar.com

দেহেই শয়তান ভর করেছে এবং ঐ মার্ডককে শয়তানমুক্ত করতে না পারলে দেশের তো বটেই পুরো পৃথিবীর সর্বনাশ হবে। কুনোর মতো মার্ডকের পরিণাম না হলেও, এরপরে তিনি গাড়ি আর চালাতে পারলেন না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনার পর থেকে বুঝে ফেললেন এভাবে ইঞ্জিন তৈরি করলে, সেই ইঞ্জিনের সাহায্যে মানুষ তো বটেই– এমনকি প্রচুর মালপত্র অত্যন্ত সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার। চেষ্টা করলে, অনেক শক্তিশালী করে তৈরি করা যায় ইঞ্জিনকে। জনগণ এবং সরকারের আপত্তি ও ভুল ধারণাকে তুচ্ছ করেও উৎসাহী গবেষকরা অত্যন্ত গোপনে চালিয়ে যেতে থাকলেন গবেষণা। কেটে গেল আরও কিছুদিন। একসময় ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত পাতা হলো রেললাইন। উদ্দেশ্য ছিল, লোহার পাতের উপর দিয়ে ঠেলাগাড়িতে করে একটু সহজে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

সেখানকার কয়লার খনিতে কাজ করতেন এক ইঞ্জিনিয়র। নাম তাঁর জর্জ স্টিফেনসন। তিনি কর্তৃপকে জানালেন, যদি আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন, তাহলে ইঞ্জিনের সাহায্যে তিনি অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কয়লা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন। শত শত মানুষ এবং শত শত ঠেলাগাড়ির দরকার হবে না। কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন, স্টিফেনসন যদি কৃতকার্য হন, তাহলে প্রচুর খরচ বেঁচে যাবে এবং লাভের অঙ্কটা দাঁড়াবে বিশগুণ। তাই নির্দেশ দিলেন স্টিফেনসনকে এবং কিছু অর্থও বরাদ্দ করলেন।

স্টিফেনসন একসময় গাড়ি তৈরি করে ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন। দিনও স্থির হয়ে গেল। আর কথাটাও রটে গেল চারদিকে। শত শত টন কয়লা বোঝাই করে ছুটবে গাড়ি– সে আবার কেমন গাড়ি! দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শক ছুটে এলো সেই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য গাড়িটিকে দেখার জন্য। পথের দুপাশে জনতার ভিড় উপচে পড়লো।

যথাসময়ে স্টিফেনসন গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চললো গাড়ি। পথের জনতাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে সামনে লাল পতাকা হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এক অশ্বারোহী।

কিন্তু গাড়ির গতি ধীরে ধীরে এমন বেড়ে উঠলো যে, ঘোড়া তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। বাধ্য হয়ে অশ্বারোহীকে পথ ছেড়ে দিতে হলো। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল গাড়ি।

www.pathagar.com

পাখির মতো আকাশে ওড়ার বাসনা ও উড়োজাহাজ

পাখির মতো আকাশে ওড়ার বাসনা মানুষের চিরদিনের। এই আকাঙ্ক্ষার কারণে মানুষের ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা শুধু স্থল ও জলপথেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মানুষ উর্ধ্বগামী হয়ে আকাশপথেও ধাবিত হতে চেয়েছে। পাখির মতো আকাশে ওড়ার বাসনা মানুষকে আকাশযান তৈরিতে উৎসাহিত করল। প্রথমে মানুষ নিজের দেহে নকল পাখা লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল। ১৭৮৩ সালে এই ধরনের একটি কাপড়ের তৈরি বেলুন আকাশে ওড়ান জ্যাক্স এতিয়েস মঁগল্‌ফিয়ে ও যোসেফ মিশেল মঁগল্‌ফিয়ে। এদের বেলুনের নিচে একটি ছোট খাঁচা জুড়ে তাতে একটি ছাগল, একটি মোরগ ও একটি ভেড়া রাখা হয়। বেলুনের খাঁচায় চড়ে সর্বপ্রথম পিলাৎরে দ্য রোজিয়ের এবং মারকুইস দ্য অরলান্দেস মানুষ হিসাবে আকাশে ঘুরে এলেন ১৭৮৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। হাইড্রোজেন গ্যাস হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা প্রমাণিত হওয়ার পর বেলুনে গরম হাওয়ার বদলে হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যবহার শুরু হলো। বেলুনের আকৃতিতে এলো পরিবর্তন এবং একে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন দিকে চালনাও করা হত। পটলাকৃতি, চোঙাকৃতি বেলুন তৈরি হল। এইভাবে আকাশে নানা বেলুন চলতে লাগল। এগুলিকে বলা হত এয়ার-শিপ। বেলুনকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হত। ১৮১৭ সালে বেলুনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা হলো। এরপর ক্রমশ বেলুন আরো মজবুত, দ্রুতগামী এবং সেই সাথে অনেক সময় ধরে আকাশে টিকে থাকতে এবং অধিক উঁচুতে উঠতে সক্ষম হলো। এরপর ১৮২১ সালে বেলুনে প্রথম ব্যবহার করা হয় বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। হেনরি জিফার্ড এই বেলুনটি চালান। ক্রমশ বেলুনের সঙ্গে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ-চালিত ও গ্যাসোলিন যন্ত্র। বেলুনের গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জার্মানির কাউন্ট ফার্ডিনান্ড ফন জেপেলিন তৈরি করেন একটি বৃহদাকৃতি বেলুন। ভেতরে যাত্রী বসবার ও যন্ত্রপাতি বয়ে নেবার জন্যে আলাদা প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রস্তুতকর্তার নাম অনুযায়ী এটির নাম দেওয়া হয় জেপেলিন। এই ধরনের জেপেলিন প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। ৭৭৬ ফুট লম্বা জার্মানির গ্রোফ জেপেলিন ১৮২৯ সালে ২১ দিনে পৃথিবীর চারপাশে আকাশপথে একবার চক্কর দিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এরপর আকাশযানের ক্ষেত্রে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

জার্মানির অটো মিলিয়েনথাল ১৮৯৯ সালে বায়ুর চেয়ে ভারি একটি আকাশযান তৈরি করেন। এতে দুটো পাখা লাগান ছিল, মাঝে খাঁচার মতো যন্ত্রে বসে চালক

www.pathagar.com

পা দিয়ে যন্ত্রটি চালাত। এই রকম একটি যান চালাতে গিয়ে মিলিয়েনথাল শেষ পর্যন্ত মারা যান। এরপর পাখনাযুক্ত এই ধরনের আকাশযান তৈরি হতে থাকে, এগুলিকে গ-াইডার বলা হয়।

আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (অরভিল রাইট, উইলবার রাইট) আরো উন্নত গ-াইডার তৈরিতে মনোযোগী হলেন। তাঁরা আকাশে ওড়ার পথে প্রথমদিকে খুব কমই সফল হলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ সালে ১৭ ডিসেম্বর তাঁদের তৈরি এরোপ্লেন পরপর চারবার আকাশে ওঠে। শেষবার উইলবার একনাগাড়ে ৮২৩ ফুট উড়ে যান। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এরপর আরো উন্নত আকাশযান তৈরি করতে সক্ষম হন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আকাশযানের নাম দেওয়া হয় এরোপ্লেন। মূলত তখন থেকেই আবিষ্কার হয় সত্যিকারের এরোপ্লেন, বাংলায় যাকে বলা হয় উড়োজাহাজ।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা প্রদেশে উইলবার রাইটের জন্ম ১৮৬৭ সালে এবং অরভিল রাইটের জন্ম ১৮৭১ সালে। খুব ছেলেবেলা থেকেই দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল যেমন কল্পনাশক্তি তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। শৈশবকালের পড়াশুনা শেষ করে দুই ভাই হাতেকলমে কাজ করার জন্য ছোট কারখানা তৈরি করলেন। প্রথমে তাঁরা কিছুদিন বাজারে প্রচলিত ছাপার যন্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করলেন, যাতে তার ব্যবহার আরো সহজ সরল ও উন্নত হয়। এরপর বাইসাইকেলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেন। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা সফল হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রবর্তিত আধুনিক যন্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।

উড়োজাহাজ আবিষ্কারের জন্য দুই ভাইয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৮৯৬ সাল থেকে। যেটা আগেই বলা হয়েছে। একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়র অটো লিলিয়েনথাল

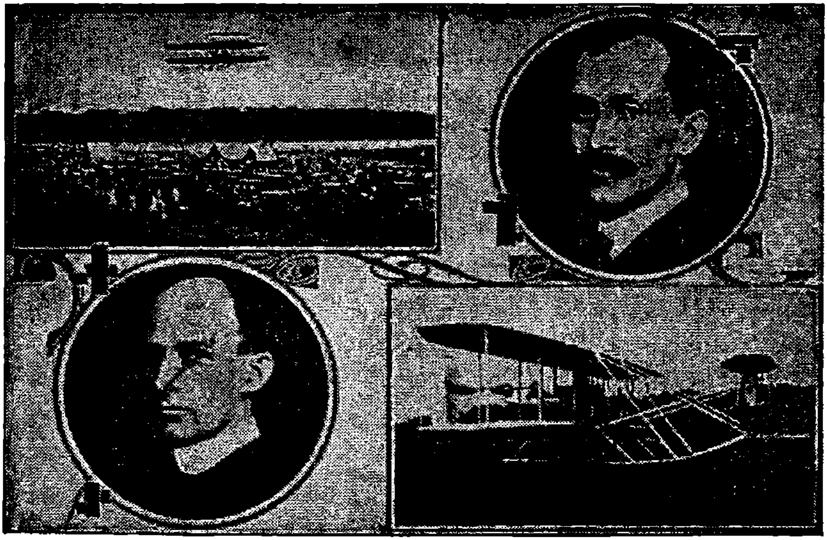

উইলভার রাইট ও অরভিল রাইট এবং তাদের আবিষ্কৃত প্রাথমিক পর্যায়ের উড়োজাহাজের

www.pathagar.com

কয়েক বছর যাবৎ উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। লিলিয়েনথালের তৈরি যান আকাশে উড়লেও তাতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হত। ১৮৯৯ সালে লিলিয়েনথালের আকস্মিক মৃত্যুতে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

লিলিয়েনথালের তৈরি উড়ন্ত যানের নক্সা ভালোভাবে পরীক্ষা করে রাইট ভাইয়েরা দেখলেন একদিকে যেমন তা সম্পূর্ণ অন্যদিকে তেমনি নানা ভুলক্রটিতে ভরা। এভাবে হবে না। আরও উন্নত কিছু চাই। শুরু হলো তাঁদের পরিশ্রম ও গবেষণা। এ যাবৎকাল উড়ন্ত যান সম্বন্ধে যত কাজকর্ম হয়েছে তার সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করলেন দুই ভাই। প্রতিটি নক্সা বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশে-ষণ করে তাঁরা বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র বাতাসের গতিবেগে একে বেশি দূর চালনা করা যাবে না, প্রয়োজন শক্তিচালিত ইঞ্জিনের যা উড়ন্ত যানকে গতি দিতে সক্ষম হবে।

শুরু হলো ইঞ্জিন ও তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রতিবারই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এক এক সময় হতাশায় ভেঙে পড়েন দুজন। সব চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে, সে আশঙ্কা পেয়ে বসেছে দু' ভাইকে। কিন্তু সাময়িক হতাশাকে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুই ভাই। যে কোনো মূল্যেই হোক সাফল্য তাঁদের অর্জন করতেই হবে। অল্প কিছুদিন পর তাঁরা বুঝতে পারলেন এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন আরো জ্ঞানের। পরিপূর্ণ জ্ঞান না হলে সাফল্য অনিশ্চিত। ইতোমধ্যে এই বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে সমস্তই তাঁরা সংগ্রহ করলেন। নিরলস অধ্যাবসায় নিয়ে শুরু হলো তাঁদের অধ্যয়ন। শুধু যে পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করলেন তাই নয়, তাঁরা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রচনা থেকে জানলেন বাতাসের গতিবেগ, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে তার চাপ, ভারসাম্য নির্ণয়ের পদ্ধতি। তাছাড়া কীভাবে এতদিন বিভিন্ন উড়ন্ত যান নির্মাণ করা হত তার নির্মাণ কৌশল, আরো অন্যান্য বিষয়। এলো গ-াইডার বা ছোট ছোট খেলনার আকৃতির যন্ত্র। নানান প্রক্রিয়ায় বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাতে তো মানুষের আকাশে ওড়া সম্ভব হত না। দুই ভাই ছোট একটা কারখানা তৈরি করলেন। দীর্ঘ এক বছরের প্রচেষ্টায় সেই কারখানায় তৈরি হলো এক বিশাল গ-াইডার বা উড়ন্ত যান। এতদিন যে ধরনের গ-াইডার তৈরি হত এই গ-াইডার তার চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। এই গ-াইডার বাতাসে ভারসাম্য রেখে সহজেই উড়ে যেতে পারে। গ-াইডারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাইট ভাইয়েরা তৈরি করলেন দুই পাখাবিশিষ্ট ছোট বিমান। এই বিমানের সামনে ও পেছনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা ছোট যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হলো। এর নাম এলিভেটর। এই এলিভেটরের সাহায্যেই পাইলট কোনো বিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সমস্ত নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর শহর থেকে দূরে এক নির্জনে এই দুই পাখাওয়ালা বিমানকে শূন্যে বাসিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কয়েকবার বিমানকে আকাশে ওড়াবার পর দুই ভাই

www.pathagar.com

বুঝতে পারলেন এখনো তাঁদের উদ্ভাবিত বিমানের কলাকৌশলের কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলেও তাঁরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। আবার শুরু হলো তাঁদের কর্মযজ্ঞ। এইবার লক্ষ্য কীভাবে গ-াইডারকে শক্তিচালিত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা করবার পর দেখা গেল একমাত্র পেট্রল চালিত ছোট ইঞ্জিনেই বিমান চালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এবং প্রতি তিন পাউন্ড ওজনের জন্য এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের আবশ্যক।

বাজারে যে সমস্ত ইঞ্জিন পাওয়া যায় তার প্রতিটিই গাড়ির ব্যবহারের জন্য, বিমানে ব্যবহারের অনুপোযুক্ত। দুই ভাই ইঞ্জিন তৈরির কাজে হাত দিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি হলো বিমানে ব্যবহারের উপযুক্ত ইঞ্জিন। অবশেষে এল সেই দিন, ১৭ ডিসেম্বর ১৯০৩। উইলবার ও অরভিল তাঁদের তৈরি বিমান নিয়ে এলেন Kitty Hawk শহরের প্রান্তে। প্রথমবারের মতো পৃথিবীর মানুষ বিমানে চেপে মহাশূন্যে পাখির মতো ভেসে বেড়াবে। এই সংবাদ আগেই শহরময় প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই এ-কথা বিশ্বাস করল না। মানুষ যে আকাশে উড়তে পারবে এটা তখনকার যুগে একেবারেই অসম্ভব একটা বিষয় ছিল। সুতরাং তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করা তো দূরে থাক—বেশিরভাগ লোকই তাদেরকে পাগল বলে আখ্যা দিল। অনেকে ধরে নিলো এইবার এই দুই ভাই নিঃসন্দেহে মৃত্যুবরণ করবে।

দিনটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। প্রবল শৈত্য প্রবাহ বইছিলো। এমন দিনে সাধারণত কেউ বাড়ি থেকে বের হয় না। কিন্তু এই তীব্র শীতার্ত আবহাওয়া দমিয়ে রাখতে পারলো না দুই ভাইকে। তাদের এই কর্মকাণ্ড দেখার জন্য মাত্র কয়েকজন মানুষ তাদের চারপাশে ঘিরে আছে। নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তারা দেখছে দুই পাগলের কাজ কারবার। তাদের কাছে বিষয়টা ঠিক পাগলের কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদিকে পুরো শহরের মানুষ যার যার নিজেদের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসের সামনে জবুথবু হয়ে বসে আরাম করছে। প্রথমে দুই ভাই তাঁদের বিমানের সাথে ইঞ্জিন যুক্ত করলেন। সমস্ত যন্ত্রপাতি শেষবারের মতো পরীক্ষা করলেন। শেষপর্যন্ত দুই ভাইই নিশ্চিত হলেন তাঁদের তৈরি প্রথম এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে। যদিও সেই সময় এরোপ্লেন (Aeroplane) নাম দেওয়া হয়নি। নাম দেওয়া হয়েছে রাইট ফাইয়ার (Wright Flyer)।

ঠিক হলো লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে কে প্রথম এরোপ্লেন চালাবে। একটা মুদ্রা নিয়ে টস করা হলো। অরভিল জয়ী হলেন। বিজয়গর্বে বিমানের সামনে গিয়ে বসলেন। নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন উইলবার। তখন সেখানে উপস্থিত মাত্র পাঁচজন মানুষ। Kitty Hawk-এর মানুষেরা কল্পনাও করতে পারেনি কি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে তাদেরই শহরে। অল্প অল্প বাতাস বইছিল। অরভিল বিমানের

www.pathagar.com

প্রপেলার চালু করলেন। উইলবার বিমানের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে দিলেন। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে উড়ন্ত যানকে ঠেলতে আরম্ভ করলেন।

অবাক হয়ে গেল তাদের ঘিরে থাকা লোকগুলো। তাদের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়েই সামান্য দূরে গিয়েই বাতাসের বুক চিরে শূন্যে উড়ে চলল প্রথম বিমান। কিছুদূর গিয়ে একবার পাক খেল। কিন্তু বেশিক্ষণ চললো না এই বিমান। তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। ঘড়িতে দেখা গেল বারো সেকেন্ড বাতাসে ভেসেছিল রাইট ভাইদের প্রথম এরোপ্লেন। মাত্র বারো সেকেন্ড। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকা লোকজন এমনকি রাইট ভাইরাও সেদিন কল্পনা করতে পারেননি, ঐ স্বল্পক্ষণের বিমান যাত্রাই নতুন যুগের সূচনা করল, যে যুগ গতির যুগ, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটার যুগ। নিরাপদে অবতরণ করে অরভিল বিমান থেকে বেরিয়ে এলেন। এইবার উইলবারের পালা। ভাইয়ের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে উইলবার আকাশে ভেসে রইলেন ঊনষাট সেকেন্ড। এবং প্রায় ৮২০ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন।

দুই ভাই ঠিক করলেন তাঁদের এই সাফল্যের কথা সমস্ত মানুষকে জানাতে হবে। এতদিন যা ছিল শুধুমাত্র তাঁদের, আজ থেকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। আমেরিকার প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়ার দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করতে। সেদিন সকাল থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। নতুন ইঞ্জিনটাও ঠিকমতো কাজ করছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হলো। এই বিপর্যয়ে সাময়িকভাবে দুই ভাই ভেঙে পড়লেও ধীরে ধীরে মানসিক শক্তি ফিরে পেলেন। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে ইঞ্জিনে গণ্ডগোল দেখা গিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ দূর করা হলো। তারপর শুরু হলো নিয়মিত আকাশে ওড়া। এবার আর কোনো প্রচার নয়, সাংবাদিক সম্মেলন নয়, সকলের অগোচরে একটু একটু করে আকাশে উড়বার সময় বাড়াতে থাকেন দুই ভাই। এক মাইল, দেড় মাইল এভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে বেশি দূরত্ব পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা; সফলও হন।

বিমানের কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে ইতোমধ্যে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন দুই ভাই। কিছুটা নিরুপায় হয়েই সাময়িকভাবে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা বন্ধ রেখে ব্যবসার কাজে মন দিলেন। বাজারে যত ধার-দেনা হয়েছিল একে একে সমস্ত শোধ করলেন। হাতে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত হতেই দুই ভাই আবার বিমান তৈরির গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল তাদের আগে যদি অন্য কেউ বিমান তৈরি করে সর্বসমক্ষে আকাশে উড়ে বেড়ায় তাহলে সব শ্রম বিফলে যাবে। কারণ সেই সময় ইউরোপেও কিছু মানুষ উড়ন্ত যান নিয়ে গবেষণা করছিল। রাইট ভাইয়েরা শুধু সাংবাদিক নয়, বিশিষ্ট কিছু মানুষকেও নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের আকাশে ওড়বার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য। এইবার আর

www.pathagar.com

বিফলতা নয়। সকলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাইট ভাইয়েরা কেমন করে একে একে পাখির মতো স্বচ্ছন্দে আকাশপথে বিমানে চড়ে উড়ে চলেছে। বাতাসের মতো এই সংবাদ শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দিক থেকে প্রশংসা আর অভিনন্দনবার্তা আসতে থাকে। তবুও নিজেদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না রাইট ভাইয়েরা। আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। এগিয়ে আসে এক সিন্ডিকেট। তারাই প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের সব ভার গ্রহণ করে। নতুন সিন্ডিকেট আমেরিকান গভর্নমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। অরভিল চুক্তির শর্ত অনুসারে আমেরিকায় রয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য আরো উন্নত ধরনের বিমান তৈরি করা। দুই ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন এই কাজটাই তাঁরা করবেন পালাক্রমে। প্রথমে উইলবার ফ্রান্সে গেলেন। সেখানে দেখালেন বিমানে ওড়ার কলাকৌশল। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিমানে আকাশে উড্ডয়নের কথা পৃথিবীজুড়ে মানুষ জেনে গেছে। উইলবার ফ্রান্সে পৌঁছে যথেষ্ট সমাদর পেলেন। বলতে গেলে একজন বৈজ্ঞানিকের সমমর্যাদায় তাঁকে আসন দিল সেখানকার লোকজন। এছাড়া, ফ্রান্সের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন।

একদিন আমেরিকায় অরভিল রাইট সামরিক বাহিনীর এক অফিসারকে সাথে নিয়ে যখন বিমানে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় আকস্মিকভাবে একটা প্রপেলার ভেঙে প্লেন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর আহত অরভিলের প্রাণ রক্ষা হলেও সঙ্গী অফিসার দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান। কিছুদিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেন অরভিল। ততদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এরোপ্লেন কেনার জন্য আবেদন জানাতে থাকে। রাইট ভাইয়েরা বুঝতে পারেন তাঁদের সুদীর্ঘ পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এতদিনে সফল হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সামনে তাঁরা এনে দিয়েছেন এক নতুন গতি। যে গতির কথা মানুষ কল্পনা করতে পারেনি। অবশেষে ১৯১২ সালে উইলবার মারা যান। অরভিল তারপরেও বহু বছর

একটি অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ

www.pathagar.com

বেঁচেছিলেন। আমৃত্যু তিনিও বিমানের উন্নয়ন ও উৎপাদনের কাজে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন।

ইতিমধ্যে লুঁই ব্রেরিয়ট নামের ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী রাইট ভাইদের উদ্ভাবিত রাস্তা ধরে তৈরি করে ফেলেছেন একটি পরিপূর্ণ উড়োজাহাজ। এবার তিনি বাজি ধরে তাঁর নিজের হাতের তৈরি এরোপ্লেনে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে সক্ষম হন। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জেপেলিন জাতীয় উড়ন্ত বাহন ব্যবহার করে সুফল পাওয়ায় এবার সারা পৃথিবীর কৌতূহলী মানুষ আর গবেষকদের মধ্যে প্লেন তৈরিতে উৎসাহ বেড়ে যায়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এরোপ্লেন আরো উন্নত হতে থাকে। এবার পাখাওয়ালা এরোপ্লেন তৈরি হলো। ১৯১৯ সালে স্যর আর্থার ব্রাউন ও স্যার জন অ্যালকক আটলান্টিক মহাসাগর পার হলেন তাঁদের এরোপ্লেনে চড়ে। এর মধ্যেই নানারকম বিমান তৈরির কোম্পানি চালু হলো। এরপর ১৯২৬ সালে রিচার্ড ইভলিন বার্ড তাঁর এরোপ্লেনে করে উত্তর মেরু ঘুরে আসেন এবং পরে তিনি দক্ষিণ মেরু ঘুরে আসতেও সফল হয়েছিলেন।

১৯৩১ সালে প্লেনে চেপে পৃথিবী প্রদক্ষিণও সম্ভব হয়—সম্ভব করেন দুই আমেরিকান—ওয়াইলি গোস্ট এবং হ্যারল্ড গ্যাটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরে এরোপ্লেন তৈরির ক্ষেত্রে নানা উন্নত সংযোজন ঘটতে থাকে। বম্বার, ফাইটার, জেট ইত্যাদি বিমান এই সময়েরই আবিষ্কার। প্লেনগুলি মাল বহনেও সক্ষম হয়ে ওঠে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানা ধরনের উন্নত বিমান তৈরি হয়েছে। বিমান ক্রমশ আরো বেশি দ্রুতগামী হতে থাকে।

একখানা জেট বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ১,৭০০ মাইল, এই গতিবেগ শব্দের গতিবেগের থেকেও বেশি। আধুনিক এসব বিমান তৈরিতে আমেরিকা, রাশিয়া,

আধুনিক জেট প্লেন

www.pathagar.com

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বিমান আকাশে ওঠে 'লিফ্‌ট' পদ্ধতির মাধ্যমে। আধুনিক বিমানে পাখা বাদ দিয়ে আরো চারটি সারফেস, প্রপেলার, লেজ বা টেলপ্লেন থাকে। লেজের অংশ এবং পাখাই বিমানকে ওঠা-নামায় সাহায্য করে, প্রপেলার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর সবরকম ভার বহন করে দেহ।

আধুনিক জেট প্লেনে প্রপেলার থাকে না। এটি চলে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী। এর লম্বা নলে হাওয়া ভর্তি করে তা সরু পথে বের করা হয়, হাওয়া তীব্রভাবে প্লেনের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে গেলে বিমান হাওয়ার চাপে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আধুনিক জেট বিমান র‍্যাম জেট, প্রপ জেট, টারবো জেট এই তিন রকম হয়। রকেটও অনেকটা জেট বিমানের মতো, তবে এর ভেতরেই নিজস্ব অক্সিজেন থাকে, জেটের মতো বাইরে থেকে হাওয়া জোগাড় করতে হয় না। সাধারণ বিমান বা জেট বিমানকে আকাশে উঠতে গেলে মাটিতে খানিকটা চলতে হয়। এতে রানওয়ে এরোড্রামের দরকার হয়। কিন্তু হেলিকপ্টার নামক আকাশযানের বেলায় এ সবের দরকার পড়ে না। কারণ, হেলিকপ্টার সরাসরি মাটি থেকে ওড়ে। এতে প্রপেলার থাকে না তার বদলে বিমানের মাথায় পাখা লাগান থাকে। এই পাখাকে রোটার বলে। হেলিকপ্টারের পূর্বপুরুষ ১৯২৩ সালে স্পেনের সিয়েরভার তৈরি অটোজাইরো বিমানটি। এতে প্রপেলারও ছিল, উপরে পাখাও ছিল। জলে, স্থলে, আকাশেই শুধুমাত্র মানুষের চলার গতি থেমে থাকেনি, তারা পাতালেও প্রবেশ করেছে।

১৮৩৩ সালে টেম্‌স নদীর নিচে মাটিতে রেললাইন পেতে স্যার মার্ক ইন্সাবার্ড যে নিদর্শন তৈরি করেন, তাকে অনুসরণ করেই এরপর প্যারিস, মস্কো, মাদ্রিদ, টোকিও, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি ৪৬টি দেশে এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতাতেও পাতাল রেলপথ এবং পাতাল রেল গড়ে উঠেছে। এইভাবেই মানুষ তাদের যাতায়াত, মালবহন ও যোগাযোগের উন্নতি সাধনের জন্য যানযাহন তৈরির ক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমন কি তারা উন্নত মহাকাশযান তৈরি করে মহাকাশে পাড়ি দিতেও সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

যুগে যুগে মহাকাশ অভিযান ও রকেট

উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পর মানুষের আশার সীমা আরও ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এরপর মানুষ ভাবতে থাকে এই অসীম সীমাহীন মহাকাশের সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই অসীম শূন্যে ছড়ানো নীল আকাশের আবার সীমানা কে জরিপ করতে পারে? না, এটা জরিপের ব্যাপার নয়, এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুমান। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর পিঠ থেকে ৬০০ মাইল উপরে উঠলেই অন্ধকার রাজ্যের শুরু। এই অন্ধকারের রাজ্যকে আকাশ বলে না, সৌরবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই সুবিশাল সীমাহীন অংশকে বলা হয় মহাকাশ। তবে এই মহাকাশকে জানতে হলে সাধারণ উড়োজাহাজে যে সম্ভব না, সেটা অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সুতরাং এমন আকাশ বাহন চাই—যেটা উড়োজাহাজের চেয়ে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন।

যুগে যুগে মহাকাশ অভিযান

মানুষ পাখিকে ডানায় ভর করে আকাশে উড়তে দেখেছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। পাখিরা বাতাসে ভাসতে পারে বলেই আকাশে উড়তে পারে। যার ওপর ভর দিয়ে ওড়া যায়। এখন বাতাস থাকলে তবেই ওড়া সম্ভব। যেখানে বাতাস নেই সেখানে মানুষ উড়ে যাবে কি করে? তাই বেলুন থেকে শুরু করে জেপেলিন ইত্যাদি আকাশে ওড়ার যতরকম যন্ত্র মানুষ তৈরি করেছে, তা সবই বাতাসের ওপর ভর করে ওড়ে। বাতাস না থাকলে সেগুলো অচল, আবার বাতাস হালকা হলে সেগুলো তেমন জায়গায় উড়তে পারে না। তাই মাইল দশেকের উপর আর বিমান যেতে পারেনি। ফলে যে কোনো উড়োজাহাজ তা সে যত দ্রুতগামীই হোক সুদূর মহাকাশে কখনই যেতে পারেনি। সুতরাং মানুষের চেষ্টা চলল এমন কোনো দ্রুতগামী যান তৈরি করতে হবে যা বাতাসের উপর নির্ভর না করেও মহাকাশের দিকে ছুটে যেতে পারে। তখনই আবিষ্কার হলো রকেট।

ইংরেজিতে হাউইকে বলা হয় রকেট। এখন হাউই যে হুস করে আকাশের দিকে ছুটে যায় তা কি করে সম্ভব? যদিও প্রশ্নটা শুনে আপাতভাবে খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে কাজ করছে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনের তিনটি সূত্র। বিজ্ঞানী নিউটনের এই সূত্রকে বলে Laws of Motion। এই সূত্রের প্রথম সূত্রটি হলো, 'প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই একটি করে উলটো প্রতিক্রিয়া আছে যা কাজ করে ঠিক ওর বিপরীত দিকে এবং প্রতিক্রিয়া ঠিক ঐ ক্রিয়ার সমান।'

www.pathagar.com

নিউটন এই সূত্রটি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছিলেন যে শুধু পৃথিবীতে নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিয়মটি সমানভাবে কাজ করছে। হাউইয়ের ছুটে যাবার পিছনে ঠিক এই একই ঘটনা ঘটে। হাউইয়ের একদিকে থাকে একটা ছোট্ট ফুটো আর তার ভিতর পোরা থাকে জ্বালানি বা বিস্ফোরক পদার্থ। যা জ্বালিয়ে দিলেই ওর ভিতর জ্বলে ওঠা গ্যাসের প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। গ্যাসটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেরোবার পথ তো একটা ছোট্ট ফুটো, তাই এই ছোট্ট ফুটোর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে গেলে একটা প্রচণ্ড বেগের সৃষ্টি হয়। এখানেই নিউটনের সূত্র অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। যে দিকে গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক তার উলটো দিকে অনুরূপ প্রচণ্ড আর একটা উলটো চাপ পড়ে। যার ফলে হাউই সেই ফুটোর উলটো দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে। যতদূর জানা গেছে চীনে একাদশ শতাব্দীতে রকেটকে প্রথম যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আধুনিকভাবে এই রকেটের ব্যবহার করা হয়। জার্মানরা এইরকম রকেট দিয়ে শত্রুপক্ষকে দারুণভাবে ঘায়েল করে। তাদের কোনো কোনো রকেট এত বড় ছিল যে ২টন ওজনের আর ৫০ফুটের কাছাকাছি লম্বা। এ ধরনের বিশাল রকেট যখন শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে আকাশপথে ছুটে গিয়ে কোনো দেশে পড়ত তখন সেখানে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতো। জার্মানদের এই রকেট আকাশপথে ২০০ মাইল পথও অনায়াসে অতিক্রম করত। এই ধরনের রকেটের নাম দেওয়া হয়েছিল ভি-টু (V-2)।

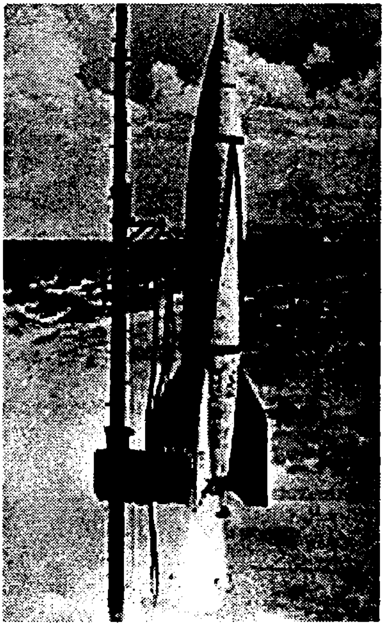

একটি V-2 রকেট

রকেট নিয়ে গবেষণা

মানুষ কিন্তু শুধুমাত্র যুদ্ধাস্ত্র হিসেবেই রকেটের গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সময়ের প্রয়োজনে মানুষ নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেথে উঠেছে। তাই মানুষ মহাকাশ পাড়ি দেবার জন্য রকেটকে ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবতে লাগল। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই একটা ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিলেন যে রকেটের গতি যখন বাতাসের ওপর নির্ভরশীল নয় তখন তাকেই মহাকাশ অভিযানে ব্যবহার করা যায় কিনা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী গডার্ড শুকনো জ্বালানির বদলে তরল জ্বালানি ব্যবহার করে দেখলেন যে ওতে রকেটের গতি অনেক বেশি বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯৩৫ সালে এই রকম একটি রকেট ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ঘটনা। বিজ্ঞানীরা পরবর্তী কালে রকেটকে আরও দ্রুতগামী করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিজ্ঞানীরা দেখলেন একটি রকেটের পক্ষে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। যদি কয়েকটি রকেট একত্র করে একটি বড়সড় রকেট বানানো যায় তাহলে বোধহয় মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে। একটি রকেট জ্বলে শেষ হয়ে গেলেও এই রকেট সমষ্টির যাত্রার গতি অব্যাহত থাকবে। উপযুক্ত জ্বালানির সাহায্যে প্রথমে একটি রকেট ছোঁড়া হবে আর ঐ রকেটের মধ্যেই ভরা থাকবে আরও কয়েকটি রকেট। প্রচণ্ডবেগে মহাকাশের দিকে ছুটতে ছুটতে যখন প্রথম রকেটটির গতিবেগ কমে আসবে সেটি তখন খসে পড়বে ঠিক যেমন হাউই পুড়ে যাবার পর পড়ে। তখন সেই পুড়ে যাওয়া রকেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে আরেকটি নতুন রকেট।

এইভাবে মহাকাশের সীমানায় ঢুকে পড়বে রকেট। ঠিক যেন স্পোর্টসের রিলে রেসের মতো একটার পর একটা নতুন রকেটের কাছে মহাকাশের ছুটন্ত রকেট তার গতি হাতবদল করে এগিয়ে যাবে। এইভাবে করলে হয়তো মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : স্পুটনিক

মহাকাশ বিজয় অভিযানের একটি স্মরণীয় দিন হলো ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। সারা পৃথিবীর মানুষ চমকে উঠল বিজ্ঞানের এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপে। ঐ রিলে

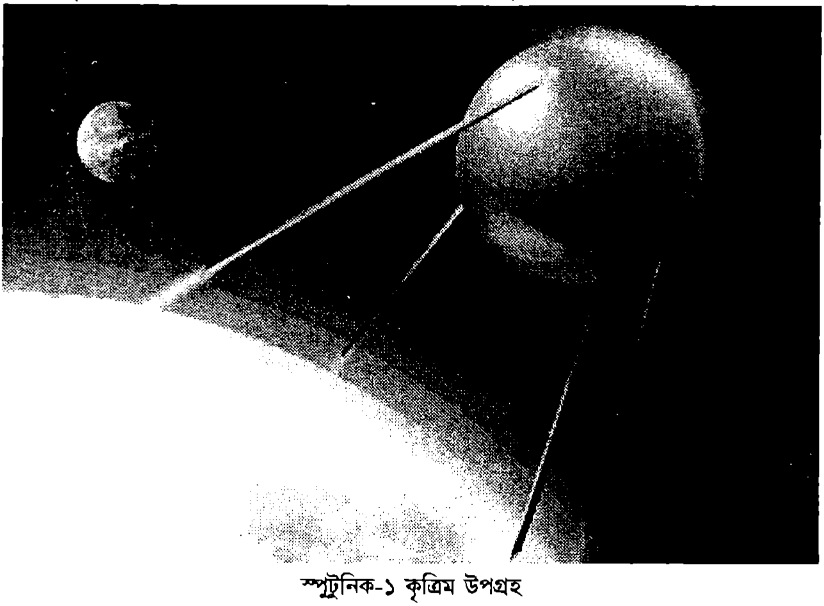

স্পুটনিক-১ কৃত্রিম উপগ্রহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

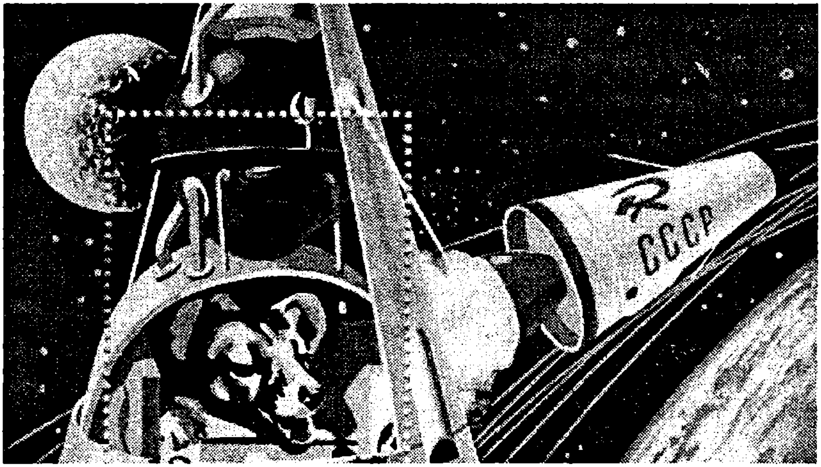

মহাকাশে প্রথম প্রাণী-লাইকা

মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন তার ওজন পৌনে পাঁচ টন। তিনি সুস্থ শরীরেই মহাকাশ যাত্রা শেষ করে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। পরে ১৯৬৮ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় গ্যাগারিন মারা যান।

মহাকাশ পরিক্রমায় বাঁধা বিপত্তি

মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে যত সহজে বলা হয়েছে তত সহজে কিন্তু মহাকাশে যাওয়া যায়নি। প্রথমেই যে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হলো পৃথিবীর আকর্ষণ। পৃথিবী তার উপরের সব জিনিসকে প্রবলভাবে কাছে টানছে। কোনো পদার্থই এই আকর্ষণকে অতিক্রম করে শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, কোনো রকেট যদি ঘণ্টায় ১৪ হাজার মাইল বেগে ছুটতে না পারে তাহলে তাকে পৃথিবীর টানে আবার এই পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে। ঘণ্টায় তার গতিবেগ যদি ১৮ হাজার মাইল হয় তবে পৃথিবীর টান খানিকটা কাটানো সম্ভব হতে পারে। পুরোপুরি নয়। তা নাহলে রকেটটি পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকবে অনেকটা আঙুলের মাথায় দড়িতে ঢিল বেঁধে ঘোরালে ঢিলটি যেমন চারপাশে ঘুরতে থাকবে, তেমনি। ছিটকে চলে যেতে পারবে না। ঘণ্টায় ১৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ থাকা পর্যন্ত এই রকমই চলবে। আর গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল ছাড়িয়ে যায় তাহলেই সেটা পৃথিবীর টান সম্পূর্ণ কাটিয়ে মহাকাশে ছিটকে যাবে। অর্থাৎ দূর মহাকাশে যেতে হলে এই ধরনের তীব্র গতিবেগ হওয়া চাই। আর সূর্যের আকর্ষণের বাঁধা কাটিয়ে সৌরজগতের বাইরে যেতে হলে গতিবেগ ঘণ্টায় একলক্ষ মাইলের বেশি হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে রকেটটি সূর্যের গ্রহ হয়ে সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করবে।

আমাদের মাথার উপরের বাতাস সব সময়ই আমাদের মাথার উপর চাপ দিচ্ছে। সে চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ডের মতো। তবে, এই চাপে

www.pathagar.com

আমাদের শরীরে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ আমাদের শরীরের মধ্যেই আছে এই চাপ সামলাবার ব্যবস্থা। যতটা চাপ আমাদের ওপর পড়েছে ঠিক ততটা চাপ আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি উলটো দিকে। ফলে আমরা বাতাসের চাপে চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছি না। আমরা যতই উপরে উঠব ততই আমাদের ওপর বাতাসের চাপ কমতে থাকবে। সেই অবস্থায় আমরা অভ্যস্থ নই বলে সে অবস্থা সামলাতে আমাদের শরীরের অবস্থা খুবই মারাত্মক হবে। হিসেবে দেখা গেছে যে, পৃথিবী থেকে ২৫ হাজার ফুট অর্থাৎ পৌনে পাঁচ মাইলের মতো উঠলেই বাতাসের চাপ এত কমে যাবে যে তাতে আমাদের শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা অক্সিজেন বুদবুদের মতো বেরিয়ে আসতে চাইবে। আরও উপরে উঠলে সে অক্সিজেন আরও ফেঁপে হাল্কা হয়ে যাবে এবং গ্যাসে পরিণত হবে। এমন কি ৫০ হাজার ফুট অর্থাৎ সাড়ে ৯ মাইল উঁচুতে উঠলেই রক্তের ভেতরে থাকা অক্সিজেন ফেঁপে আয়তনে ৮৫ গুণ বেড়ে শরীর ফুলতে ফুলতে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এ তো হলো বাতাসের চাপের হেরফের হওয়ার ফলে বিপদের কথা। এরপরও আছে তাপের কথা। যত ওপরে ওঠা যাবে ততই ঠাণ্ডা অনুভব হবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে কম্বলের মতো মুড়ে রেখেছে। এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা পৃথিবীতে আরামে বাস করতে পারছি। মহাকাশে যেখানে একটু বাতাস নেই সেখানকার ঠাণ্ডা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এছাড়াও আছে উল্কা, যা মহাকাশে ছোটাছুটি করছে নিরন্তর। মহাকাশযানটি যখন মহাকাশে থাকবে তখন যে কোনো বড় উল্কা তাকে আঘাত করে ভেঙে তুবড়ে দিতে পারে। আছে তীব্র কসমিক রে যা রেডিও অ্যাকটিভ বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির মতোই ভীষণ ক্ষতি করে। মহাকাশে মানুষের বা যে কোনো পদার্থের কোনো ওজন নেই। কারণ আমাদের যা ওজন তা হলো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই ওজন না থাকার সমস্যা হলো কোনো কিছুই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শূন্যে পেঁজা তুলোর মতো ভাসতে থাকে।

এছাড়াও আছে খাদ্য-সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন সমস্যা। নিঃশ্বাসে ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড সমস্যা। এত সমস্যা সমাধানের পথ বের করে তবেই বিজ্ঞানীদের মহাকাশে মানুষ পাঠাবার কথা চিন্তা করতে হয়েছে।

সমস্যার সমাধান

বিজ্ঞানীরা একদিন মহাকাশ অভিযানের সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করে ফেললেন। এক বিশেষ ধরনের মহাকাশ পোশাক তৈরি করলেন। এর নাম স্পেস স্যুট (Space Suit)। এই পোশাক পরে মহাকাশে গেলে আর কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না। পোশাকের সঙ্গে নল দিয়ে জোড়া আছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক। তার কোনোটার কাজ শরীরের চাপ ঠিক রাখা; কোনোটার কাজ নিঃশ্বাসের জন্য শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন সরবরাহ করা; আবার কোনোটি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে তাকে সরিয়ে দেওয়া।

www.pathagar.com

মানুষ বুঝতে পারল, মহাকাশে ঘুরে বেড়ালেই তো মহাকাশ রহস্য ভেদ করা সম্ভব না। তাই মানুষের প্রথম অভিযানের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদের দিকে। চাঁদে যদি পৌঁছনো না যায় তা হলে তো মহাকাশ অভিযান ব্যর্থ হবে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন যে, কোনো রকেট যদি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বা তারও বেশি জোরে ছুটতে পারে তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে। তাই চাঁদে যেতে হলে ওইরকম একটা গতিসম্পন্ন রকেট হওয়া চাই তা না হলে ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না। চলতে লাগল বৈজ্ঞানিকভাবে তার প্রস্তুতি। একদিন সফল হল মানুষের চাঁদে পাড়ি দেওয়ার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

অ্যাপোলো-৮ এর অভিযান

১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে একটি বিরাট মহাকাশযান ছুটে বেরিয়ে গেল মহাকাশের উদ্দেশে। যে রকেটের সাহায্যে এই মহাকাশযানটিকে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হলো তা এত বড় যে, এর আগে কল্পনাও করা যায়নি, মহাকাশে এত বড় রকেট পাঠানো সম্ভব। এই রকেটের নাম দেওয়া হল স্যাটার্ন-৫ (Saturn-5)। পরপর তিনটি খোলসে তৈরি এটি। আর এর ডগায় বসানো হলো মহাকাশযানটিকে। যার নাম অ্যাপোলো-৮ (Apollow-8)। সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ তলার সমান উঁচু আর ওজনে পৌনে তিন হাজার টনেরও বেশি– অর্থাৎ প্রায় ৭৮ হাজার মণ।

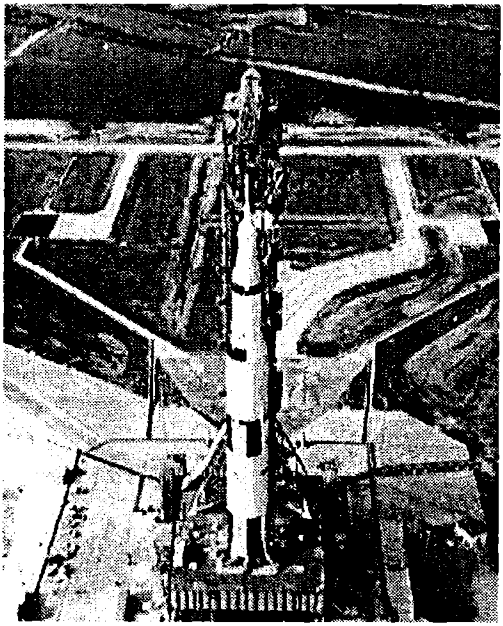
অ্যাপোলো-৮

জ্বালানি হিসাবে এই রকেটের ভিতর ছিল পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি ছাড়াও কয়েকশো টন তরল হাইড্রোজেন আর তা জ্বালাবার উপযোগী তরল অক্সিজেন। অক্সিজেনকে তরল রাখতে হলে তার উত্তাপকে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের (সেলসিয়াসের) ১৮৩ ডিগ্রি নিচে রাখতে হয়, আর হাইড্রোজেনকে তরল রাখতে হলে তাকে আনতে হয়

www.pathagar.com

শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের (সেলসিয়াসের) ২৫৩ ডিগ্রি নিচে। সেই ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল স্যাটার্ন-৫ এ।

·কেপ কেনেডি থেকে প্রথমেই সেটা ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হল। বার দুই পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে তার গতিবেগ হয়ে গেল ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। তার তিনটি রকেট খোলস তিনবার ধাক্কা দিয়ে তার মধ্যে এই গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিল আর তার ডগায় বসে রইল মূল মহাকাশযান অ্যাপোলো-৮। রকেটের সঙ্গে সঙ্গে সেটিও সমান বেগে ছুটেছে। রকেট খোলসগুলি ইতোমধ্যে একে একে তাদের কাজ শেষ করে খসে খসে পড়ছে; তাতে কিন্তু মহাকাশযান স্থানচ্যুত হয়নি বা তার গতিবেগ কমেনি। অ্যাপোলো-৮ বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল পথ পার হয়ে এলো, তারপর এক সময়ে পৃথিবীর টান পুরোপুরি কাটিয়ে পাড়ি দিল মহাশূন্যে। তখন সেই মহাকাশযানের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল হলেও চলবে, তাহলেই সে চাঁদের রাজ্যে পৌঁছে যাবে। ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল বেগে ছুটতে ছুটতে অবশেষে অ্যাপোলো-৮ ঢুকে পড়ল চাঁদের রাজ্যে। অর্থাৎ যেখানে পৃথিবী তাকে আকর্ষণ না করলেও চাঁদ তাকে আকর্ষণ করছে। যতই চাঁদের দিকে এগোচ্ছে অ্যাপোলো-৮, ততই তার গতিবেগ বেড়ে চলেছে। এবার তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, তা না হলে সেই মহাকাশযান হুড়মুড় করে চাঁদের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে এবং ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

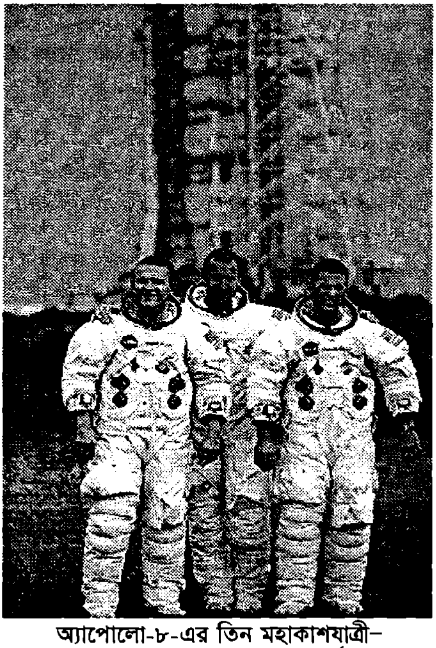

অ্যাপোলো-৮-এর তিন মহাকাশযাত্রী–
বোরম্যান, রোভেন ও অ্যান্ডার্স।

অ্যাপোলো-৮ খালি যায়নি। এর মধ্যে বসেছিলেন তিনজন অসমসাহসী মহাকাশযাত্রী; বোরম্যান, রোভেন ও অ্যান্ডার্স। এই তিনজনই অ্যাপোলো-৮ এর মধ্যে বসে তার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁরা মহাকাশযানে প্রতি দু'ঘণ্টায় একবার করে চাঁদকে পাক খেতে লাগলেন। এই পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন চাঁদকে। সেই সঙ্গে ছবি তুলে সে ছবি টেলিভিশনে পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীর দিকে। চাঁদের যে দিকটা এই পৃথিবী থেকে কোনোদিনও দেখা যায়নি সেদিকের ছবিও এই পৃথিবীর মানুষ ঘরে বসে দেখতে পেল।

www.pathagar.com

অবশেষে শুভদিনটি এসে উপস্থিত হলো। পরের বছর জুলাই মাসের ২১ তারিখে আরও তিন দুঃসাহসী চন্দ্রাভিযাত্রী মহাকাশে তাদের অভিযান শুরু করলেন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য। সেই চন্দ্রযানটির নাম অ্যাপোলো-১১। যথা সময়ে সেটি কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হলো ৯২ হাজার রেল-ইঞ্জিনের শক্তি সম্বল করে। এই চন্দ্রযানেও যাত্রী ছিলেন তিনজন। নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্স। ঠিক হলো কলিন্স মূল জাহাজে বসে জাহাজ চালাবেন। আর চন্দ্রযানের ভেলায় চড়ে চাঁদের বুকে অবতরণ করবেন দলের নেতা আর্মস্টং ও অলড্রিন।

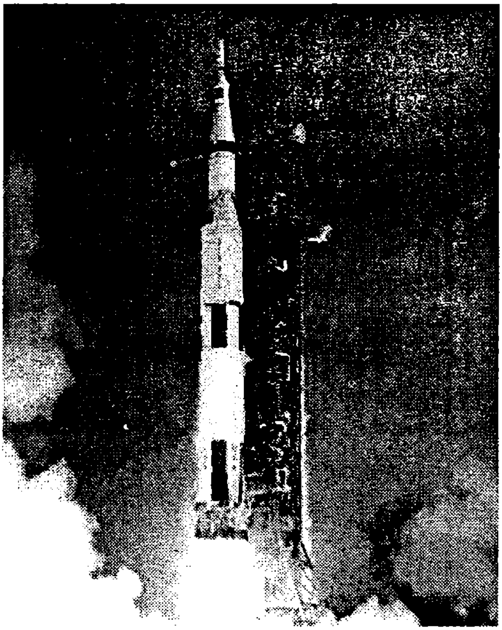

অ্যাপোলো-১১

যথাসময়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মহাকাশযানটি যখন চাঁদের ৬২ থেকে ৭৫ মাইল উপর দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে তখনই আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন ভেলায় গিয়ে ঢুকলেন। ভেলাটি মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। প্রথমে ভেলাটি চাঁদের আকর্ষণে প্রচণ্ড বেগে নামতে লাগল। অভিযাত্রীরা বিপরীতমুখী রকেট চালিয়ে ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করলেন। নইলে চাঁদের আকর্ষণে তার বুকে আছড়ে পড়ে যানটি চুরমার হয়ে যেত। অভিযাত্রীরাও রেহাই পেতেন না। সেই এক অবিস্মরণীয় প্রতীক্ষার মুহূর্ত। পৃথিবীর অগণিত মানুষ বিস্ময়বিমূঢ় চোখে টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। খানিকক্ষণ ভেলায় অপেক্ষা করে প্রথমে বেরিয়ে এলেন আর্মস্ট্রং। তারপর স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরাটি চালিয়ে দিলেন। এরপর মই বেয়ে নেমে এলেন শেষ ধাপে। সন্তর্পণে এক পা রাখলেন চাঁদের উপর আর পরীক্ষা করে দেখলেন মাটি নরম কিনা, পা পিছলে বা বসে যাবে কিনা। না, নরম নয়। পা পিছলাবেও না, বসেও যাবে না। এরপরই নামলেন তিনি চাঁদের মাটিতে। চাঁদের বুকে আঁকা হলো মানুষের প্রথম পদচিহ্ন।

চাঁদে নেমেই চটপট বেলচা দিয়ে আর্মস্ট্রং কিছু মাটি তুলে নিয়ে স্পেস স্যুটটির পকেটে রাখলেন। মিনিট কুড়ি পরে অলড্রিনও ভেলা থেকে চাঁদে নেমে আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গী

www.pathagar.com

অ্যাপোলো-১১-এর তিন মহাকাশযাত্রী– নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স

হলেন। প্রথমেই ওঁদের কাজ হলো চাঁদের বুকে একটা ধাতুতে খোদাই করা ফলক পুঁতে তাতে সন তারিখ উল্লেখ করে চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণের জয়বার্তা ঘোষণা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাতীয় পতাকাও পুঁতে দিলেন তাঁরা আর চাঁদের বুকে বসিয়ে দিলেন কতকগুলি যন্ত্রপাতি। এর অনেকগুলিই স্বয়ংক্রিয়। চাঁদের বুকে প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি দুই মহাকাশযাত্রী পদচারণা করেন। টেলিভিশনের পর্দার সেইসব দৃশ্য ও তার কিছু বর্ণনা পাঠান তাঁরা। তারপর তাঁরা দুজন ফিরে আসেন লুনার মডিউলে। লুনার মডিউল চালিয়ে দেওয়া হলো। কলিন্স তখনও মূল মহাকাশযান নিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরে চলেছেন। মডিউল গিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হলো। আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন মডিউল ছেড়ে ঢুকে পড়লেন মূল মহাকাশযানে। ভেলার কাজ শেষ। এখন আর সেটা বয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো মহাশূন্যে। কোথায় যে সেটা হারিয়ে গেল কেউ তার হদিশ জানে না। এরপর মহাকাশযাত্রীরা নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখ্য, নীল আর্মস্ট্রং ২৫ আগস্ট, ২০১২ মৃত্যুবরণ করেন।

চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং

www.pathagar.com

ফোটন রকেট

চন্দ্রবিজয়ের পর মানুষের নজর পড়লো মহাকাশের দূর দূর নক্ষত্রের দিকে। আমাদের মাথার উপরে মহাকাশ কত দূর পর্যন্ত ছড়ানো আছে, তা বিজ্ঞানীরা বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেননি। আমরা জানি, আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল। দূর মহাকাশে এমন জোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে যে তার আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে ১৫ কোটি বছর। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, মহাকাশ যে তারও পিছনে ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে একমত।

নক্ষত্র-জগতে আমাদের ঘরের দুয়ারে যে থাকে তার নাম আলফা সেঞ্চুরি। দূরত্ব চল্লিশ লক্ষ কোটি মাইল। তা হলে আজকের রকেটে গেলে কতদিনে সেখানে পৌঁছতে পারব? প্রায় আশি হাজার বছর। স্বল্পায়ু মানুষ তা হলে সেখানে পৌঁছবে কি করে? বিজ্ঞানীরা তাই চিন্তাভাবনা করছেন এমন একটা রকেটের যার বেগ আলোর বেগের সমান, সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এর নাম হলো ফোটন রকেট (Photon Rocket)। 'ফোটন' শব্দের অর্থ আলোক-কণিকা। এ রকেটে আলফা সেন্টরিতে যেতে সময় লাগবে মাত্র চার বছরের মতো। বস্তুর সর্বোচ্চ বেগ হলো আলোক কণিকার বেগ। এর চেয়ে বেশি বেগ কোনো বস্তুর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। আপেক্ষিক তত্ত্বে আইনস্টাইন একথা বলেছেন। কিন্তু তবুও নক্ষত্রলোকে পাড়ি দিতে হলে মানুষের শারীরিক যেসব ঝামেলা পোহাতে হবে সেগুলোর দিকটাও ভাবতে থাকেন বিজ্ঞানীরা। আর তাই গবেষণার পর গবেষণা করতে থাকেন। মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে মানুষের শারীরিক যেসব অসুবিধা হতে

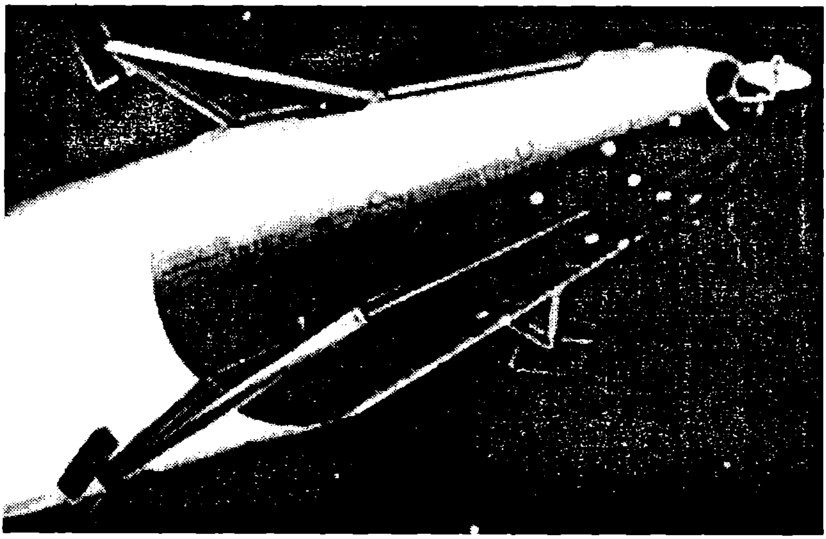

ফোটন রকেট

www.pathagar.com

পারে সেগুলো নিরসনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে সারা বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মেতে ওঠেন গবেষণায়।

হাইপোথার্মি

এটি বিশেষ একটি শারীরিক অবস্থা। নক্ষত্রলোকে পাড়ি দিতে বিজ্ঞানীরা এই অবস্থার সুযোগ নেবার কথা ভাবছেন। পুরোপুরি জীবন্ত অবস্থায় নক্ষত্রলোকে যাত্রা শুরু করলে মাঝপথেই যখন আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসবে তখন বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, জীবন্ত অবস্থায় না গিয়ে জীবন-মৃত অবস্থায় অভিযান করা যাক।

ইংরেজিতে এই অবস্থাকে বলে হাইপোথার্মি (Hypothermy)। এই বিশেষ শারীরিক অবস্থা অব্যক্ত জীবনের অবস্থা।

কোনো জীবদেহকে যদি ক্রমাগত ঠাণ্ডা করা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত সে এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সবরকম শারীরিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় অথচ মৃত্যু ঘটে না। এই অবস্থা হলো হাইপোথার্মি বা জীবন-মৃত অবস্থা। ভাবা হচ্ছে, সুদূর নক্ষত্রলোকে যাত্রাকালে রক্তমাংসের শরীরের যাত্রীকে এই জীবন-মৃত অবস্থায় তুলে দেওয়া হবে রকেটের কামরায়।

এই অব্যক্ত জীবন নিয়ে বছরের পর বছর অভিযাত্রী বেঁচে থাকবেন। হাজার বছর পর রকেট যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে তখন আবার তাকে ঘুমের দেশ থেকে তুলে আনা হবে জাগরণের দেশে। এই অকালবোধন তথা নববোধনের পর্বটি সমাধান করা হবে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায়।

ইতোমধ্যেই অন্য প্রাণীর উপর এই হাইপোথার্মি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানরীরা এক্ষেত্রে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন।

এই কাজটি তখনই করা হবে যখন আলোর গতিতে রকেট ছুটলেও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে মানুষের লেগে যাবে শত শত বছর। তখন এই হাইপোথার্মি পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়

কম্পিউটার

কম্পিউটার আজ গোটা দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্প, ব্যাংক, বিমান, পরিবহণ ব্যবস্থা আজ এর উপর নির্ভরশীল। এমন কি স্কুলে, বাড়িতেও এর ব্যবহার চালু হয়েছে। অনেকে কম্পিউটারকে রহস্য ঘেরা একটা কিছু বলে ভাবেন এবং এমন কি বিপজ্জনক বলেও মনে করেন। কম্পিউটার নিয়ে যারা কাজকর্ম করেন তারা আবার এমন সব অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন যে, তাতে রহস্য আরও দানা বাঁধে। কম্পিউটারকে দেখা উচিত নেহাতই এক শক্তিশালী যন্ত্র হিসাবে। যন্ত্রটি মানুষের ভালো সেবক, অন্যদিকে খারাপ প্রতিনিধিত্বকারী।

ঘর থেকে বাইরে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে সর্বত্রই কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ অতি কঠিন কাজগুলোও অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারছে। গ্রহ উপগ্রহে কম্পিউটার চালিত রোবট প্রেরণ করে জেনে নিচ্ছে অজানা তথ্য। মহাসাগরের গহীন অতলে- যেখানে মানুষের প্রবেশের সাধ্য নেই, সেখানেও কম্পিউটার চালিত রোবট চলে যাচ্ছে অনায়াসে। এদের সাহায্যে মানুষ আবিষ্কার করছে নতুন নতুন তথ্য। জানতে পারছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনাবিষ্কৃত তথ্যগুলো।

মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেও রয়েছে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার। তোমার খেলনা গাড়ি, টেলিভিশন, রেডিও এগুলোতেও ব্যবহার করা হয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। তুমি যে বই পড়ো, কলম দিয়ে লিখো, এগুলো তৈরিতেও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কম্পিউটার এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা কম্পিউটার ছাড়া অর্থহীন। রোগ পরীক্ষার জটিল সব বিষয়গুলোর সমাধান

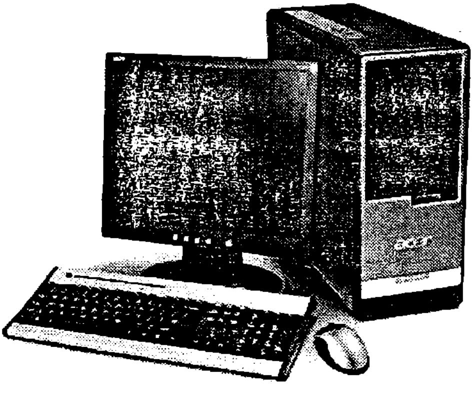

এতটি আধুনিক মাইক্রো কম্পিউটার

www.pathagar.com

অনায়াসেই কম্পিউটারকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে মানুষ। রোগ নির্ণয়ের জন্য কম্পিউটারকে ব্যবহার করার ফলে সঠিক রোগটি ধরতে পারছেন ডাক্তাররা। ফলে, উক্ত রোগের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারছেন তাঁরা। কম্পিউটারাইজড্ এক্সিয়াল টমোগ্রাফি সংক্ষেপে যাকে বলে ক্যাট (উইক) স্ক্যানার এবং ইউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রিসোনেন্স (NMR-Nuclear Magnetice Resonance) স্ক্যানার ইত্যাদি জটিল রোগনির্ণায়ক যন্ত্রগুলোও বর্তমানে কম্পিউটার পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করছে। শুধু তাই নয়, জটিল কোনো রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিও বলে দিতে পারছে কম্পিউটার। অতীতে কিছু কিছু আবিষ্কার আমাদের জীবনযাত্রায় প্রচণ্ড পরিবর্তন এনেছে। ছাপাখানা নিয়ে এলো বই ও লাইব্রেরির যুগ এবং পরে সংবাদপত্রের। শক্তি ও বিদ্যুৎ জীবনকে, শারীরিক পরিশ্রমের দিক থেকে করে তুলল অনেক বেশি সুখকর। মানুষের পেশীর ক্ষমতা একধাপে বেড়ে গেল কত গুণ! এল 'শিল্প বিপ্লব'। আজও আমরা সেই শিল্প বিপ্লবের ফলাফলের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলেছি। আজ কম্পিউটার এমন অনেক কাজ করতে সক্ষম যা এক সময় আমরা ভাবতাম মানুষের মস্তিষ্ক ছাড়া ও সব করা সম্ভবই নয়। যদি এই মেশিন আমাদের 'মস্তিষ্কের ক্ষমতা' বাড়িয়ে দিতে পারে তা হলে তার ফল নিশ্চয়ই সুদূরপ্রসারী হবে। তাই হতে চলেছে। কিন্তু 'যুদ্ধবাজ মেশিন'– এও কি সম্ভব? 'বুদ্ধি' বলতে ঠিক কি বোঝায়? নানা জনের কাছে বুদ্ধির নানা অর্থ। একজন হয়ত বললো, 'অমুক লোকটা কি বুদ্ধিমান!' তার কাছে হয়ত এর অর্থ– লোকটা অঙ্ক কষতে ওস্তাদ, কিম্বা কি চমৎকার ইংরেজি বলে, বা কথাবার্তায় কি চালাক-চতুর। অথবা কেউ হয়ত বলতে চায় যে, কোনো কিছু নষ্ট হলে লোকটা চটপট তা সারিয়ে দিতে পারে। বিস্ময়কর সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এসব বিচারে কিন্তু আজকালের কম্পিউটার বলতে গেলে বুদ্ধিমান নয়। কেননা, মানুষের যথাযথ নির্দেশ না পেলে নিজে থেকে কোনো কিছু করার ক্ষমতাই তার নেই। ঐ যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশাবলীকে বলা হয় 'প্রোগ্রাম'– যেটা ছাড়া কম্পিউটার অকেজো, অচল। গণনার কাজ করিয়ে নিতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করা খুব সহজ। প্রোগ্রাম পাওয়া মাত্র কম্পিউটার গণনার কাজের ঘোড়াকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। আর মানুষ যদি বেশ চিন্তাভাবনা করে প্রোগ্রাম তৈরি করে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেয়, তবে কম্পিউটার গণনার কাজ ছাড়াও প্রশ্নের সমাধান করা, লিপি উদ্ধার, দাবা জাতীয় খেলা ইত্যাদিও করতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবহার করছে এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটিকে। এটাকে অত্যাশ্চর্য বলছি এই কারণে যে, গত শতাব্দীর অন্যতম এবং চমকপ্রদ আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার। সভ্য মানুষের জীবনযাত্রার সাথে কম্পিউটার এমনভাবে প্রভাব ফেলেছে যে, কম্পিউটার ছাড়া এখন জীবন কল্পনাই করা যায় না। আধুনিক সভ্যতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম্পিউটার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। তবে কম্পিউটারের বিভিন্ন উপযোগিতা জানার আগে

www.pathagar.com

আমরা জেনে নিই কীভাবে এই বিশাল বিপুল কর্মকাণ্ডের উৎসটি আবিষ্কৃত হয়েছিল আর কারাই বা রয়েছেন এই আবিষ্কারের পেছনে।

কিভাবে এলো কম্পিউটার

কম্পিউটার নামের যে আধুনিক যন্ত্রটি আমরা ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। বা একদিনে এই অবস্থায় আসেনি। অনেক অনেক দিন ধরে এই যন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকে কম্পিউটার আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। মূলত কম্পিউটারের জন্ম আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে চিন দেশে গণনা কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো এক ধরনের যন্ত্র। সেটার নাম ছিলো অ্যাবাকাস। এই অ্যাবাকাসের সাহায্যেই প্রাচীন যুগে বিভিন্ন গণনার কাজ করা হতো। এই অ্যাবাকাস থেকেই আধুনিক ক্যালকুলেটর তৈরির ধারণা এসেছে এটা স্বীকার করতেই হবে। অ্যাবাকাস আবিষ্কারের পর পার হয়ে গেছে কয়েক হাজার বছর। মানুষ উন্নত হয়েছে। সভ্যতা উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। সেই সাথে মানুষের জ্ঞান এবং জানার ক্ষেত্রও হয়েছে বড়। অ্যাবাকাস তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে। এরপর জন নেপিয়ার (John Napier) নামে এক স্কটিস

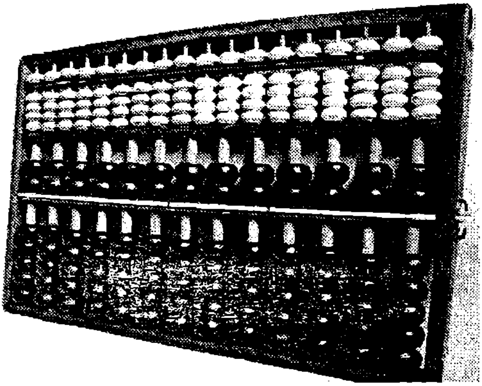

প্রাচীন গণনাকারী যন্ত্র এ্যাবাকাস

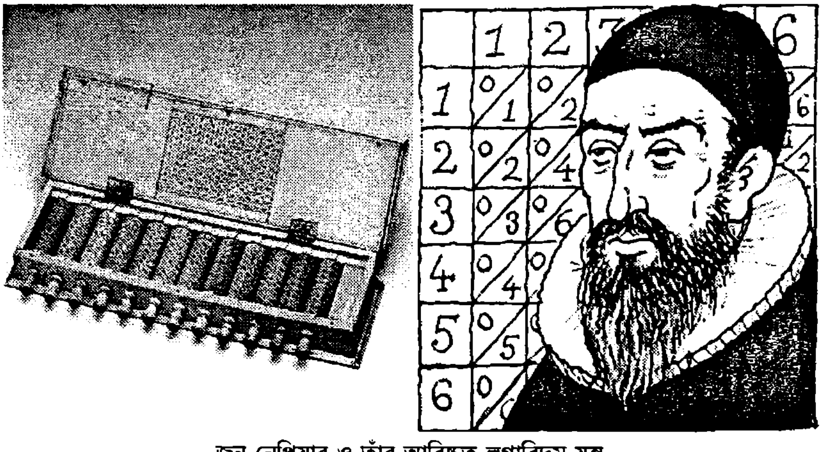

জন নেপিয়ার ও তাঁর আবিষ্কৃত লগারিদম যন্ত্র

www.pathagar.com

গণিতবিদ ১৬১৪ সালে লগারিদম নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এটি দিয়ে গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয় করা যেত। অন্যদিকে প্রথম যান্ত্রিক গণনাযন্ত্র তৈরি হয় ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে। স্যার ব্লেইজ প্যাসকেল (Blaise Pascal)

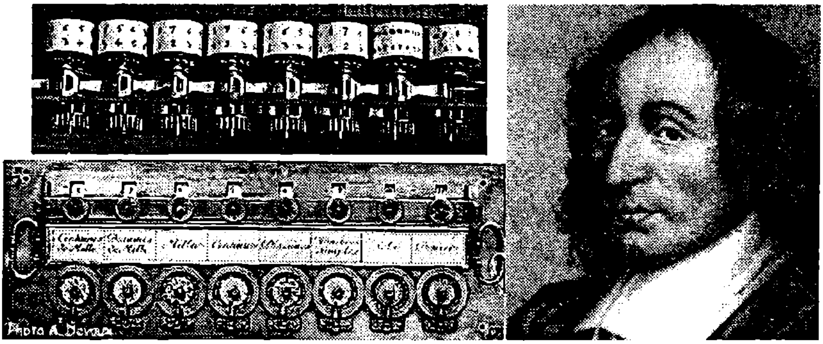

ব্লেইজ পাসকেল ও তাঁর আবিষ্কৃত পাসকেলাইন যন্ত্র

নামের এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক এটা তৈরি করে একেবারে বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলে দিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এটার নাম দেয়া হলো প্যাসকেলাইন (Pascaline)। এটার কার্যপ্রণালী কিন্তু ছিল অ্যাবাকাসের মতোই। তবে এতে চাকতির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছিল দাঁত যুক্ত চাকা বা গিয়ার। মানুষ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে গণনাকাজে ব্যবহার করলো এই যন্ত্র। ১৬৯৪ সালের দিকে প্যাসকেলাইন যন্ত্রের কিছুটা উন্নত সংস্করণ তৈরি করলেন গটফ্রেড উইলহেম ভন লেইবনিজ। এই যন্ত্রের নাম দিলেন তিনি স্টেপড রেকোনার (Stepped Reckoner)। পেরিয়ে গেল আরও সোয়া একশো বছর।

চার্লস ব্যাবেজ

১৮২০ সালের মাঝামাঝি স্টেপড রেকোনার যন্ত্রকে আরও একটু উন্নত করলেন টমাস দ্যা কোমার। ততদিনে মানুষ বেশ আধুনিক হয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির দিকে অনুসন্ধান তাদের অব্যহত রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ঘটে গেল এক বিপ্লব। ১৮২১ সাল। চার্লস ব্যাবেজ নামের এক ইংরেজ গণিতবিদ অংকের বিভিন্ন তথ্যের সহজ সমাধানের জন্য তৈরি করে ফেললেন একটি যন্ত্র—যার নাম দেয়া হলো ডিফারেন্স ইঞ্জিন (Defference Engine)। এই যন্ত্রকে আরও একটু আধুনিক করা হলো। তার নাম অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন (Analytical Engine)।

www.pathagar.com

১৮২১ সালের আগে যেসব যন্ত্র তৈরি হয়েছিল সেগুলোতে শুধু অংক আর সংখ্যা নিয়ে কাজ করা যেত। কিন্তু চার্লস ব্যাবেজের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রে অংকের পাশাপাশি তথ্য নিয়েও কাজ করা সম্ভব হয়। তবে এই যন্ত্রেরও কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। যন্ত্রটি চালাতে হতো একধরনের ছিদ্রযুক্ত পাঞ্চ কার্ড (Punch Card) দিয়ে। আর এই পাঞ্চ কার্ডটি একবারই মাত্র ব্যবহার করা যেত। দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হলে নতুন পাঞ্চ কার্ড লাগতো। বর্তমানের আধুনিক একটি কম্পিউটারের যেসব অংশ দেখতে পাওয়া যায়–চার্লস ব্যাবেজের অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনে তার সবগুলোই ছিল। তাছাড়া, এই প্রথম কোনো যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতে পারতো। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, চার্লস ব্যাবেজই হচ্ছেন কম্পিউটারের আদি পিতা। এলো ১৮৯০ সাল। আজকে যে বিশ্ববিখ্যাত আইবিএম কম্পিউটার কোম্পানির (IBM-International Business Machines Corporation) নাম শোনা যায়– সেই কোম্পানির তখনকার কর্ণধার ছিলেন ড. হারম্যান হলোরিথ। পেশায় ছিলেন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তখনও আইবিএম কোম্পানি চালু হয়নি। ড. হারম্যান চাকরি করতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি শাখায়। ড. হারম্যান এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, এই কাজ একজাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্পন্ন করে দিতে পারবেন। তিনি চার্লস ব্যাবেজের যন্ত্রের সাথে টেবুলেটর (Tabulator) নামের একটি যন্ত্র জুড়ে দিলেন। এই যন্ত্রে কাগজের তৈরি পাঞ্চ কার্ড ব্যবহার করা যাবে। আর সেই পাঞ্চ কার্ডে ছিদ্রও করতে পারবে তাঁর এই নতুন যন্ত্র টেবুলেটর। এই যন্ত্র

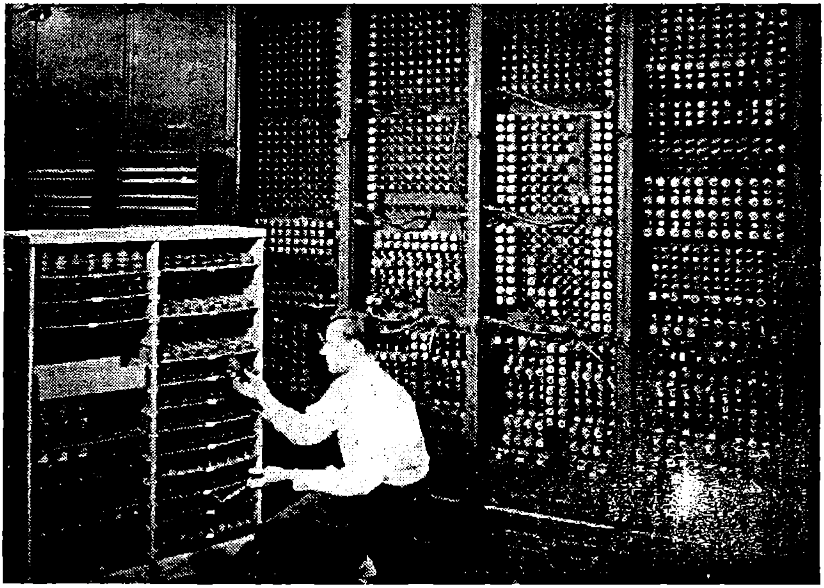

এনিয়াক কম্পিউটার

www.pathagar.com

ব্যবহার করে অবিশ্বাস্যভাবে আদমশুমারীর দশ বছরের কাজ মাত্র তিন বছরের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারলো আমেরিকান সেনসাস ব্যুরো।

এই অভূতপূর্ব সফলতা ড. হারম্যানকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন একটি কোম্পানি। নাম দিলেন টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি (Tabulating Machine Company)। এই কোম্পানিই পরবর্তীতে আইবিএম নামে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ড. হারম্যানের আবিষ্কারের পর কেটে গেছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। এই দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটারের ছোটখাট পরিবর্তন ছাড়া আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির জন মশলি ও প্রেসপার একার্ট নামের দুই প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরিতে হাত দিলেন। পুরো তিন বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি তাঁরা সত্যি সত্যিই তৈরি করে ফেললেন প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার। তার নাম দেয়া হলো এনিয়াক (ENIAC)। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার হাওয়ার্ড এইকিন নামের একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তৈরি করে ফেললেন এনিয়াকের চেয়ে কিছুটা ছোট এবং আরেকটু ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। নাম দেয়া হলো মার্ক ওয়ান (Mark 1)। তবে খুব বেশি ছোট আকার নয়। এই কম্পিউটারটি ছিল ১৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৬ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট। এর উচ্চতা ছিল ২.৪ মিটার। এতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের তারের দৈর্ঘ্য ছিল ৮০০ কিলোমিটার। আর এটা তৈরিতে যে খরচ পড়তো

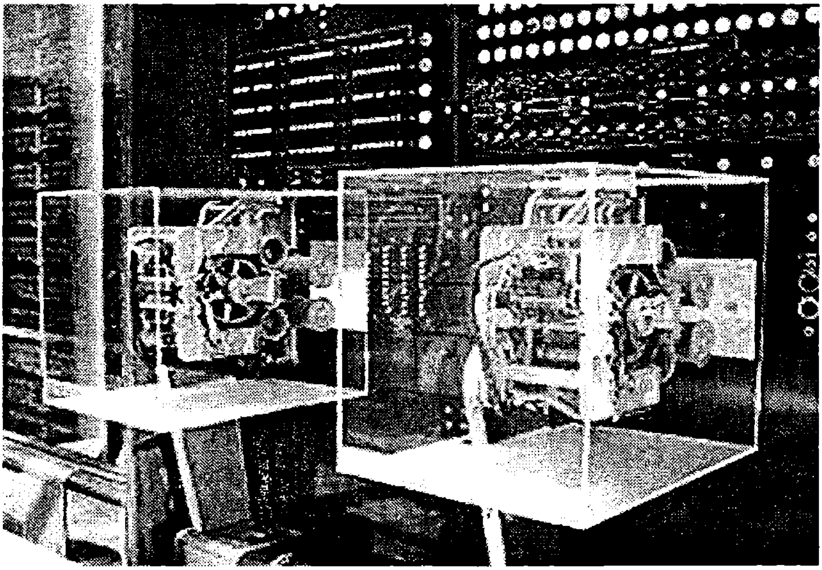

মার্ক-১ কম্পিউটার

www.pathagar.com

সেই খরচ দিয়ে এখন প্রায় একটা ছোটখাট কম্পিউটার কোম্পানি বানিয়ে ফেলা যাবে। ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে বারডিন, ব্রাটান এবং শক্‌লি নামের তিন প্রতিভাবান আমেরিকান আবিষ্কারক আবিস্কার করলেন ট্রানজিস্টার। কম্পিউটার দিগন্তে সূচিত হলো নতুন.বিপ্লবের। ভালভ নির্ভর এনিয়াক এবং মার্ক ওয়ান কম্পিউটারের জায়গা জুড়ে নিল এই ট্রানজিস্টার লাগানো কম্পিউটার। এতে করে কম্পিউটারের আকার বেশ ছোট হলো। তারওপর তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফলাফল প্রদানের সময়সীমা গেল একেবারে কমে। ফলে, এটা তৈরির খরচও অনেক কম হতে লাগলো।

এই সময়ের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এডস্যাকের (EDSAC—Electronic Delay Storage Automatic Computer) নাম উল্লেখযোগ্য। এই কম্পিউটারের মূল নির্মাতা হলেন হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান। এর পরপরই ১৯৫১ সালে আমেরিকার রেমিংটন র‍্যান্ড নামের এক কোম্পানি তৈরি করে ইউনিভ্যাক ওয়ান (UNIVAC-1—Universal Automatice Computer-1) নামের একটি কম্পিউটার। বাণিজ্যিক ডাটা প্রসেসিং কাজের উপযোগী এই কম্পিউটারটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে উচ্চমাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহ সরবরাহ করার সময় যন্ত্রটি বেশ গরম হয়ে উঠতো। ১৯৫৮ সালের

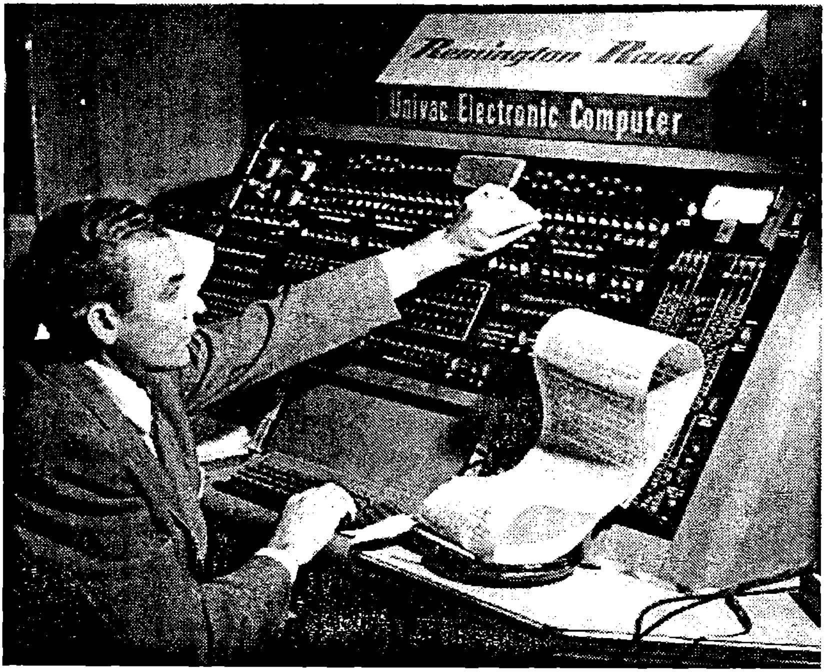

ইউনিভ্যাক-১ কম্পিউটার

www.pathagar.com

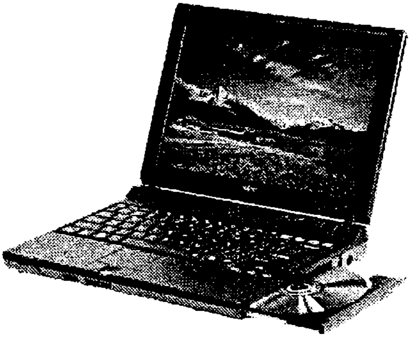

ল্যাপটপ কম্পিউটার মানুষের জীবনে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন

মাঝামাঝি সারা পৃথিবী চমকে উঠলো জ্যাক কিলবি নামের একজন প্রতিভাবান মার্কিন বৈজ্ঞানিকের কল্যাণে। তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন সিলিকন চিপ (Silicom Chip)। এই সিলিকন চিপের ছোট্ট একটি টুকরোর ওপর স্থাপন করা গেল অনেকগুলো ট্রানজিস্টার। এদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য তৈরি হলো সূক্ষ্ম পথ যাকে বলা হয় সার্কিট (Circuit)। এই সার্কিটের মধ্য দিয়ে উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা সম্ভব হয়ে উঠলো। এই সার্কিট সংযোজনের নাম দেয়া হলো আইসি বা ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (IC—Integrated Circuit)। এই ইনট্রিগ্রেটেড সার্কিট দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করতে উৎসাহী হলেন প্রস্তুতকারকরা। কারণ এতে কম্পিউটার আকারে ছোট হবে। আর সেই সাথে খরচও কমে আসবে অনেক। এর ফলে, কম্পিউটারের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। পরবর্তীতে এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তাকারা উপত্যকায় চলতে থাকে গবেষণার পর গবেষণা। একসময় এই জায়গাটার নামই হয়ে যায় সিলিকন ভ্যালি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ছোট্ট এক টুকরো সিলিকন চিপের ওপর অনেকগুলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বসানো সম্ভব হয়। এই সন্নিবেশিত চিপের নাম দেয়া হয় মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor)। বর্তমানের আধুনিক কম্পিউটার এই মাইক্রোপ্রসেসরের উপরই নির্ভরশীল। তার পর থেকে উদ্যমী মানুষ একের পর এক উন্নতির সোপানে পা রাখতে শুরু করে। একসময় যে কম্পিউটারকে রাখতে হতো বিশাল হলরুমের মতো একটি ঘরে, এখন একটি কম্পিউটারকে একটি ছোট্ট টেবিলেই রাখা যাচ্ছে। শুধু কি তাই? নিজের কোলের ওপরও রাখতে পারা যায় কম্পিউটারকে। যার নাম ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer)। এছাড়া আছে হাতে রেখে কাজ করার জন্য পামটপ (Palmtop) কম্পিউটার ইত্যাদি। কম্পিউটারের এই ব্যাপক পরিবর্তন কোন্ জিনিসটির জন্য সম্ভব হলো? এই কাজগুলো সম্ভব হয়েছে সিলিকন চিপ আবিষ্কারের পর থেকেই। ছোট্ট একটা সিলিকন চিপের ওপর পুরো একটি কম্পিউটারের সার্কিট স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মশিউর রহমান

জন্ম : ৪ জুন। চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার খয়ের হুদা গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাবার ব্যবসায় ভাটা পড়ে। সেই সাথে সারা বাংলার দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াটাও পুরোপুরি এসে পড়েছিল পরিবারে। সেখান থেকেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তবুও থেমে থাকেনি কোনোকিছু। জীবনকে চিনতে হয়েছে, জানতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায় দারিদ্র্য তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। বাবা-মা ও বড় ভাইদের অনুপ্রেরণায় নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছেন।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও, সাহিত্যে আগ্রহের কারণে বাংলা সাহিত্যে এমএ করেছেন। ইন্টারমিডিয়ের পর কর্মজীবনের শুরু। প্রথমে টিউশনি, পরে কম্পিউটার গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি। বর্তমানে প্রচ্ছদ ডিজাইনার হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এ পর্যন্ত দুই সহস্রাধিক বইয়ের প্রশংসিত প্রচ্ছদ ডিজাইন করে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

লেখালেখির অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই। গ্রামের ক্লাবের দেয়াল পত্রিকায় প্রথম ছোটগল্প 'সংগ্রামই জীবন' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৯০ সালে ঢাকায় আসার পর দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিক ও সাহিত্য ম্যাগাজিনে তার লেখা নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। ছোটদের জন্য লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত বই : মেঘ ও বৃষ্টির বন্ধুরা, একাত্তরের ছেলেটি, আমরা করবো জয়, ভূতের সাথে হ্যান্ডশেক, ওরে বাবা ভূ-উ-ত, নীলডুমুরির ভয়ংকর রাত, অদৃশ্য মানব, ভূত গোয়েন্দা রহস্য, বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পাঠ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ, ছোটদের জগদীশচন্দ্র, ছোটদের মাদার তেরেসা, ছোটদের বিদ্যাসাগর, বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। 'টইটম্বুর'-এ প্রকাশিত শিশুতোষ গল্প 'ছোট্ট জোনাকি'র এনিমেটেড কার্টুন নির্মাণ করে একুশে টিভি (২০১১ সালের ঈদের অনুষ্ঠানের জন্য)।

বড়দের জন্য প্রকাশিত বই : ভালোবাসার আড়ালে, প্লেটোনিক প্রেম, ওরা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, প্রচ্ছন্ন প্রণয়, উড়ে যায় স্বপ্নের

www.pathagar.com

ISBN : 978-984-8383-251-9

978 984 83832519